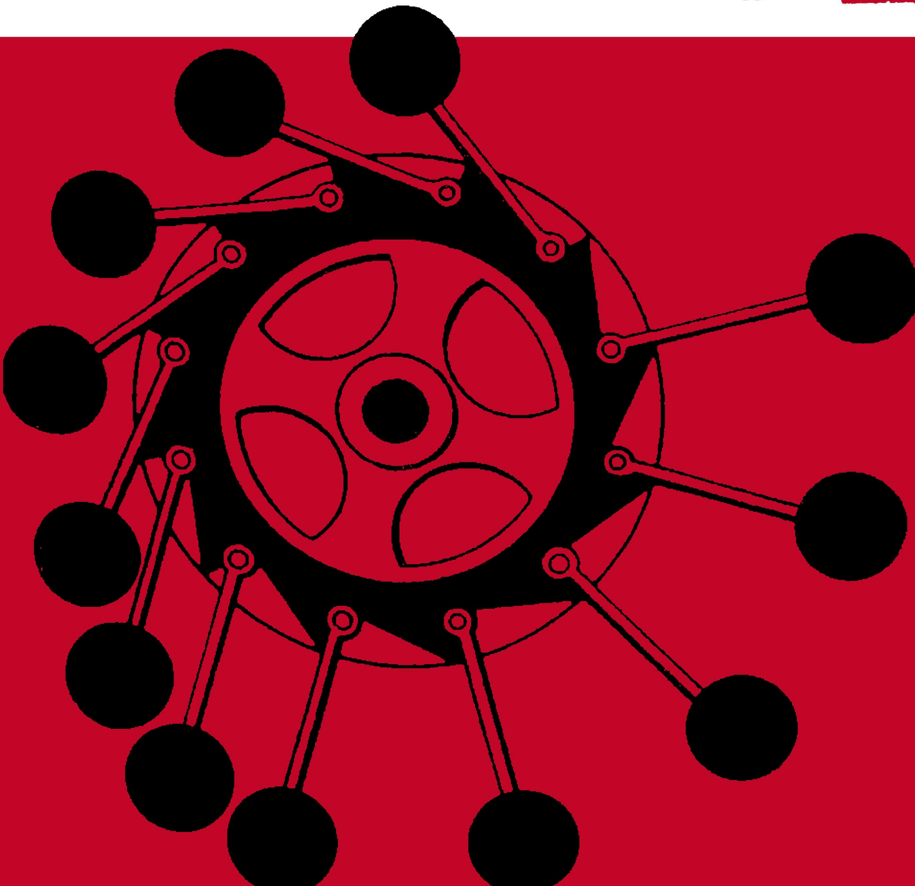
ইয়া. পেরেলমান

পদার্থবিদ্যার মজার কথা



1



পদার্থবিদ্যার মজার কথা

Я. И. Перельман

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ФИЗИКА

Книга I

Издательство «Наука»
Москва СССР

ইয়া. পেরেলমান

পদার্থবিদ্যার মজার কথা

অনুবাদ : সিদ্ধার্থ ঘোষ

মির প্রকাশন মস্কো

মনীষা গ্রন্থালয় কলিকাতা

PHYSICS FOR ENTERTAINMENT

Ya. Perelman

Book 1.

На языке бенгали

প্রকাশকের কথা

'পদার্থবিদ্যার মজার কথা'-র এই দ্বিতীয় ইংরাজী ভাষার সংস্করণ অনূদিত হয়েছে 18শ রুশ-ভাষার সংস্করণ, বা লেখকের মৃত্যুর পরবর্তী পঞ্চমটি থেকে (তাঁর জীবিতাবস্থায় শেষ সংস্করণ, ত্রয়োদশতমটি 1936-এ প্রকাশিত হয়েছিল)। মূল পাঠ বা চিত্রণ পরিবর্তনের জন্য বলতে গেলে কিছুই করা হয়নি। উপরন্তু সামগ্রিকভাবে সবই ঠিক আছে বলে যা-ছিল ঠিক সেই ভাবেই প্রায় রেখে দেওয়াই ভাল বলে মনে করা হয়েছে। পরবর্তীকালে পদার্থবিদ্যার বিকাশের ব্যাখ্যা করার কোনো চেষ্টা করলে তা বইটির গঠন পরিকল্পনাকেই রীতিমত পরিবর্তিত করত। কাজেই মহাকাশে পাড়ির ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি সত্ত্বেও, এই সংক্রান্ত অধ্যায়টি লেখক যেমন পেশ করেছিলেন তেমনই রয়েছে (পরবর্তী বিকাশের জন্য পাঠককে এই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে রচিত বইগুলো দেখতে অনুরোধ জানান হচ্ছে)।

লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তিনটি সংস্করণেই (অধ্যাপক এ. বি. ম্লদ-জিভস্কি সম্পাদিত 1947 ও 1949-এর 14শ ও 15শ সংস্করণ এবং ভি. এ. উগারভ কৃত 1959-60-এর 18শ সংস্করণ) মাত্র সামান্য কয়েকটা বর্তমানে অপ্রচলিত পরিসংখ্যানের সংস্কার সাধন করা হয়েছে, কয়েকটা পরীক্ষা বাদ দেওয়া হয়েছে যার পরিকল্পনা ছিল খুবই দুর্বল ধরনের এবং কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে।

ত্রয়োদশ সংস্করণে লেখকের ভূমিকা থেকে

এই বইয়ের উদ্দেশ্য যত না তোমাদের নতুন কোনো কথা জানানো তার চেয়ে, বেশি, 'তোমরা যা জানো তাকেই শিখতে' সাহায্য করা। অন্যভাবে বললে, আমার ইচ্ছা হল, পদার্থবিদ্যায় তোমাদের বুনিয়াদি জ্ঞানকে মেজে-ঘষে আরো আকর্ষণীয় করে তোলা এবং কিভাবে তাকে বিভিন্ন কাজে লাগানো যায়, সেইটা শেখানো। এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য এখানে দেওয়া হয়েছে নানা ধরনের ধাঁধা, মজাদার কিংবদন্তী, গল্প ও পরীক্ষা, প্যারাডক্স এবং অপ্রত্যাশিত তুলনা—সবই পদার্থবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং আমাদের প্রাত্যহিক জগৎ ও সায়েন্স-ফিকশানের উপর নির্ভরশীল। এই ধরনের বইয়ে সায়েন্স-ফিকশান খুবই উপযোগী মনে করে আমি জুল ভার্ন, এইচ. জি. ওয়েলশ্, মার্ক টোয়েন এবং অন্যান্য লেখকদের রচনা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়েছি, কারণ, এই সব লেখকরা যেসব অদ্ভুত পরীক্ষার বিবরণ দিয়েছেন তা শুধু মজাই যোগায় না, পদার্থবিদ্যার ক্লাসে তা শিক্ষাদায়ক উদাহরণ হিসাবেও ব্যবহৃত হতে পারে।

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যাতে আগ্রহ সৃষ্টি করা যায় ও সবাই মজা পায়, কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে যত আগ্রহ দেখায়, ততই তার নজর তীক্ষ্ণ হয় এবং অর্থ বোঝা ততই সহজ হয়, ফলে তার জ্ঞান আরও পরিপূর্ণ হয়।

অবশ্য এই ধরনের বই লেখার প্রথাগত পদ্ধতিগুলো কিছু অস্বীকার করতে আমি ভয় পাই নি। কাজেই, ঘরে বসে দেখানো ম্যাজিক বা চোখ-ধাঁধানো পরীক্ষা জাতীয় কিছুই প্রায় এখানে পাবে না। আমার উদ্দেশ্য ভিন্ন, প্রধানত, পদার্থবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে বৈজ্ঞানিক ধারায় তোমাদের ভাবতে শেখানো এবং প্রতিদিনের জীবন থেকে বিভিন্ন রকমের জিনিসের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা জড় করা। মূল পাণ্ডুলিপি নতুন করে লেখার সময় আমি সেই নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি যা লেনিন এইভাবে সূত্রবদ্ধ করেছেন: "জনপ্রিয় লেখক তাঁর পাঠককে এগিয়ে নিয়ে যান গভীরতর চিন্তার, গভীরতর অধ্যয়নের দিকে। সহজ এবং সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্য থেকে শুরু করে, সহজ বিতর্ক বা চমকপ্রদ উদাহরণের সাহায্যে তিনি দেখান, এই সব তথ্য থেকে কোন প্রধান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে এবং চিন্তাশীল পাঠকের মনে নিত্য নতুন প্রশ্ন জাগিয়ে তোলেন। জনপ্রিয় লেখক কখনও অনুমান করে নেন না যে, তাঁর পাঠক এমন একজন যে চিন্তা করে না, যে চিন্তা করতে পারে না বা করতে চায় না। পরিবর্তে লেখক মনে করেন তাঁর অবিকশিত পাঠক সত্যিই মাথা খাটাতে ইচ্ছুক এবং এই পাঠকের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল কাজে তিনি 'সহায়তা' করেন, তাকে 'পরিচালিত' করেন,

তাঁর প্রথম হাঁটতে শেখার সময় সাহায্য করেন, এবং তাঁকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে অগ্রসর হতে 'শিক্ষা' দেন।"

এই বইয়ের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রচুর আগ্রহ দেখানো হয়েছে, তাই এর 'গড়ে ওঠার জীবন কথা' সম্বন্ধে গুটিকয়েক বিশেষ প্রয়োজনীয় কথা উল্লেখ করছি।

'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' প্রথম প্রকাশিত হয় পঁচিশ বছর আগে। এই ধরনের বেশ কয়েক কুড়ি বই নিয়ে লেখকের এখন যে বিরাট সংসার, তার মধ্যে এটিই প্রথম জন্ম নিয়েছিল। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ এই বইটি এ অবধি রুশ ভাষায় সবশুদ্ধ 200,000 কপি ছাপা হয়েছে। অনেক পাবলিক লাইব্রেরীর তাকেই বইটি পাওয়া যায়, যেখানে প্রত্যেকটা কপি ডজন-ডজন পাঠকের হাতে পেঁছয়, তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ বইটা পড়েছেন বললে বোধ হয় ভুল হবে না। সোভিয়েত ইউনিয়ানের প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাঠকের কাছ থেকেও আমি চিঠি পেয়েছি।

1925 সালে একটি ইউক্রেনিয়ান ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় এবং জার্মান ও ঈদীশ ভাষায় অনুবাদ প্রকাশিত হয় 1931-এ। জার্মানীতে প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এই বইয়ের অংশ বিশেষ সুইজারল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে ফরাসীতে এবং প্যালেস্টাইনে হিব্রু ভাষায়ও ছাপা হয়েছে।

এর জনপ্রিয়তা পদার্থবিদ্যায় সাধারণ মানুষের আগ্রহেরই প্রমাণ আর তাই আমি এর মান সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিতে বাধ্য হয়েছি। এই কারণেই পুনর্মুদ্রণের সময় আমায় বহু পরিবর্তন ও সংযোজন করতে হয়েছে। এর অস্তিত্বের পঁচিশ বছরের মধ্যে বইটিকে অবিরাম সংশোধন করা হয়েছে। এর সাম্প্রতিক সংস্করণে মূল লেখার খুব বেশি হলে অর্ধেকটা রয়েছে এবং বলতে গেলে প্রথম সংস্করণের একটি ছবিও নেই।

অনেকে আমাকে সংশোধন না করার জন্য বলেছেন, যাতে "গোটা বারো নতুন পাতার জন্য নতুন সংশোধিত সংস্করণ কিনতে বাধ্য হতে না হয়"। এই কারণে সব দিক থেকে বইটির উন্নতি ঘটানোর অবিরাম যে দায়িত্ব আমার রয়েছে তার থেকে আমি কখনো নিরত হতে পারি না। 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' তো আর গল্পের বই নয়। বইটা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের হলেও এটা বিজ্ঞানেরই বই এবং এর যা বিষয়, সেই পদার্থবিদ্যার মৌলিক জ্ঞান পর্যন্ত দিনে দিনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। এটাকে অবশ্যই বিবেচনার মধ্যে রাখা উচিত।

অন্য দিকে, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার ফিশান, আধুনিক তত্ত্ব এবং এই জাতীয় সাম্প্রতিক সাফল্যের প্রশ্ন নিয়ে বইয়ে আলোচনা করিনি বলে আমাকে একাধিকবার তিরস্কৃত হতে হয়েছে। একটা ভুল বোঝা থেকে এর উৎপত্তি।

এই বইটির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, উল্লিখিত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব অন্য বইয়ের।

দ্বিতীয় খণ্ড ছাড়াও 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা'-এর সঙ্গে সম্পর্কিত আমার লেখা অন্য কয়েকটা বইও আছে। এর মধ্যে একটা 'প্রতি পদে পদার্থবিদ্যা' এমন সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা যিনি এ-পর্যন্ত পদার্থবিদ্যার শৃংখলাবদ্ধ অধ্যয়ন শুরু করেননি। অন্য দুটো বই কিন্তু তা নয়, এগুলো যারা পদার্থবিদ্যায় সেকেন্ডারি শিক্ষা লাভ করেছে তাদের জন্য। এই বই দুটোর নাম 'বলবিদ্যার মজার কথা' এবং 'তুমি কি তোমার পদার্থবিদ্যা জানো?'। শেষোক্তটি আবার এই বইটির সম্পূরক।

1936

Ya. Perelman

সূচী

পরিচ্ছেদ ১

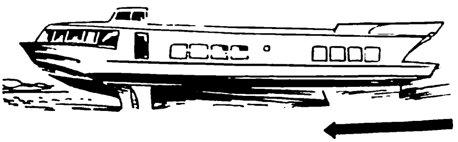
দ্রুতি ও বেগ। গতির উপাদান

আমরা কত দ্রুত চলি ?

একজন ভাল দৌড়বাজের 1·5 কিমি ছুটতে মোটামুটি 3 মি. 50 সে. লাগে। যে কোনো সাধারণ মানুষ হাঁটার সময় প্রতি সেকেণ্ডে আন্দাজ 1·5 মি. পথ অতিক্রম করে। প্রতি সেকেণ্ডে দৌড়বাজটি তাই সাত মিটার এগোয়। অবশ্য এই গতিগুলিকে চূড়ান্তভাবে তুলনা করা চলে না। হেঁটে চলার সময় একজন হয়তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘণ্টায় 5 কিমি হারে পথ চলতে পারে। কিন্তু যে দৌড়চ্ছে সে তার দ্রুতিকে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য ধরে রাখতে পারে। জোর কদমে মার্চ করে এগোবার সময় পদাতিক বাহিনীর একটা দল যে দ্রুতিতে এগোয় সেটা একজন দৌড়বাজের তুলনায় তিনভাগের এক ভাগ মাত্র, অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে 2 মিটার বা মোটামুটি 7 কিমি / ঘণ্টা।

আমার মনে হয়, তোমার হাঁটবার স্বাভাবিক গতির সঙ্গে গল্পে পড়া সেই অতি মন্থর শামুক বা কচ্ছপের 'দ্রুতি'র তুলনা তোমার কাছে খুব মজাদার হয়ে উঠবে। শামুক সত্যিই তার সুনাম অনুযায়ী সেকেণ্ডে 1·5 মিমি বা ঘণ্টায় 5·4 মিটার পথ চলতে অভ্যস্ত। তোমার দ্রুতির ঠিক হাজার ভাগের এক ভাগ।

চিত্র 1



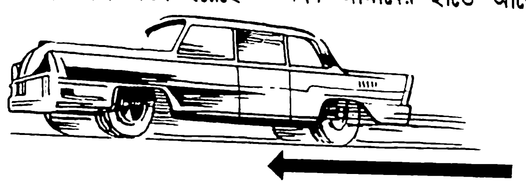
যাত্রীবাহী দ্রুতগামী হাইড্রোফয়েল জাহাজ

আরেকটি সুপরিচিত মন্থরগতির জীব কচ্ছপ, সে-ও যে এর চেয়ে খুব একটা জোরে এগোয় তা নয়—সাধারণতঃ ঘণ্টায় 70 মিটার।

শামুক ও কচ্ছপের তুলনায় যতই নিজেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন মনে করো না কেন, তোমার নিজের গতির সঙ্গে অন্যান্য গতির তুলনা করলে দেখবে তাহা হেরে যাচ্ছ। তাও আবার যে সব গতির সঙ্গে তুলনার কথা বলছি সেগুলি যে খুব দ্রুত তাও নয়—বলা হচ্ছে আমাদের চারপাশে দেখা সাধারণ গতিদের কথাই। এটা অবশ্য ঠিক যে, সমতলে প্রবহমান যে কোনো নদীর স্রোতকে তুমি দৌড়ে হারিয়ে দিতে পারবে—আর মাঝারি গতির বাতাসের থেকেও হয়তো কমতি কিছু যাবে না। কিন্তু স্কি না পরে কিছুতেই সেকেণ্ডে 5 মিটার পাড়ি দেওয়া একটা মাছির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠতে পারবে না। দ্রুতগতি ঘোড়ায় চড়েও তুমি একটা খরগোশ বা শিকারী কুকুরকে তাড়া করে ধরতে পারবে না—আর ঈগলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সে শুধু প্লেনে চড়েই সম্ভব।

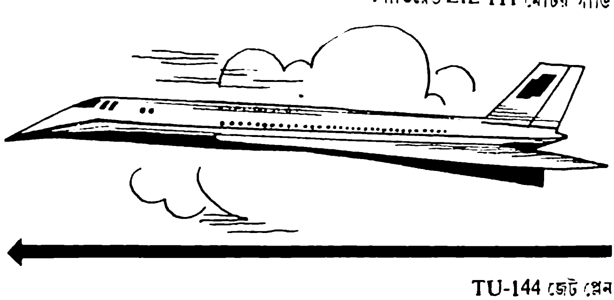
তবুও মানুষ তার উদ্ভাবিত যন্ত্রের দৌলতে দ্রুতির দিক থেকে অদ্বিতীয়। সোভিয়েত যাত্রীবাহী হাইড্রোফয়েল জাহাজ ঘণ্টায় 60-70 কিমি যেতে পারে (চিত্র 1)। জলের চেয়ে স্থলে আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারো ট্রেনে বা মোটর গাড়ি চেপে, যা ঘণ্টায় 200 কিমি বা আরো বেশি যায় (চিত্র 2)। আধুনিক এরোপ্লেন এই সব গতিকেও অনেক ছাড়িয়ে গেছে। সোভিয়েত আকাশ-পথে চলাচলকারী বিশাল TU-104, TU-114 এবং TU-144 (চিত্র 3) জেট প্লেনগুলি ঘণ্টায় 800 কিমি যায়। এইতো সেদিনও এরোপ্লেন নকশাবিদ্‌রা চেষ্টা করছিলেন 'শব্দের সীমা'-কে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য, যাতে শব্দের দ্রুতি অর্থাৎ সেকেণ্ডে 330 মিটার বা ঘণ্টায় 1200 কিমি-র চেয়ে বেশি গতি অর্জন করা যায়। আজ সেটা সম্ভব হয়েছে। এখন আমাদের হাতে আছে এমন

চিত্র 2



সোভিয়েত ZIL-111 মোটর গাড়ি

চিত্র 3



TU-144 জেট প্লেন

কয়েকটি আকারে ছোট অথচ অত্যন্ত দ্রুতগামী শ্রুতি-উত্তর (supersonic) জেট এরোপ্লেন যারা ঘণ্টায় 2,000 কিমি অবধি ছুটতে পারে।

মানুষের তৈরী এমন সব যন্ত্রযান আজ আছে যা এর চেয়েও বেশী গতি অর্জন করতে পারে। বায়ুমণ্ডলের ঘন স্তরগুলির ঠিক উপরে পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহগুলি সেকেণ্ডে আট কিমি করে পথ বিপুল বেগে ধেয়ে চলে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই সৌরজগতের গ্রহগুলির অভিমুখে বেশ কিছু মহাকাশযান পাঠানো হয়েছে। তাদের প্রারম্ভিক বেগ ছিল পলায়নের বেগের (escape velocity) চেয়ে, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠে প্রতি সেকেণ্ডে 11·2 কিমি-এরও বেশি।

নিচের তালিকায় দ্রুতির কয়েকটি আকর্ষণীয় তথ্য পাওয়া যাবে

শামুক	1·5	মিমি/সেকেণ্ড	অথবা	5·4 মি/ঘণ্টা
কচ্ছপ	20	,,	,,	70 ,,
মাছ	1	মি/সেকেণ্ড	,,	3·6 কিমি/ঘণ্টা
পদযাত্রী	1·4	,,	,,	5 ,,
অশ্বারোহী, ধীরগতি	1·7	,,	,,	6 ,,
অশ্বারোহী, মধ্যমগতি	3·5	,,	,,	12·6 ,,
মাছি	5	,,	,,	18 ,,
স্কিয়ার (skier)	5	,,	,,	18 ,,
অশ্বারোহী, দ্রুতগতি	8·5	,,	,,	30 ,,
হাইড্রোফয়েল জলযান	16	,,	,,	58 ,,
খরগোশ	18	,,	,,	65 ,,
ঈগল	24	,,	,,	86 ,,
শিকারী কুকুর	25	,,	,,	90 ,,
রেলগাড়ি	28	,,	,,	100 ,,
রেসিং গাড়ি (রেকর্ড)	174	,,	,,	633 ,,
TU-104 জেট এরোপ্লেন	220	,,	,,	800 ,,
বাতাসবাহী শব্দ	330	,,	,,	1,200 ,,
শ্রুতি-উত্তর জেট এরোপ্লেন	550	,,	,,	2,000 ,,
পৃথিবীর কক্ষীয় বেগ	30,000	,,	,,	108,000 ,,

সময়ের সঙ্গে পাল্লা

একজন এরোপ্লেনে চেপে সকাল আটটায় ভ্লাদিভস্তক থেকে রওনা হল আর সেই দিনই সকাল আটটায় মস্কোয় এসে নামল। এটা কি সম্ভব ?

আমি কিন্তু আবোল-তাবোল বকছি না। এমনটা সত্যিই হতে পারে। এই রহস্যের সূত্র রয়েছে ভ্লাদিভস্তক আর মস্কোর স্থানীয় সময়ের মধ্যে নয় ঘণ্টার ব্যবধানের বাস্তবতার মধ্যে। আমাদের প্লেনটা যদি এই দুই শহরের মধ্যকার দূরত্ব এই ন' ঘণ্টা সময়-এর মধ্যেই অতিক্রম করতে পারে তবে প্লেনটা মস্কোতে সেই সময়েই নামবে ঠিক যে সময়ে তা ভ্লাদিভস্তক ছেড়ে আকাশে উঠেছিল। এই দূরত্বটাকে মোটামুটিভাবে 9,000 কিলোমিটার ধরলে আমাদের এরোপ্লেনের দ্রুতি হওয়া উচিত 9,000 : 9 = 1,000 কিমি/ঘণ্টা, যা আজকের দিনে আর মোটেই অসম্ভব নয়।

সুমেরু-বৃত্তীয় অঞ্চলের কোনো অক্ষরেখা বরাবর "গতির দৌড়ে সূর্যকে হারাতে হলে" (কিংবা বলা উচিত পৃথিবীকে), কাউকে আরো ধীরগতি সম্পন্ন হলেও চলতে পারে। 77-তম অক্ষরেখায় অবস্থিত নোভায়া জেমলিয়ার আকাশে একটি এরোপ্লেন 450 কিমি/ঘণ্টা দ্রুতিতে এগোতে থাকলে নির্দিষ্ট সময়ে যতটা দূরত্ব অতিক্রম করবে, ভূ-পৃষ্ঠের উপর ঐ শহরের যে কোনো বিন্দুও ঠিক একই সময়ে, পৃথিবীর আহ্নিক ঘূর্ণনের ফলে, ততটাই পথ অতিক্রম করে। তুমি যদি ঐরকম কোনো প্লেনের সওয়ার হও তো দেখবে সূর্য যেন আকাশের এক জায়গায় স্থির হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় সূর্য কখনোই অস্ত যাবে না। তার জন্য অবশ্য তোমার প্লেনটিকে সঠিক দিকে বরাবর গতিশীল হওয়া দরকার !

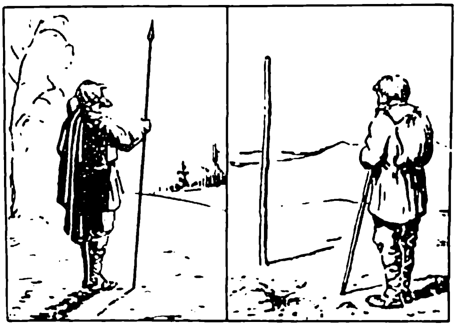
পৃথিবী পরিক্রমারত চাঁদকে গতির দৌড়ে হারানোটা আরোও সহজ। পৃথিবী নিজের অক্ষের উপর একবার পাক খেতে যা সময় নেয়, চাঁদ তার থেকে 29 গুণ বেশি সময় নেয় পৃথিবীকে একবার পরিক্রমা করতে (স্বাভাবিকভাবেই আমরা তথাকথিত কৌণিক বেগের তুলনা করছি, রৈখিক বেগের নয়)। কাজেই 15 থেকে 18 নট দ্রুতিসম্পন্ন যে কোনো সাধারণ স্টীমারের পক্ষেও চাঁদকে দৌড়ে হারিয়ে দেওয়া সম্ভব। এমন কি এই প্রতিযোগিতা যদি এমন এক জায়গায় হয় যার অক্ষাংশ মাঝারি ধরনের, তাতেও কোনো অসুবিধা হবে না।

মার্ক টোয়েন তাঁর 'ইনোসেণ্টস্ অ্যাব্রড' বইয়ে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। নিউ ইয়র্ক থেকে অ্যাজোরেস যাত্রার কালে আটলাণ্টিক পাড়ি দেওয়ার সময় "...আমরা ঝলমলে গ্রীষ্মকাল পেয়েছিলাম, আর রাতগুলো ছিল দিনের চেয়েও মনোরম। প্রতি রাতেই আমরা অবাক হয়ে দেখতাম পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে আকাশের একই জায়গায় একই সময়ে। চাঁদের এমন অদ্ভুত আচরণের কারণটা প্রথমে আমরা ধরতে পারিনি। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম, চিন্তা ভাবনা করে দেখা গেল যে, আমরা তখন রোজ প্রায় কুড়ি মিনিট করে সময় অর্জন করছিলাম। আমরা খুব দ্রুত পূব দিকে এগোচ্ছিলাম বলে প্রতিদিন যেটুকু সময় লাভ করছিলাম তাতেই চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাল মিলিয়ে চলা সম্ভব হচ্ছিল।"

এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগ

সময়ের বিচারে মানুষের কাছে এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগ অতি সাধারণ ব্যাপার। এই মাত্রার সময়-ব্যবধান ইদানীং আমাদের কোনো কোনো ব্যবহারিক কাজকর্মে উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে। আকাশে সূর্যের অবস্থান বা ছায়ার দৈর্ঘ্য অনুসারে মানুষ এককালে সময়ের হিসেব নিত। তখন তারা গণনার

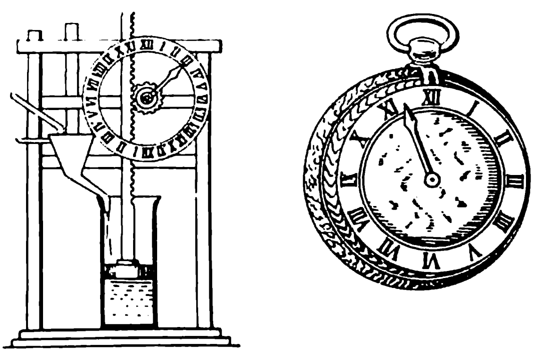
চিত্র 4



সূর্যের অবস্থান (বাঁ দিকে), এবং ছায়ার দৈর্ঘ্য (ডান দিকে) অনুযায়ী সেকালে সময়ের হিসেব নেওয়া হত।

অযোগ্য জ্ঞানে মিনিটের হিসাবকে পুরোপুরি অবহেলা করত। প্রাচীনকালে মানুষের জীবনে ব্যস্ততা খুবই কম ছিল। তাই সেকালের সূর্য-ঘড়ি, জল-ঘড়ি,

চিত্র 5



একটি প্রাচীন জল-ঘড়ি (বাঁ দিকে) এবং একটি পুরনো পকেট-ঘড়ি (ডান দিকে)। খেয়াল ক'রো কোনটারই মিনিটের কাঁটা নেই।

বালি-ঘড়ি ইত্যাদি সময় মাপার যন্ত্রে মিনিটের জন্য আলাদা কোনো ভাগ থাকত না। মিনিটের কাঁটার প্রথম আবির্ভাব অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, আর

সেকেন্ডের কাঁটার ব্যবহার তো মাত্র দেড় শো বছর আগে শুরু হয়েছে (চিত্র 5)।

আমরা বরং আবার সেকেন্ডের হাজার ভাগের প্রসঙ্গে ফিরে আসি। এইটুকু সময়ের মধ্যে কি ঘটতে পারে তা ভেবে দেখেছ কি ? সত্যিই কিন্তু অনেক কিছুই ঘটতে পারে ! হ্যাঁ, একটা সাধারণ রেলগাড়ি এই সময়ে মাত্র 3 সেমি আন্দাজ যাবে। শব্দ কিন্তু ততক্ষণে 33 সেমি পেরিয়ে যাবে আর একটা এরোপ্লেন উড়ে যাবে আধ মিটার। সূর্যের চারদিকে কক্ষপথে পরিভ্রমণরত পৃথিবী এই সময়ে 30 মিটার পথ অতিক্রম করবে আর আলো ছড়িয়ে পড়বে বহু দূরে—300 কিমি. পর্যন্ত। আমাদের আশপাশের অতি ক্ষুদ্র জীবকুলের সত্যিই যদি চিন্তাশক্তি থাকত, তাহলে কিন্তু এক সেকেন্ডের হাজার ভাগকেও তারা সময়ের অতি নগণ্য পরিমাপ বলে মনে করতে পারতো না। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, কীটপতঙ্গরা সময়ের এই ব্যবধানটুকু রীতিমতো অনুভব করতে পারে। এক সেকেন্ডের মধ্যে একটা মশার ডানা 500 থেকে 600 বার নামাওঠা করে। ফলে এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের সময়ের মধ্যে মশাটা হয় তার ডানাগুলোকে একবার পুরো উঠিয়ে আর নয়তো নামিয়ে ফেলতে পারবে।

আমরা কীটপতঙ্গের মত অত তাড়াতাড়ি আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নাড়াতে পারি না। সবচেয়ে চটপট আমরা যা করতে পারি সেটা হল চোখের পলকের পড়া আর খোলা। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে যে, আমরা আমাদের দৃশ্যপটের এই ক্ষণিকের বাধা খেয়ালই করতে পারি না।

অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত কোনো গতির কথা বলার সময় আমরা "এক পলকের মধ্যে" কিছু ঘটেছে বলে উল্লেখ করি। কিন্তু ওয়াকিবহাল গুটিকয়েক লোক হয়তো বলবেন এ ব্যাপারটাও কিন্তু সেকেন্ডের হাজার ভাগের সঙ্গে তুলনায় অত্যন্ত মন্থর। নিখুঁত মাপজোখ করে জানা গেছে, চোখের পলক পুরোপুরি একবার পড়া ও খোলার জন্য গড়পরতা সময় লাগে সেকেন্ডের পাঁচ ভাগের দুই ভাগ, তার মানে সেকেন্ডের 400 হাজার ভাগ। পলক পড়ার প্রক্রিয়াটাকে এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা যায়ঃ প্রথমতঃ চোখের পলক পড়তে সময় নেয় সেকেন্ডের 75-90 হাজার ভাগ, দ্বিতীয়তঃ চোখের উপর পলক পড়ে থাকে সেকেন্ডের 130-170 হাজার ভাগ সময় ধরে এবং তৃতীয়তঃ চোখের পলক খুলতে সময় নেয় সেকেন্ডের 170 হাজার ভাগের মতো।

দেখতেই পাচ্ছ যে, এই এক পলকের ব্যাপারটা ঘটতেও যথেষ্ট সময় লাগছে. যার মধ্যে আবার চোখের পাতাটি একটু জিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাও করে নিচ্ছে। এই এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের মধ্যের মুহূর্তগুলোরও আমরা যদি মনে মনে আলোকচিত্র তুলতে পারতাম তাহলে "এক পলকের মধ্যে"ও চোখের পলকের দুটি

স্বচ্ছন্দ গতি ও এই দুই গতির মধ্যবর্তী কালে চোখের পাতার বিশ্রাম গ্রহণের ব্যাপারটা ধরে ফেলতে পারতাম।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, এরকম কিছু করার সামর্থ্য থাকলে আমরা আমাদের আশপাশের জগতের যে চিত্রটা পাই, সেটাকে দেখতে পেতাম পুরোপুরি অন্য রকমের। আমরা তখন এমন সব অদ্ভুত আর উদ্ভট জিনিস দেখতে পেতাম যার বর্ণনা দিয়েছেন এইচ. জি. ওয়েল্‌স তাঁর লেখা 'নিউ অ্যাক্‌সিলারেটার'-এ। এই গল্পে এমন একটি লোকের কথা বলা হয়েছে যে একটা আজব মিক্‌শ্চার খাওয়ার পর দ্রুতগতি সম্পন্ন ঘটনাগুলিকে দেখতে শুরু করল আলাদা-আলাদা ভাবে সংঘটিত কতকগুলো স্থিরদৃশ্যের সমাহার হিসাবে। গল্পটি থেকে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি।

" 'তুমি কি এর আগে কখনো কোনো জানলায় এইভাবে পর্দা ঝোলানো দেখেছ?'

"আমি তার দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। পর্দার নিচের দিকটা দেখি বাতাসে পত্‌পত্‌ করে উড়তে উড়তেই হঠাৎ যেন জমে গেছে; কোণাটা রয়েছে উঁচু হয়ে।

" 'না ঃ' আমি বললাম, 'অদ্ভুত ব্যাপার।'

" 'এবার এখানে দ্যাখো।' এই বলে সে হাতের মুঠো খুলে তাতে ধরা চশমাটা ফেলে দিল। স্বাভাবিকভাবেই চমকে উঠেছিলাম, ভেবেছিলাম চশমাটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। কিন্তু ভাঙা তো দূরের কথা, সেটা বিন্দুমাত্র নড়ল বলেও মনে হল না, স্থির হয়ে ঝুলে রইল শূন্যে। গিবার্নে বলল, 'মোটামুটিভাবে এই অক্ষাংশে একটি বস্তু সেকেণ্ডে 16 ফুট করে পড়ে। এই চশমাটি এখন সেকেণ্ডে 16 ফুট করে নিচে নামছে। তুমি যা দেখছো তা হল ওটা এখনো সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময় নিচে না নামার ঘটনাটা।* এর থেকে তুমি আমার অ্যাকসিলারেটরের গতির কিছুটা ধারণাও পাচ্ছ।' ধীরে ধীরে চশমাটা নামছে আর চশমার উপর ও নিচ দিয়ে সে চক্রাকারে বারবার তার হাতটা ঘোরাচ্ছে।

"শেষ পর্যন্ত নিচের দিক থেকে চশমাটাকে ধরে সেটাকে টেনে খানিকটা নামিয়ে এনে যত্ন করে টেবিলের উপর রাখল। 'কি রকম বুঝছ?' হাসতে হাসতে বলল আমায়…

"জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। একটি নিশ্চল সাইকেল-চালক চোখে পড়ল। পিছনের চাকার শেষে ধুলোর ধোঁয়ারাশি জমাট বেঁধে রয়েছে,

* আরেকটা কথা খেয়াল করো। একটি বস্তু, অর্থাৎ এক্ষেত্রে, চশমাটি নিচের দিকে নামার প্রথম সেকেণ্ডের একশো ভাগের মধ্যে দূরত্বের এক শতাংশ অতিক্রম করে না, অতিক্রম করে দশ হাজার ভাগের এক ভাগ ($S = 1/2\ gt^2$ সূত্র অনুসারে)। এই দূরত্ব মাত্র 0·5 মিমি এবং এক সেকেণ্ডের হাজার ভাগের প্রথম ভাগে এটা হবে মাত্র 0·01 মিমি।

চালকের মাথা নুয়ে রয়েছে সামনের দিকে, খুব চেষ্টা করছে টগবগে ঘোড়ায়-টানা অচল গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতে…"

"আমরা তার বাড়ির গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এসে পাষাণ মূর্তির মতো চলাচলকারী যানবাহনগুলোকে খুব খুঁটিয়ে দেখলাম। চাকাগুলোর উপরের দিক, ওই ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়াগুলোর কয়েকটা পা, চাবুকের ডগার দিকটা এবং সদ্য হাই তুলতে শুরু করা কোচোয়ানের নিচের চোয়াল—এগুলির মধ্যে যদিও গতির লক্ষণ স্পষ্টই টের পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু খুঁড়িয়ে চলা এই যানবাহনগুলোর আর সব কিছুই যেন মনে হচ্ছিল নিশ্চল। একটি মানুষের গলার অস্পষ্ট ঘর্ঘরানি ছাড়া কোনো কোলাহলও আর কানে আসছিল না! এবং এই জমাট-বাঁধা দৃশ্যের অংশ হিসেবে সেখানে একজন সহিস ছিল, সেকথা আগেই বলেছি, ছিল একজন কোচোয়ান, আর ছিল এগার জন লোক!…"

"লালচে মুখওলা ছোটখাটো চেহারার এক ভদ্রলোক এলোমেলো বাতাসের মধ্যে তাঁর খবরের কাগজটা ভাঁজ করে রাখতে গিয়ে হিমশিম খেতে খেতেই জমাট বেঁধে গেছেন। এই অলস চালচলনের মানুষগুলোর উপর দিয়ে যে মোটামুটি জোরালো একটা হাওয়া বইছে তার আরো অনেক নিদর্শন ছিল। কিন্তু আমাদের অনুভূতির ত্রিসীমানার মধ্যেও এই বাতাসের কোনো অস্তিত্ব ছিল না…"

"ওই দ্রব্যটি আমার শিরার মধ্যে কাজ শুরু করার পর থেকেই আমি যা বলেছি, ভেবেছি ও করেছি—ওই লোকজনের পরিপ্রেক্ষিতে, সাধারণভাবে এই জগতের পরিপ্রেক্ষিতে, তার সবটাই ঘটেছে চোখের পলকের মধ্যে…"

বর্তমানে বিজ্ঞানীরা সময়ের কত ক্ষুদ্র ব্যবধান মাপতে পারেন তা কি তোমরা জানতে চাও? এই শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিদ্‌রা মাত্র সেকেণ্ডের 10,000 ভাগের এক ভাগ মাপতে পারতো, আর তাঁরাই আজকে মাপতে পারছেন এক সেকেণ্ডের 10,000 কোটি ভাগের এক ভাগ। তিন হাজার বছরের তুলনায় এক সেকেণ্ড যত ছোট, এই সময়টাও ঠিক ততটাই ছোট এক সেকেণ্ডের তুলনায়!

ধীর-গতি ক্যামেরা

এইচ. জি. ওয়েল্‌স এই গল্প লেখার সময়ে ভাবতেও পারেননি যে, সত্যিই এরকম কিছু তিনি দেখতে পাবেন। সত্যিই কিন্তু তিনি তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর কল্পিত চিত্রগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর জন্য আমরা যাকে ধীর-গতি ক্যামেরা বলি তাকেই ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। চলচ্চিত্রের সাধারণ ক্যামেরা যেখানে সেকেণ্ডে 24টা করে ছবি তোলে, সেখানে এই ক্যামেরা তোলে তার অনেক গুণ বেশি। এইভাবে তোলা ফিল্ম যখন চলচ্চিত্রের রীতিমাফিক গতি অনুসারে অর্থাৎ সেকেণ্ডে 24টা করে ছবি পর্দায় ফেলে দেখানো হয় তখন

তোমরা যা কিছু দেখ তার সব কিছুই যেন স্বাভাবিকের চেয়ে ধীর-গতিতে ঘটছে বলে মনে হয়। যেমন হাই জাম্পের ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম মোলায়েম লাগে। আরো জটিল প্রকৃতির ধীর-গতি ক্যামেরা এইচ্ জি. ওয়েল্সের কল্পনার জগৎকে প্রায় পুরোপুরি দৃশ্যগোচর করে তুলবে।

আমরা কখন আরো দ্রুত সূর্যকে পাক খাই?

একবার প্যারিসের সংবাদপত্রগুলোতে নামমাত্র পঁচিশ সেণ্টাইম্সের বিনিময়ে আরামদায়ক ভ্রমণের এক বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। সাদাসিধে মানুষ অনেকেই ডাকে পয়সা পাঠিয়ে দেয়। তাদের প্রত্যেকে তারপর এই মর্মে একটি করে চিঠি পায়ঃ

"মহাশয়, শয্যার উপরে শান্তিতে শায়িত থাকুন আর মনে রাখুন যে, পৃথিবীটা ঘুরছে। প্যারিসে, এই 49° অক্ষাংশে বসে আপনি প্রতি দিন 25,000 কিমি-রও বেশি ভ্রমণ করছেন। আপনি যদি সুন্দর দৃশ্য অবলোকন করতে চান, আপনার পর্দাটা টেনে একটু সরিয়ে দিন আর নক্ষত্রখচিত আকাশ উপভোগ করুন।"

যে লোকটা চিঠিগুলো পাঠিয়েছিল সে ধরা পড়ে এবং লোক ঠকানোর জন্য তার বিচার হয়। শোনা যায় শান্তভাবে সে বিচারের রায় শোনে, যা জরিমানা হয়েছিল দিয়েও দেয়, আর তার পরেই নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গম্ভীর-ভাবে গ্যালিলিওর সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরাবৃত্তি করেঃ "হ্যাঁ, এটা ঘোরে।"

লোকটা কিছুটা অবশ্য ঠিকই বলেছিল। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর পাক খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে শুধু বিশ্বের বাসিন্দারা 'ভ্রমণ' করছে তাই নয়, এর চেয়েও জোরে ওরা ধাবিত হচ্ছে। পৃথিবীর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার ফলেই কিন্তু এটা ঘটছে। আমাদের এই গ্রহ, আমাদের আর এর উপরকার সব কিছুকে নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে মহাশূন্যে 30 কিমি পার হচ্ছে, আর সেই সঙ্গে নিজের অক্ষের উপরেও পাক খাচ্ছে। এবং এরই সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একটি মজার প্রশ্নঃ আমরা কখন সূর্যের চারদিকে সবচেয়ে দ্রুত চলি? সকালে না রাত্তিরে?

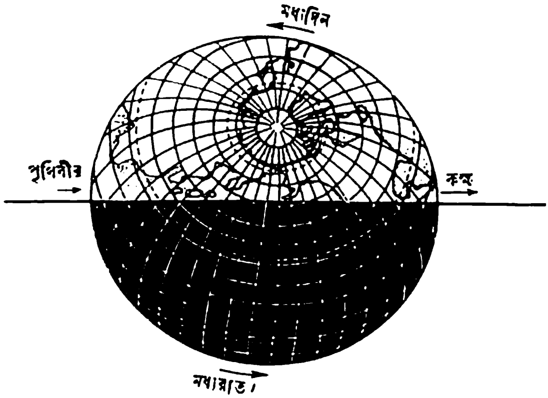
একটু ধাঁধার মত শোনাচ্ছে, তাই না? আসলে তো পৃথিবীর এক পিঠে সব সময়েই দিন আর অপর পিঠে সব সময়েই রাত। কিন্তু আমার প্রশ্নটাকে কিন্তু আজগুবি বলে বাতিল করে দিও না। লক্ষ্য করো, পৃথিবী নিজে কখন বেশি জোরে চলে একথা আমি জানতে চাইছি না। জানতে চেয়েছি, আমরা, যারা পৃথিবীর উপর বাস করি তারা কখন মহাশূন্য দিয়ে দ্রুততর চলি। এবং এটা একটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

সৌর জগতে আমাদের দুটো গতি। আমরা সূর্যের চারদিকে ঘুরি এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষের উপর পাক খাই। এই দুই গতি যুক্ত হলেও, আমরা

দিবাভাগে আছি না নিশাভাগে আছি তার উপরেই নির্ভর করছে এই যুক্তির ফলাফল।

চিত্র 6-এ দেখতে পাচ্ছ যে, মাঝরাতে পৃথিবীর অগ্রগমনের গতির সঙ্গে যোগ হচ্ছে ঘূর্ণনের গতি, কিন্তু দুপুর বেলা ঠিক তার উল্টোটা ঘটছে। পৃথিবীর অগ্রগমনের গতির থেকে বিয়োগ হচ্ছে ঘূর্ণনের গতি। ফলে, দুপুর বেলার তুলনায় মাঝ রাতে আমরা সৌরজগৎ দিয়ে বেশি জোরে চলি। যেহেতু

চিত্র 6



অন্ধকার দিকে থাকার সময় আলোকিত দিকের তুলনায় আমরা সূর্যকে দ্রুততর প্রদক্ষিণ করি।

বিষুবরেখার উপর যে কোনো বিন্দু সেকেণ্ডে আধ কিলোমিটার অতিক্রম করে, সেখানকার কোনো স্থানের দুপুর বেলা আর মাঝরাতের দ্রুতির মধ্যে তফাতটা দাঁড়ায় সেকেণ্ডে এক কিলোমিটারের মতো।

গরুর গাড়ির চাকার হেঁয়ালি

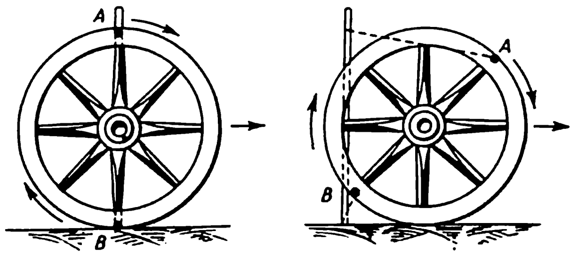
গরুর গাড়ির বা বাইসাইকেলের চাকার বাইরের কিনারায় এক ধারে এক টুকরো রঙীন কাগজ লাগিয়ে দাও। এবার লক্ষ্য করো, গাড়ি বা সাইকেলটা চলতে শুরু করলে কি হয়। ভাল করে নজর রাখতে পারলে দেখবে, রাস্তার কাছে কাগজের টুকরোটাকে যেন বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অথচ উপরের দিকে সেটা এমন হুশ করে পেরিয়ে যাচ্ছে যে, ঠাহর করাই শক্ত।

এতে কি মনে হচ্ছে না যে চাকার উপর দিকটা নিচের চেয়ে জোরে চলছে? তুমি যদি কোনো পথচলতি গাড়ির চাকার উপরের ও নিচের স্পোকগুলোর দিকে তাকাও, তাহলেও কি একই কথা মনে হবে না? সত্যিই উপরের স্পোকগুলো

যেন একসঙ্গে জুড়ে গিয়ে একটা নিরেট বস্তুর মতো দেখায়, কিন্তু নিচের স্পোক-গুলোকে স্বতন্ত্রভাবে চিনতে পারা যায়।

অসম্ভব মনে হলেও **একটি ঘূর্ণায়মান চাকার উপরিভাগ সত্যিই তার নিম্ন ভাগের চেয়ে দ্রুত চলে।** এটা যতই অবিশ্বাস্য ঠেকুক না কেন ব্যাখ্যাটা কিন্তু

চিত্র 7



কাঠি থেকে একটি চলমান চাকার দুটি বিন্দু A এবং B-র (বাঁ দিকে) দূরত্ব তুলনা করলে দেখা যায়, চাকার ওপরকার কিনারা তলার দিকের তুলনায় দ্রুত অগ্রসর হয়।

খুবই সহজ। ঘূর্ণায়মান চাকার উপরকার প্রতিটি বিন্দুর যুগপৎ দু'টি গতি আছে—একটি অক্ষদণ্ডের (axle) উপর পাক খাওয়ার গতি, আর অন্যটি অক্ষদণ্ড সমেত সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার গতি। এটাও ওই পৃথিবীর মতোই ব্যাপার। এই দুই গতির যোগে চাকার উপর ও নিচে তার ফলাফল কিন্তু হয় ভিন্ন। উপর দিকে চাকার ঘূর্ণনের গতির সঙ্গে তার চলনের গতি যুক্ত হয়, কারণ দুটোরই একই দিশা। চাকার তলার দিকে ঘূর্ণনের দিশা বিপরীতমুখী, ফলে চলনের গতি থেকে এটি বিয়োগ হচ্ছে।

একটি সহজসাধ্য পরীক্ষার সাহায্যে এই ব্যাপারটা প্রমাণ করা যায়। একটি নিশ্চল গাড়ির চাকার পাশেই অক্ষের বিপরীত দিকে মাটির মধ্যে একটা লাঠি পুঁতে দাও। তারপর এক টুকরো চক্ বা কয়লা নিয়ে চাকার একেবারে মাথায় ও একেবারে তলার দিকে দুটো দাগ দাও। তোমার চিহ্নদুটো থাকবে আড়াল হয়ে ওই কাঠিটার ঠিক পিছনে। এবার গাড়িটাকে ডানদিকে সামান্য একটু ঠেলে দাও (চিত্র 7) যাতে অক্ষটা কাঠি ছেড়ে 20 থেকে 30 সেমি সরে যায়। লক্ষ্য করে দ্যাখো, দাগ দুটো কিভাবে সরে গেছে। দেখবে, উপরের A দাগটা নিচের B দাগটার চেয়ে অনেক বেশি সরে গেছে। নিচের দাগটা প্রায় যেখানে ছিল সেখানেই রয়ে গেছে।

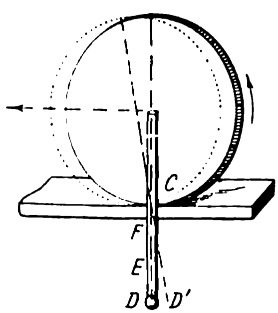
চাকার সবচেয়ে মন্থর অংশ

আমরা দেখলাম একটা চলন্ত গাড়ির চাকার সব অংশগুলো সমান গতিতে এগোয় না। কোন্‌ অংশটা তাহলে সবচেয়ে মন্থর? যেটা রাস্তা ছুঁয়ে আছে। নিখুঁতভাবে বললে, স্পর্শের মুহূর্তে, এই অংশটি পুরোপুরি গতিহীন। কথাটা কিন্তু শুধু চলন্ত চাকার বেলাতেই খাটে। কোনো চাকা যদি একটি স্থির অক্ষের উপর পাক খায়, ব্যাপারটা এরকম হয় না। উদাহরণ স্বরূপ একটি গতি-নিয়ামক চক্রের (ফ্লাই-হুইলের) সব অংশই সমান গতিতে ঘোরে।

মাথা খাটাবার ধাঁধা

এই আরেকটা ধাঁধার মতো সমস্যার কথা বলছি। একটা রেলগাড়ি লেনিনগ্রাদ থেকে মস্কো যাচ্ছে। এই রেলগাড়ির মধ্যে কি এমন কোনো বিন্দু থাকতে পারে যা ওই রেললাইনের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দিকে এগোচ্ছে? হ্যাঁ, পারে বলেই জানা গেছে। প্রতি মুহূর্তেই রেলগাড়ির প্রত্যেকটা চাকায় ওই রকম কিছু বিন্দুতে এটা ঘটছে। এগুলোর অবস্থান চাকার নিচের কিনারায় যে অংশটা রেল-লাইনের উপরের তলের নিচে ঝুলে থাকে। রেলগাড়ি যখন সামনে যায়, এই বিন্দুগুলো যায় পিছন দিকে। কিভাবে এটা ঘটছে সেটা তুমি নিজেই খুব সহজে একটা পরীক্ষা করে দেখতে পার। প্ল্যাস্টিসিন দিয়ে একটা দেশলাই কাঠিকে এমনভাবে একটা মুদ্রার গায়ে লাগিয়ে দাও যাতে কাঠিটা চিত্র ৪-এর মতো ব্যাসার্ধের তলে খানিকটা বেরিয়ে থাকে। একটা চ্যাপ্টা স্কেলের

চিত্র ৪

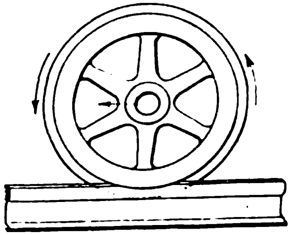


মুদ্রাটিকে যখন বাঁ দিকে গড়ানো হয়, দেশলাই কাঠির উদ্গত অংশের F, E এবং D বিন্দু পিছন দিকে যায়।

কিনারার উপর কাঠি সমেত মুদ্রাটাকে খাড়া করে বসিয়ে দাও এবং বুড়ো আঙুলের সাহায্যে এটাকে এর স্পর্শবিন্দু C-র উপর ধরে রাখো। এবার

এটাকে পাক খাইয়ে আগু-পিছু করো। দেখবে দেশলাই কাঠির যে অংশটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে তার উপরকার *F*, *E* এবং *D* বিন্দুগুলো এগোচ্ছে না, পিছিয়ে যাচ্ছে। দেশলাই কাঠির শেষ প্রান্তের *D* বিন্দুটি মুদ্রার কিনারা থেকে যত দূরে থাকবে ততই বেশি করে নজরে পড়বে এই পশ্চাদগতি (*D* বিন্দু সরে এসেছে *D*′-এ)।

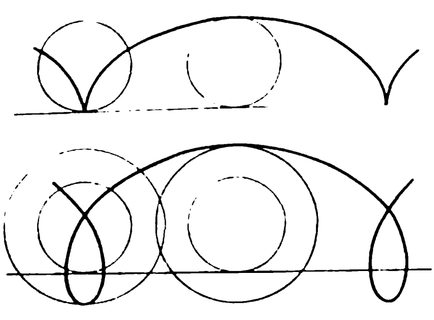
চিত্র 9



ট্রেনের চাকা যখন বাঁ দিকে গড়ায়, তার রিমের তলার অংশ যায় উল্টো দিকে।

ট্রেনের চাকার কিনারায় বিন্দুগুলিও এইভাবে এগোয়। কাজেই রেলগাড়িতে এমন কিছু বিন্দু আছে যা সামনের দিকে নয়, পিছনের দিকে এগোয়, আমার এই কথা শুনে তোমার আর অবাক হওয়া উচিত নয়। এটা সত্যি যে, এই পশ্চাদগতির

চিত্র 10



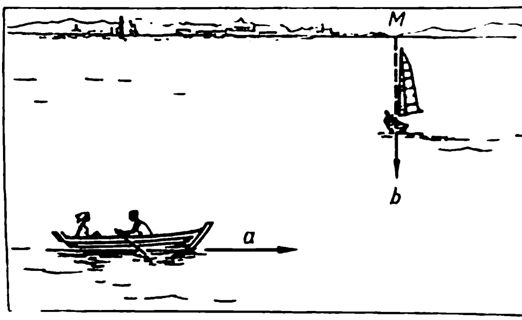
ওপরে : গাড়ির চলমান চাকার ওপরকার প্রত্যেকটি বিন্দু যে রেখাচিত্র (একটা সাইক্লয়েড) সৃষ্টি করে। নীচে : ট্রেনের চাকার রীমের প্রত্যেকটি বিন্দু যে রেখাচিত্র সৃষ্টি করে।

স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের তুচ্ছ ভগ্নাংশ মাত্র। তবু, আমাদের সাধারণ ধারণা যাই হোক্ না কেন, চলন্ত রেলগাড়িতে পশ্চাদগতি থাকে। 9 ও 10 নং চিত্র এই ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করবে।

পাল-তোলা নৌকাটা কোথা থেকে রওনা হয়েছে ?

একটা দাঁড়-টানা নৌকা একটা হ্রদ পার হচ্ছে। 11 নং চিত্রে *a* তীরটি তার বেগের ভেক্টরকে (সদিক) নির্দেশ করছে। একটি পাল-তোলা নৌকাও তার গতিপথের দিকে এগিয়ে আসছে। *b* তীরটি তার বেগের ভেক্টর নির্দেশক। পাল-তোলা নৌকাটা কোথা থেকে রওনা হয়েছে ? স্বাভাবিকভাবেই তুমি সঙ্গে সঙ্গে *M* বিন্দু দেখিয়ে দেবে। কিন্তু ডিঙি নৌকাটার লোকেদের কাছ থেকে তুমি ভিন্ন উত্তর পাবে। কেন ?

চিত্র 11

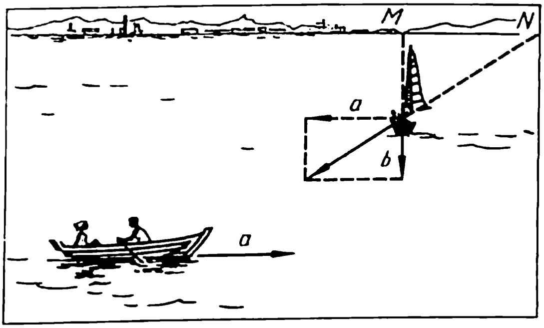


পালতোলা নৌকা আড়াআড়ি ভাবে দাঁড়-টানা নৌকার গতিপথের দিকে এগিয়ে আসছে। a এবং b তীরচিহ্ন বেগ নির্দেশ করছে। দাঁড়টানা ডিঙির আরোহীরা কি দেখবে ?

তারা ওই পাল-তোলা নৌকাটাকে তাদের গতির সমকোণে চলতে দেখছে না, কারণ তারা বুঝতে পারছে না যে, তারা নিজেরাও গতিশীল। তারা নিজেদের নিশ্চল আর বাকী সব কিছুই নিজেদের ডিঙি নৌকার দ্রুতিতে এবং বিপরীত মুখে এগোচ্ছে বলে মনে করছে। তাদের দৃষ্টিতে পাল-তোলা নৌকাটা শুধু *b* তীরের মুখ বরাবর এগোচ্ছে না, এগোচ্ছে দাগ-কাটা *a* রেখাটা ধরে—তাদের নিজে-দের গতির বিপরীতে (চিত্র 12)। পাল-তোলা নৌকাটার এই দু'টি গতিকে—একটি বাস্তব ও একটি কাল্পনিককে—যোগ করা হয় সামান্তরিক সূত্র (rule of the parallelogram) অনুসারে। তার ফলে দাঁড়-টানা নৌকার আরোহীরা মনে করে পাল-তোলা নৌকাটা সামান্তরিকের কর্ণ *ab* ধরে আসছে। এবং এই জন্যই তারা মনে করে যে, পাল-তোলা নৌকাটা *M* বিন্দু থেকে নয়, ডিঙি নৌকার আরো সামনে *N* বিন্দু থেকে রওনা হয়েছিল (চিত্র 12)।

নিজ কক্ষপথে পরিক্রমারত পৃথিবীর সঙ্গে চলবার সময় আমরাও নক্ষত্রদের অবস্থানের ভুল নকশা আঁকি। ঠিক যেমন ভুল করেছিল ডিঙির লোকেরা পাল-

চিত্র 12



দাঁড়টানা ডিঙির আরোহীরা মনে করবে পালতোলা নৌকাটা তেরচা ভাবে, N বিন্দু থেকে, তাদের দিকে আসছে।

তোলা নৌকাটা কোথা থেকে ছেড়েছে প্রশ্ন করার পর। অবশ্য আলোর তুলনায় পৃথিবীর দ্রুতি অতি সামান্য (10,000 গুণ কম) এবং তার ফলে আলোকের অপেরণ (aberration of light) নামে পরিচিত এই নাক্ষত্রিক বিচ্যুতির (stellar displacement) পরিমাণটা খুবই তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু তবু, জ্যোতির্বিজ্ঞানের যন্ত্রের সাহায্যে এটা আমরা ধরতে পারি।

পাল-তোলা নৌকার সমস্যাটা কি তোমার ভাল লেগেছে? তাহলে একই সমস্যার সঙ্গে জড়িত আরো দুটো প্রশ্নের জবাব দাও। প্রথমতঃ, পাল-তোলা নৌকার লোকের ধারণা অনুসারে ডিঙি নৌকাটা কোন্ দিকে এগোচ্ছে? দ্বিতীয়তঃ, পাল-তোলা নৌকার লোকের ধারণা অনুযায়ী ডিঙিটা কোথায় গিয়ে ভিড়বে? উত্তর দিতে হলে, তোমাকে *a* ভেক্টরের (চিত্র 12) উপর বেগের সামান্তরিক আঁকতে হবে, যার কর্ণটি নির্দেশ করবে, পাল-তোলা নৌকার লোকেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ডিঙি নৌকটার তেরছাভাবে চলাকে, ওটা যেন পাড়ের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

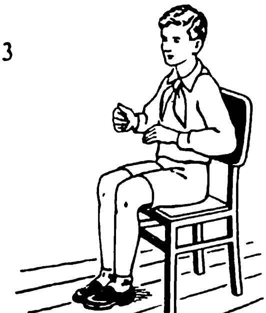
পরিচ্ছেদ ২

অভিকর্ষ ও ওজন। লিভার, চাপ

উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করো!

তোমাকে চেয়ারের উপর একটা বিশেষ ভঙ্গিতে বসতে বলব, তা বলে যে বেঁধে রাখব তা নয়। এবার যদি বলি যে, তুমি ওই চেয়ার ছেড়ে উঠতে পারবে না, তাহলে নিশ্চয় ভাববে আমি ঠাট্টা করছি। বেশ তো, দেখাই যাক না। চিত্র 13-তে ছেলেটা যেভাবে বসে আছে ঠিক অমনি করে একটা চেয়ারে বসে পড়ো। শিরদাঁড়া খাড়া রেখে বসো আর চেয়ারের নিচে পা ঢুকিও না। এবার তোমার পা না নাড়িয়ে বা সামনে না ঝুঁকে ওঠার চেষ্টা করো। যতই চেষ্টা করো— পারবে না। যতক্ষণ না চেয়ারের তলায় পা ঢোকাচ্ছ বা সামনে ঝুঁকে পড়ছ, উঠে দাঁড়াতে পারবে না।

চিত্র 13

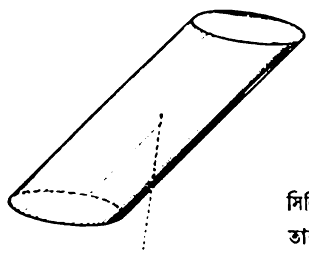


উঠে দাঁড়ানো অসম্ভব।

ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে, সাধারণভাবে বস্তুর ও বিশেষভাবে মানুষের শরীরের স্থিতিসাম্যের কথা বলে নিই। একটা বস্তু শুধু সেই ক্ষেত্রেই উল্টে পড়বে না, যখন তার ভরকেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখাটি বস্তুটির ভূমির মধ্য দিয়ে প্রসারিত

হয়। 14 নং চিত্রের হেলানো সিলিন্ডারটি পড়বেই পড়বে। কিন্তু, অপর দিকে, এর ভরকেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখাটি যদি ভূমির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হত, তাহলে সিলিন্ডারটি কিছুতেই উল্টে পড়ত না। একই কারণে, পিসা ও বোলোনার হেলানো স্তম্ভ (15 নং চিত্রের বাঁ দিকে) অথবা আরখানগেলস্কের হেলানো গীর্জা (15 নং চিত্রের ডান দিকে), হেলে থাকা সত্ত্বেও পড়ে যাচ্ছে না। এদের

চিত্র 14



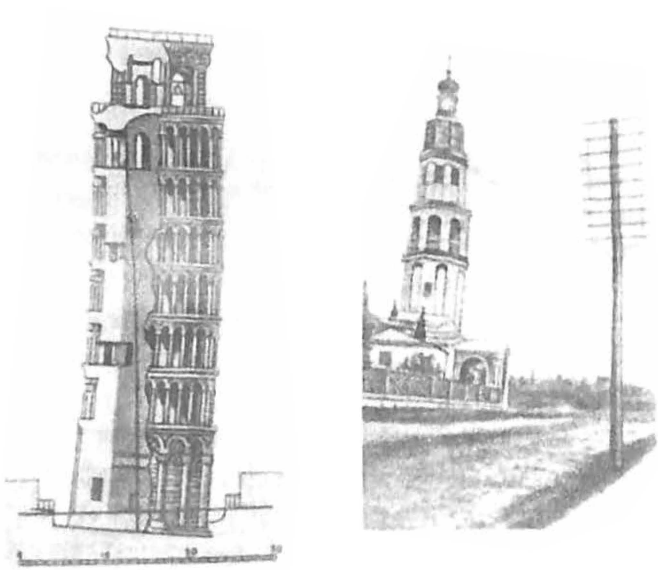
সিলিণ্ডারটি উল্টে পড়বেই, কারণ ভরকেন্দ্র থেকে তার লম্বটি রয়েছে ভূমির বাইরে।

ভরকেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখা এদের ভূমির বাইরে বেরিয়ে যায়নি। আর একটা কারণ হল তাদের ভিতগুলো মাটির অনেকটা নিচে পর্যন্ত ঢোকানো আছে।

তোমার শরীরের ভরকেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখাটি যদি তোমার দু'পায়ের বহিসীমানা দিয়ে আঁকা ক্ষেত্রটির মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় তবেই তুমি কিছুতেই উল্টে পড়বে না (চিত্র 16)। এই জন্যই এক পায়ের উপর দাঁড়ানো অত শক্ত এবং আরো শক্ত টান্-টান্ করে রাখা দড়ির উপর সাম্যাবস্থা বজায় রাখা। আমাদের শরীরের 'ভূমি'-টি খুবই ছোট এবং ভরকেন্দ্র থেকে উল্লম্ব রেখাটি খুব সহজেই এর সীমানার বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে। তুমি কি কোনো অভিজ্ঞ নাবিকের হাঁটার অদ্ভুত ধরন লক্ষ্য করেছ? তিনি তাঁর জীবনের অধিকাংশটাই কাটিয়েছেন টলমলে জাহাজের উপর, যেখানে তাঁর শরীরের ভরকেন্দ্র থেকে প্রসারিত উল্লম্ব রেখাটি যে কোনো মুহূর্তে তাঁর 'ভূমি'-র বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে—সেইজন্য ডেকের উপর তিনি দু'পা অনেকটা ফাঁক করে, যতখানি সম্ভব জায়গা জুড়ে হাঁটতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। এতে তিনি উল্টে পড়ার হাত থেকে রেহাই পান। স্বাভাবিকভাবেই, স্থলভাগেও চলার সময় তিনি তাঁর অভ্যস্ত কায়দাতেই হাঁটা-চলা করেন।

এবার ভিন্ন ধরনের আরেকটি উদাহরণ। এক্ষেত্রে একজন নিজের ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে কী সুন্দরই না একটি ভঙ্গি ধারণ করে। যে সব কুলিরা মাথায় করে মাল বয়, তাদের একটা মর্যাদাব্যঞ্জক ভঙ্গি গ্রহণ করতে দেখেছ নিশ্চয়। তুমি হয়ত কলসী মাথায় নিয়ে মহিলাদের অপূর্ব স্ট্যাচুও দেখেছ। তারা মাথার উপর ওজন বয় বলেই মাথা ও শরীরটাকে সোজা রাখতে হয়। যদি তারা কোনো দিকে ঝোঁকে তবে ভরকেন্দ্র থেকে টানা উল্লম্ব রেখাটি ভূমির বাইরে

চিত্র 15



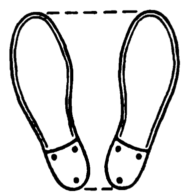
বাঁ দিকে : পিসার হেলানো স্তম্ভ।
ডান দিকে : আরখানগেলস্কের হেলানো গীর্জা। পুরনো আলোকচিত্র থেকে মুদ্রিত।

সরে যায় এবং তাদের সাম্যও নষ্ট হয়। মাথায় ওজন থাকায় এদের ভরকেন্দ্র সাধারণ মানুষের চাইতে একটু উপরে থাকে।

এই পরিচ্ছদের গোড়ায় যে সমস্যার কথা বলেছিলাম, সেই প্রসঙ্গে ফিরে আসি। যে ছেলেটা বসে আছে তার ভরকেন্দ্র রয়েছে দেহের মধ্যে মেরুদণ্ডের কাছে—তার নাভির তল থেকে মোটামুটি 20 সেমি মত উপরে। এই বিন্দু থেকে একটি লম্ব টানো। রেখাটি চেয়ারের মাঝ দিয়ে প্রসারিত হয়ে পায়ের

পিছনে পেঁছবে। ইতিমধ্যেই তুমি জেনে ফেলেছ যে, একটা লোককে উঠে দাঁড়াতে হলে লম্ব রেখাটিকে তার 'পায়ের দ্বারা দখল করা জায়গার' মধ্যে কোথাও দিয়ে প্রসারিত হওয়া দরকার। ফলে, উঠে দাঁড়াবার সময় হয় আমাদের সামনে ঝুঁকে ভরকেন্দ্রটিকে সরিয়ে আনা দরকার অথবা আমাদের পা দুটোকে চেয়ারের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাদের 'ভূমি'কে ভরকেন্দ্রের নিচে স্থাপন করা দরকার। চেয়ার থেকে উঠবার সময় সচরাচর তাই করি আমরা। এটা করতে না দিলে আমরা কখনোই উঠে দাঁড়াতে পারবো না। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই সেটা তোমরা এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে গেছ।

চিত্র 16



একজন যখন দাঁড়িয়ে থাকে, ভরকেন্দ্র থেকে লম্বটি তার দু'পায়ের পাতা অধিকৃত ক্ষেত্রের ভিতরে থাকে।

হাঁটা এবং ছোটা

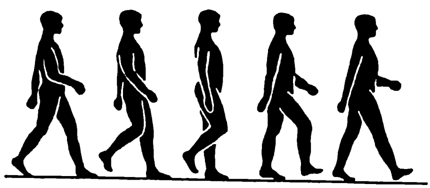
যে সব কাজ তুমি দিনে হাজার বার কর, এবং দিনের পর দিন কর, সেসব ব্যাপারে তোমার বেশ ভাল ধারণা থাকার কথা, তাই না? তুমি বলবে, হ্যাঁ। কিন্তু কথাটা মোটেই সত্যি নয়। উদাহরণ হিসেবে হাঁটা আর ছোটার কথাই ধরা যাক। এর চেয়ে বেশি পরিচিত আর কি আছে? কিন্তু আমি ভাবছি আমরা হাঁটা বা ছোটার সময় ঠিক কি করি, বা এই দুয়ের মধ্যে কি তফাত, সে সম্বন্ধে তোমাদের ক'জনের স্পষ্ট ধারণা আছে। দেখা যাক একজন শারীরতত্ত্ববিদ হাঁটা এবং ছোটা সম্বন্ধে কি বলেন। আমি নিশ্চিত যে, তাঁর বর্ণনা তোমাদের কাছে রীতিমত অভিনব ঠেকবে। (উদ্ধৃতিটা অধ্যাপক পল বার্ট-এর 'জীববিদ্যা বিষয়ক বক্তৃতামালা' থেকে গৃহীত। ছবিগুলো আমার নিজের।)

"ধরো একটা লোক এক পায়ের উপর, ডান পায়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। আরো মনে করো, সে তার গোড়ালিটা উঁচু করছে এবং একই সঙ্গে সামনের দিকে ঝুঁকছে। [হাঁটা বা ছোটার সময় একজন লোক মাটির উপর থেকে চাপ দিয়ে পা তুলে নেওয়ার সময় নিজের ওজনের অতিরিক্ত প্রায় ২০ কেজি চাপ দেয়। কাজেই দাঁড়াবার চেয়ে চলবার সময় মানুষ জমির উপর বেশি চাপ দেয়। —Ya.P.] এরকম একটা অবস্থায় ভরকেন্দ্র থেকে টানা লম্ব স্বাভাবিকভাবেই ভূমির বাইরে চলে যায় এবং মানুষটির সামনের দিকে পতন তখন হয়ে ওঠে

অনিবার্য। পতন যখন সবে শুরু করেছে, সেই মুহূর্তেই লোকটি কিন্তু তাড়াতাড়ি তার বাঁ পা-টাকে এগিয়ে দেয় সামনের দিকে—যাতে বাঁ পা-টাকে ভরকেন্দ্র থেকে টানা লম্বর সামনে মাটির উপর রাখা যায়। এর আগে অবধি বাঁ পা-টা কিন্তু ছিল শূন্যে। কাজেই লম্বটা এমন একটা ক্ষেত্রের মধ্যে এসে পড়ে, যার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে দু'পায়ের ভারবাহী বিন্দুগুলো জুড়ে টানা রেখাগুলি দ্বারা। এইভাবে আবার সাম্যাবস্থা ফিরে আসে; আর লোকটিও সামনের দিকে এক পা এগিয়ে যায়।

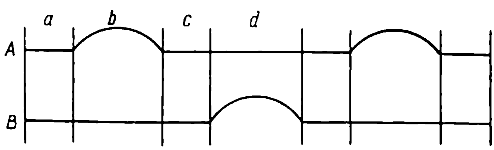
"সে এইরকম ক্লান্তিকর অবস্থানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইলে, তাকে আবারো খানিকটা ঝুঁকে পড়তে হবে সামনের দিকে।

চিত্র 17



লোকে কিভাবে হাঁটে। হাঁটবার সময়কার বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবদ্ধ ছবি

চিত্র 18



একটি লেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে হাঁটবার সময় পায়ের গতি কিরকম হয়। A রেখাটি বাঁ পা এবং B-রেখাটি ডান পা। সরলরেখাগুলো বোঝাচ্ছে পা রয়েছে মাটির ওপরে এবং বক্র রেখাগুলো বোঝাচ্ছে পা রয়েছে শূন্যে। a সময় সীমার মধ্যে দুটো পা'ই রয়েছে মাটিতে, b সময় সীমার মধ্যে A পা রয়েছে শূন্যে এবং B পা তখনো মাটিতে; c সময়সীমার মধ্যে দুটো পা-ই আবার মাটি ছুঁয়ে রয়েছে। যত দ্রুত হাঁটা যায় ততই ছোট হয়ে আসে a ও c সময়সীমা (20 নং ছবির "দৌড়বার" লেখের সঙ্গে তুলনা করো)।

তারপর ভরকেন্দ্র থেকে টানা লম্বটিকে ভূমির বাইরে সরিয়ে দিয়ে আবারো ঠিক উল্টে পড়ার মুহূর্তে সামনের দিকে পা ছাড়তে হবে—এবার কিন্তু ডান পা। এইভাবেই সে সামনের দিকে আরেক পা এগিয়ে আসে। এটাই বারে বারে চলতে থাকে। কাজেই বলা যেতে পারে, হাঁটা হচ্ছে বারবার সামনের দিকে

পতনের একটি ঘটনা বিশেষ, যার হাত থেকে বাঁচবার জন্য ঠিক সময় মতো পিছনের পা-টিকে একটি খুঁটি হিসাবে ছুঁড়ে দেওয়া হয়।

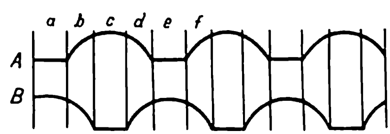
"ব্যাপারটার মর্মে পৌঁছনোর জন্য চেষ্টা করা যাক। ধরো প্রথম পদক্ষেপটা করা হয়ে গেছে। ঠিক এই মুহূর্তে ডান পা-টা এখনো পেছনের মাটির উপরে রয়েছে এবং বাঁ পা-টা ইতিমধ্যেই সামনের মাটি ছুঁয়েছে। পাদুটো যদি খুবই কাছাকাছি ফেলা না হয়ে থাকে তাহলে তাকে তার গোড়ালিটাকে তুলতেই হবে, কারণ এই ওঠানো ডান গোড়ালির সাহায্যেই মানুষ সামনে ঝুঁকতে ও তার সাম্যাব্যবস্থা ভাঙতে সক্ষম হয়। এই বাঁ পায়ের গোড়ালিটাই প্রথম মাটি স্পর্শ করে। তারপরেই যখন পুরো বাঁ পায়ের পাতাটা মাটির

চিত্র 19



লোকে কিভাবে দৌড়য়। ছোটবার সময়কার বিভিন্ন অবস্থার শ্রেণীবদ্ধ ছবি থেকে দেখা যাচ্ছে কখন দুটো পা-ই শূন্যে থাকে।

চিত্র 20



দৌড়বার সময়ে একজনের পায়ের গতি কিরকম হয় দেখানো হচ্ছে এই লেখাটিতে (18 নং ছবির সঙ্গে তুলনা করো)। বিশেষ কতকগুলি সময়সীমায় (b, d এবং f) দুটো পা-ই রয়েছে শূন্যে। হাঁটার ও দৌড়বার মধ্যে এইটাই তফাৎ।

উপর এসে পড়ে, ডান পা-টা পুরোপুরি উপরে তোলা হয় এবং সেটা আর তখন মাটি ছুঁয়ে থাকে না। ইতিমধ্যে উরুর মাংসপেশীর সংকোচন হাঁটুর কাছে সামান্য ভাঁজ-করা বাঁ পা-কে সোজা করে দেয়। ফলে বাঁ-পা মুহূর্তের জন্য খাড়া হয়ে থাকে। এর ফলে অর্ধবক্র ডান পা মাটি স্পর্শ না করেই সামনে এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দেহের গতির সঙ্গে তাল রেখে ডান পায়ের গোড়ালিটা ঠিক সময়ে মাটিতে

এসে পড়ে, যার ফলে সামনের দিকে এগোনোর জন্য পরবর্তী পদক্ষেপটা করা সম্ভব হয়। এই মুহূর্তে যে বাঁ পায়ের শুধু আঙ্গুলগুলিই মাটি ছুঁয়ে আছে, এবং উপরে ওঠার জন্য তৈরী, সেটাও পর্যায়ক্রমে এই রকম ভঙ্গিমা লাভ করবে।

"হাঁটার সঙ্গে ছোটার তফাত হল, এক্ষেত্রে মাংসপেশীর আকস্মিক সংকোচন মাটিতে রাখা পা-টাকে সজোরে সোজা করে দিয়ে দেহটাকে এমনভাবে সামনে ঠেলে দেয় যাতে দেহটা খুবই অল্প সময়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে মাটির সংস্পর্শ ত্যাগ করে। দেহটা তখন আবার অন্য পায়ের উপর ভর রেখে নেমে আসে। দেহটি শূন্যে থাকার সময়েই এই অপর পা-টি দ্রুত এগিয়ে আসে সামনে। ছোটা বলতে একাদিক্রমে এক পা থেকে আর এক পা-র উপর ভর রেখে লাফ মেরে মেরে এগিয়ে চলাই বোঝায়।"

সমতল রাস্তায় হাঁটবার সময় মানুষের কোনো শক্তিক্ষয় হয় না বলে যারা ভাবেন তারা খুবই ভুল করেন। প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে পথচারীর দেহের ভরকেন্দ্র মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার উপরে উঠে আসে। একটি হিসেব থেকে দেখা যায় যে, অনুভূমিক রাস্তা দিয়ে কিছু দূর হাঁটতে যা শক্তি খরচ হয়, তার পনের গুণ প্রয়োজন হয় পথচারীর দেহকে ওই দূরত্বের উচ্চতায় তোলবার সময়।

চলন্ত গাড়ী থেকে কিভাবে লাফাতে হয়

বেশির ভাগ লোকেই বলবে যে, জাড্যের সূত্র অনুমোদনে গাড়িটা যে দিকে এগোচ্ছে সেই দিকেই লাফাতে হবে। কিন্তু এর সঙ্গে জাড্যের কি সম্পর্ক? আমি বাজী রেখে বলতে পারি, তুমি যে কোনো লোককে এই প্রশ্ন করে দেখ, সে থতমত খেয়ে যাবে, কারণ, জাড্যের নিয়মই যদি মানতে হয় তো লোকের লাফ দেওয়া উচিত পিছন দিকে, গাড়ির গতির বিপরীত মুখে। আসলে জাড্যের গুরুত্ব এখানে গৌণ। আমরা যদি সামনে লাফ দেওয়ার মূল কারণটাকে দেখতে পাই—যে কারণটার সঙ্গে জাড্যের কোনো সম্পর্কই নেই—তাহলে আমরা সত্যিই ভাবতে শুরু করব যে, আমাদের লাফ দেওয়া উচিত পিছন দিকেই, সামনের দিকে নয়।

ধরো, একটা চলন্ত গাড়ী থেকে তোমায় লাফিয়ে নামতে হবে। তখন কি ঘটবে? লাফ দেওয়ার সময়, ঠিক যে মুহূর্তে তুমি গাড়ী ত্যাগ করলে, তখন জাড্যের দরুন তোমার দেহটাও গাড়ির সমান বেগে সামনের দিকে এগোতে চাইছে। সামনের দিকে লাফ দিলে, এই বেগ কমা তো দূরের কথা, উল্টে সেটা বেড়েই যাবে। তাহলে কি আমরা পিছনে লাফ দেব? কারণ সেক্ষেত্রে জাড্যের দরুন আমাদের দেহের যে বেগ রয়েছে তার থেকে লাফ-জনিত বেগটিকে নিশ্চয় বাদ দেওয়া যাবে এবং তার ফলে মাটি স্পর্শ করার পর আমাদের দেহটিকে উল্টে ফেলার চাপটাও কমে যাবে?

কিন্তু, চলন্ত গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামার সময় লোকে সর্বদাই গতির অভিমুখে সামনের দিকে লাফিয়ে নামে। সত্যিই কিন্তু এটাই সেরা উপায়, এবং এটা বহুদিনের এক পরীক্ষিত সত্য। আমি জোরালো ভাষায় বারণ করে দিচ্ছি, খবর্দার পিছন দিকে লাফিয়ে নামার অসুবিধেটা কী সেটা পরীক্ষা করার চেষ্টা করবে না।

আমরা যেন পরস্পর বিরোধী দুটো বক্তব্যের সম্মুখীন হয়েছি, তাই না? দ্যাখো, আমরা সামনে-পিছনে যে দিকেই লাফাই না কেন, পড়বার আশংকাটা কিন্তু থেকেই যায়, কারণ আমাদের পা যখন মাটি স্পর্শ করে থেমে পড়ে, তখনও কিন্তু আমাদের শরীরের অন্যান্য অংশগুলো এগোতে থাকে। পিছন দিকে না লাফিয়ে সামনের দিকে লাফালে আমাদের দেহাংশগুলো আরো বেশী গতিতে এগিয়ে যায়, সেকথা আগেই বলেছি। কিন্তু পিছনের চেয়ে সামনে লাফানো অনেক নিরাপদ, কেননা, সেক্ষেত্রে আমরা টাল সামলাতে যান্ত্রিকভাবেই একটা পা আগে বাড়িয়ে দিই বা কয়েক পা ছুটে এগিয়ে যাই। এটা আমরা 'না ভেবেই' করি; অনেকটা যেন হাঁটারই মতো। সত্যি বলতে, আমরা বলবিদ্যা অনুসারে আগেই তো বলেছি যে, হাঁটা হল 'পর্যায়ক্রমে আমাদের দেহের কতকগুলি সম্মুখ পতন', যেটা বাঁচানো হয় একটা পা বাড়িয়ে দিয়ে। পা বাড়িয়ে দিয়ে এই বাঁচানোর ব্যাপারটা ঘটানো যায় না বলেই পিছনের দিকে পতন আরো বিপজ্জনক। তাছাড়া যদিও বা সামনের দিকে পড়ি, আমরা হাত দিয়ে ঠেকিয়ে আঘাতের মাত্রা কমাতে পারি। পিছনের দিকে পড়লে সেটাও আর সম্ভব হয় না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছ, সামনের দিকে লাফ মারাটা যে নিরাপদ সেটা যতটা না জাড্যের কারণে, তার চেয়ে বেশী নিজেদের কেরামতির কারণে। এই নিয়মটা কিন্তু আদৌ খাটে না আমাদের জিনিসপত্রের বেলায়। চলন্ত গাড়ী থেকে একটা বোতলকে যদি সামনে ছুঁড়ে দেওয়া হয় তাহলে মাটিতে পড়ে সেটা ভেঙে যাবার সম্ভাবনা, পিছনে ছুঁড়লে যা হত তার থেকে, অনেক বেশী। কাজেই চলন্ত গাড়ী থেকে তোমায় যদি নামতে হয় এবং সঙ্গে মালপত্র থাকে, তাহলে আগে মালপত্র-গুলো পিছনদিকে ছুঁড়ে দাও এবং তারপর নিজে লাফ মারো সামনে। ট্রামের কণ্ডাক্টার ও টিকিট চেকারের মতো অভিজ্ঞ লোকেরা অনেক সময় ট্রামের গতির দিকে মুখ করে এক পা পিছিয়ে লাফ মেরে নামেন। এতে তারা দুটো সুবিধা পান: প্রথমতঃ জাড্যের দরুন প্রাপ্ত বেগটা তাঁরা কমিয়ে দেন, এবং দ্বিতীয়ত সামনের দিকে মুখ করে নামার দরুন পিছনের দিকে পড়ার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করেন। কাজেই পড়লেও তাঁরা সামনের দিকে মুখ করে পড়বেন।

হাতে করে বুলেট ধরা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই অদ্ভুত ঘটনার কথা জানা গিয়েছিল। একজন ফরাসী বৈমানিক দু' কিলোমিটার উঁচু দিয়ে উড়ে যাবার সময় মুখের কাছে

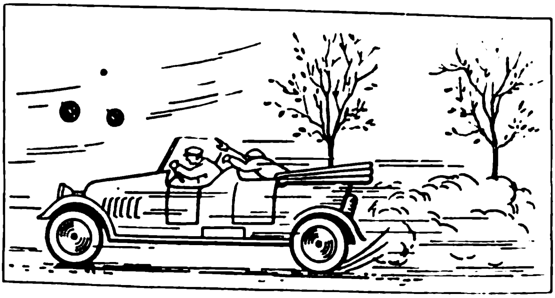
কি একটা দেখে মনে করলেন একটা মাছি। দু' হাত দিয়ে সেটাকে আঁকড়ে ধরে দেখে তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন, একটা জার্মান বুলেটকে ধরে ফেলেছেন। এ যেন সেই সুবিখ্যাত ব্যারন মুনচাউসেনের আষাঢ়ে গল্পের মতো শোনাচ্ছে। মুনচাউসেন খালিহাতে কামানের গোলা ধরেছিলেন বলে দাবি করতেন! কিন্তু এই বুলেট ধরার গল্পের মধ্যে অবিশ্বাস্য কিছু নেই।

একটা বুলেট সারাক্ষণ তার 800-900 মি/সেকেন্ড প্রাথমিক বেগে ধেয়ে যায় না। বাতাসের প্রতিরোধের দরুন যাত্রাপথের শেষ দিকে তার বেগ কমতে কমতে মাত্র 40 মি/সেকেন্ডে এসে নামে। একটা এরোপ্লেনও প্রায় একই গতিতে অগ্রসর হয়। কাজেই এমন একটা অবস্থা হতেই পারে যখন দেখা যাবে বুলেট আর এরোপ্লেনের গতি সমান। সে ক্ষেত্রে এরোপ্লেন এবং তার বৈমানিকের পরিপ্রেক্ষিতে বুলেটটা স্থির হয়ে থাকবে কিংবা তার সামান্য কিছু গতি থাকতেও পারে। বৈমানিক অতি সহজেই সেটাকে ধরে ফেলতে পারে। হাতে যদি গ্লাভস পরা থাকে তাহলে তো কথাই নেই, কেননা, বাতাস কেটে এগোবার সময় বুলেটটা বেশ তেতেই উঠবে।

বোমার মতো তরমুজ

আমরা দেখেছি, বিশেষ পরিস্থিতিতে একটা বুলেটের সেই 'কামড়' আর নাও থাকতে পারে। কিন্তু এমন উদাহরণও আছে যখন আলতোভাবে ছোঁড়া

চিত্র 21



দ্রুত-গতি গাড়ির দিকে ছোঁড়া তরমুজ বোমার মতই বিপজ্জনক

'নিরীহ' বস্তুও সংঘাতের পর ধ্বংসাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। 1924-এ লেনিনগ্রাদ-টিকলিস মোটর-দৌড়ের সময়ে ককেশীয় কৃষকরা রেসিং গাড়ির দিকে তরমুজ,

আপেল প্রভৃতি ছুঁড়ে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু এই নির্দোষ উপহারগুলি গাড়িগুলোকে ভীষণভাবে তুবড়ে দিয়েছিল এবং চালকদের গুরুতর-ভাবে আহত করেছিল। এরকমটা ঘটার কারণ হল, নিক্ষিপ্ত তরমুজ বা আপেলের বেগের সঙ্গে মোটরের বেগ যুক্ত হয়ে ফলগুলোকে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। প্রতি ঘণ্টায় 120 কিমি বেগে অগ্রসর একটা মোটরের দিকে ছোড়া একটা 4 কেজি তরমুজের যতটা গতিজনিত শক্তি, ঠিক ততটাই আছে একটা 10 গ্রাম বুলেটের। অবশ্য এটা ঠিক যে তরমুজের আঘাত বুলেটের মতো হয় না। যতই হোক তরমুজগুলো তো রসাল।

আমরা যে ঘটনার কথা বললাম ঠিক তেমনি ঘটতে পারে আমাদের যে কোনো অতি দ্রুতগামী এরোপ্লেনের বৈমানিকের ক্ষেত্রে। এই প্লেনগুলো ঘণ্টায় প্রায় 3,000 কিমি যায়—যা মোটামুটিভাবে একটা বুলেটেরই বেগ। এই সুপারফাস্ট এরোপ্লেনের গতিপথের সামনে যাই পড়ুক প্রচণ্ড আঘাত হানবে। অন্য একটা সাধারণ এরোপ্লেন থেকে স্রেফ মুঠো আলগা করে ফেলে দেওয়া কয়েকটা বুলেটও যদি হঠাৎ এসে লেগে যায় তো তার কাছে তার ফল হবে মেশিনগানের গুলি এসে বেঁধার মতোই মারাত্মক। ঠিক ততটাই জোরে এই বুলেটগুলো এসে আঘাত করবে। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক বেগ সমান—এরোপ্লেন আর বুলেটের মধ্যে সংঘাত হবে প্রায় 800 মি/সেকেণ্ড গতিতে। এই সংঘাতে ক্ষতিও হবে সমান। ওদিকে, আমরা কিন্তু আগেই দেখেছি যে, বুলেটের সমান গতিতে অগ্রসর হওয়া একটা এরোপ্লেন লক্ষ্য করে পিছন দিক্ থেকে যদি গুলি ছোড়া হয় তো তার কোনোই ক্ষতি হবে না।

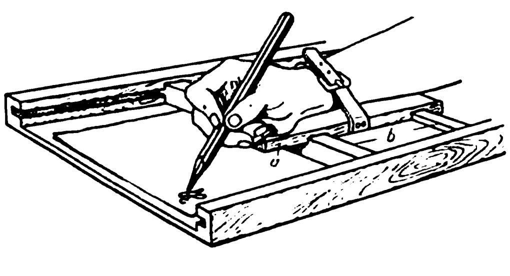
দুটি বস্তু যখন একই দিকে প্রায় একই দ্রুতিতে এগোয় তখন তারা সংস্পর্শে এলেও কেউই কাউকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে না। বুদ্ধিমানের মতো এই তত্ত্বের সদ্ব্যবহার করে 1935-এ ইঞ্জিন ড্রাইভার বর্শচভ (Borschov) একটি রেল-গাড়িকে সংঘর্ষ থেকে বাঁচান। দক্ষিণ রাশিয়ায় ইয়েলেনিকভ এবং ওলশাংকার মধ্যে তিনি একটি রেলগাড়ি চালাচ্ছিলেন। সামনেই আরেকটি রেলগাড়ি ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে এগোচ্ছিল। এই সামনের ট্রেনের চালক চড়াই পেরিয়ে উঠবার মতো বাষ্প তৈরি করতে পারছিলেন না। কয়েকটি ওয়াগন সমেত ইঞ্জিনটিকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে তিনি নিকটবর্তী স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে যান। পিছনে ফেলে রেখে যান 36টি ওয়াগনকে। কিন্তু তিনি ব্রেক-শু চেপে তাদের চাকাগুলো আটকে না দেওয়ায় এই ওয়াগনগুলো ঢালু জমি বেয়ে পিছনে গড়িয়ে নামতে শুরু করে। আস্তে আস্তে তাদের দ্রুতি বেড়ে 15 কিমি/ঘণ্টায় দাঁড়ায় এবং একটা সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সৌভাগ্যবশত বর্শচভ বুদ্ধি হারাননি এবং এক্ষেত্রে যা করণীয় অবিলম্বে স্থির করে ফেলেন। তিনি নিজের রেলগাড়িকে

ব্রেক কষে থামান এবং পিছ্ হটতে শর্ করেন। আস্তে আস্তে তাঁর গাড়িও ওই 15 কিমি/ঘণ্টা গতি লাভ করে। এর ফলে 36টি ওয়াগনের মালগাড়িকে তিনি যখন তাঁর ইঞ্জিনের সঙ্গে এনে ঠেকালেন তখন কোনো ভাঙচুরই ঘটল না।

শেষ কালে বলি, এই পদ্ধতিকেই একটা যন্ত্রে ব্যবহার করার কথা, যাতে চলন্ত রেলগাড়িতে বসেও আমাদের লিখতে সুবিধে হয়। তোমরা সবাই জানো কাজটা বেশ শক্ত, কারণ রেললাইনের জোড়গুলো পেরোবার সময় রেলগাড়ি বেশ ঝাঁকানি দেয়। এই ঝাঁকানি যুগপৎ কাগজ ও কলমের উপর পড়ে না। কাজেই আমাদের কাজ হল এমন একটা কিছু উদ্ভাবন করা যাতে ঝাঁকানিটা যুগপৎ দুটোর উপরেই পড়ে। সেক্ষেত্রে পরস্পরের সাপেক্ষে কাগজ ও কলম দুটোই থাকবে স্থিতাবস্থায়।

চিত্র 22-এ দেখানো হয়েছে এমনই একটা কল। ডান হাতের কব্জিটা ফিতে দিয়ে বাঁধা রয়েছে ছোট বোর্ড *a*-র সঙ্গে। এই *a*-বোর্ডটা *b*-বোর্ডের খাঁজের মধ্য দিয়ে উপর-নিচ করতে পারে। ওদিকে *b*-বোর্ডটাও আবার রেল-গাড়ির মধ্যকার টেবিলে রাখা লেখার বোর্ডটার খাঁজ বেয়ে এধার-সেধার করতে পারে। এই ব্যবস্থায় লেখার জন্য কব্জি নাড়াবার মতো প্রচুর জায়গা পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে প্রত্যেকটা ঝাঁকানি এক সঙ্গে এসে পড়ে কাগজ ও কলমের, কিংবা বলা উচিত কলমধারী-হাতটির উপর। এর ফলে ব্যবস্থাটা বাড়িতে সাধারণ

চিত্র 22



চলন্ত ট্রেনে বসে লেখবার আয়োজন

টেবিলে বসে লেখার মতোই সহজ হয়ে ওঠে। এর মধ্যে অপ্রীতিকর ব্যাপার একটাই। ঝাঁকানিগুলো যুগপৎ কব্জি ও মাথার উপর এসে পড়ে না, তাই তুমি যা লিখছ, সেগুলোর একটা ঝাপসা ছবি চোখে আসে।

নিজেকে কিভাবে ওজন করবে ?

ওজন করার যন্ত্রের উপর চড়ে যদি একটুও নড়া-চড়া না করো তবেই তোমার ঠিক ওজন জানতে পারবে। ঝুঁকে দাঁড়ালেই যন্ত্রটায় ওজন কম দেখাবে। কেন জানতে চাও ? তুমি যখন ঝুঁকে দাঁড়াও, তখন যে পেশীগুলো এই কাজটা সম্পন্ন করে তারা কিন্তু সেই সঙ্গে আবার তোমার দেহের নিচের অংশটাকে উপরে টেনে ধরে এবং ফলে পাল্লার উপরে চাপ কমিয়ে দেয়। এর ঠিক উল্টোটা ঘটে যেই তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে যাও। তখন পেশীগুলো তোমার দেহের উপর এবং নিচের অংশকে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। সেক্ষেত্রে ওজন করার যন্ত্রে ওজন বেশী দেখাবে, কারণ দেহের নিচের অংশ পাল্লার উপর বেশী চাপ দেয়।

ওজন করার যন্ত্র যদি সুগ্রাহী হয়, একটা বাহু উঁচু করে ধরলেও যন্ত্রের কাঁটা ভিন্ন ওজন দেখাবে। এইটুকু গতিও তোমার দেহের আপাত ওজনকে বাড়িয়ে দেয়। বাহুকে উপরে তুলতে তুমি কতকগুলো পেশীকে কাজে লাগাও। এই পেশীগুলো কাঁধকে আলম্ব হিসাবে ব্যবহার করে। ফলে পেশীগুলো কাঁধ সমেত দেহটাকে নিচের দিকে ঠেলে দিয়ে ওজন যন্ত্রের পাল্লার উপর চাপ বাড়ায়। তুমি বাহু উত্তোলন বন্ধ করতে গিয়ে আবার অন্য কতকগুলো পেশীর ব্যবহার শুরু করো। এই পেশীগুলো কাঁধটাকে উপরে টেনে তুলে বাহুমূলের কাছে আনতে চায়। ফলে তোমার দেহের ওজন অথবা ওজন-যন্ত্রের পাল্লার উপর তার চাপ যায় কমে। বিপরীত পক্ষে, তুমি যখন বাহু নামাও তোমার দেহের ওজন কমে যায় এবং বাহু নামানো থামালেই ওজন বাড়ে। সংক্ষেপে বলা যায়, পেশীদের কাজে লাগিয়ে তুমি তোমার ওজন বাড়াতে বা কমাতে পারো। বলাই বাহুল্য, ওজন-যন্ত্রের পাল্লার উপর তোমার দেহ যে চাপ দেয় সেইটাকেই ওজন বলা হচ্ছে।

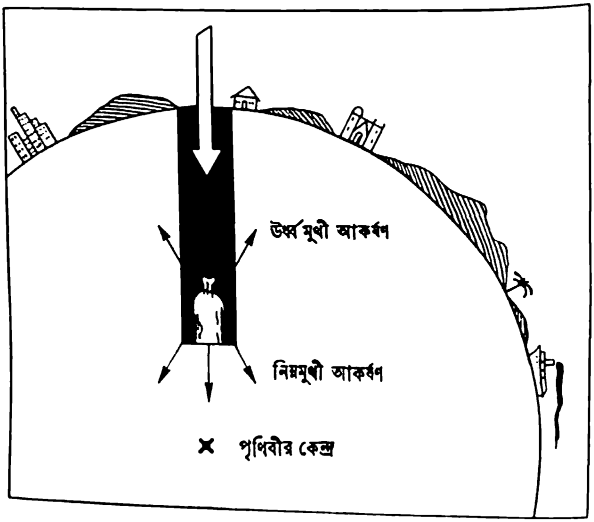
কোথায় জিনিসপত্র বেশী ভারী হয় ?

আমরা যত উপর দিকে যাই পৃথিবীর আকর্ষণ কমে। এক কিলোগ্রামের একটা বাটখারাকে যদি পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে 6,400 কিমি উপরে, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের দ্বিগুণ উচ্চতায় তোলা যায়, তাহলে অভিকর্ষীয় বল $2^2 = 4$ গুণ কমে যাবে। সেক্ষেত্রে একটা স্প্রিং-তুলা 1,000-এর বদলে মাত্র 250 গ্রাম দেখাবে। অভিকর্ষের সূত্র অনুযায়ী পৃথিবী এমনভাবে বস্তুকে আকর্ষণ করে যেন তার সমস্ত ভর কেন্দ্রে জমা রয়েছে। এই আকর্ষণের বল দূরত্বের বর্গের বিষমানুপাতিক হারে (inversely proportional) কমে। আমাদের এই বিশেষ উদাহরণের বেলায়, আমরা এক কিলোগ্রাম ওজনের বাটখারাকে পৃথিবীর

কেন্দ্র থেকে দ্বিগুণ দূরে নিয়ে গেছি বলেই আকর্ষণ $2^2=4$ গুণ কমে গেছে। আমরা বাটখারাটাকে যদি পৃথিবীর পিঠ থেকে 12,800 কিমি উপরে নিয়ে যাই, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তিনগুণ উচ্চতায়, তাহলে আকর্ষণের বল $3^2=9$ গুণ কমে যাবে। সেক্ষেত্রে আমাদের এক কিলোগ্রামের বাটখারাটাকে স্প্রিং-তুলায় মাত্র 111 গ্রাম দেখাবে।

এর থেকে তোমরা হয়তো সিদ্ধান্ত করবে যে, আমাদের এক-কিলোগ্রাম বাট-খারাটাকে পৃথিবীর যত ভেতরে নিয়ে গিয়ে রাখব, ততই বাড়বে আকর্ষণের বল এবং ততই তার বেশী ওজন হবে। কিন্তু এ কথা ভাবলে ভুল করবে। এক্ষেত্রে বস্তুর ওজন বাড়ে না, উল্টে কমে যায়। এর কারণ হল, এই অবস্থায় পৃথিবীর

চিত্র 23



পৃথিবীর মাঝখানে যতই এগিয়ে যাই অভিকর্ষীয় আকর্ষণ ততই কমে আসে
পৃথিবীর মাঝখানে যতই এগিয়ে যাই অভিকর্ষীয় আকর্ষণ ততই কমে আসে

আকর্ষণকারী বল এখন আর শুধু বস্তুটির এক দিকের উপর নয়, তার চারপাশের উপরও প্রযুক্ত হচ্ছে। চিত্র 23 এ দেখতে পাচ্ছ কুয়োর মধ্যে কিছু বস্তু রয়েছে। নিচের দিকের বল যেমন এটাকে নিচে টানছে, তেমনই একই সঙ্গে উপরের দিকের বল টানছে উপর দিকে। প্রকৃতপক্ষে এখানে গুরুত্বপূর্ণ বলতে, পৃথিবীর সেই গোলাকার (spherical) অংশের টান, যে অংশটির ব্যাসার্ধ হল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব। ফলে বস্তুটি যতই নিচে যাবে ততই ওজনে কমবে।

পৃথিবীর কেন্দ্রে তার কোনো ওজনই থাকবে না, কারণ এখানে এটি সব দিক থেকেই সমান বলের ধারা আকর্ষিত হচ্ছে।

এত কথার সারমর্ম এইটাই যে, যে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশী ভূপৃষ্ঠে। পৃথিবীর পিঠ থেকে সেটাকে উপরেই তোলা হোক বা পৃথিবীর ভিতরে নামিয়েই দেওয়া হোক—তার ওজন কম হবে। (পৃথিবীর ঘনত্ব যদিও সর্বত্র সমান নয়, তবু সমান কল্পনা করেই কথাগুলো বলা হচ্ছে)। বাস্তবে, কেন্দ্রের যত কাছে যাওয়া যায় ততই পৃথিবীর ঘনত্ব বাড়ে, এবং পৃথিবীর গভীরে কিছু দূর অবধি অভিকর্ষীয় বল বাড়তে থাকে, তারপর শুরু হয় কমা।

পড়ন্ত বস্তুর ওজন কত ?

একটা লিফ্‌টে করে নিচে নামতে শুরু করার সময়ে যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হয়, সেটা খেয়াল করেছ কি? অস্বাভাবিকভাবে নিজেকে হালকা মনে হয়। কোনো সীমাহীন গহ্বরের মধ্যে যদি তোমার পতন ঘটত, তাহলেও ঠিক একই রকম মনে হত তোমার। ভারহীনতাই এই অনুভূতির কারণ। যে মুহূর্তে লিফ্‌ট্‌-খাঁচার মেঝেটা প্রথম নিচে নামতে শুরু করে, তোমার দেহটা কিন্তু তখনো লিফ্‌টের বেগ অর্জন করতে পারে না। তোমার দেহটা তখন মেঝের উপর প্রায় কোনো চাপই দেয় না বললেই চলে, এবং ফলতঃ দেহের ওজনও খুব কম হয়। পর মুহূর্তেই এই অদ্ভুত অনুভূতি দূর হয়ে যায়। এখন মসৃণগতি লিফ্‌টের চেয়েও দ্রুত পতনের চেষ্টা করে তোমার দেহ এবং খাঁচার মেঝের উপর চাপ দিয়ে পুরো ওজন ফিরে পায়।

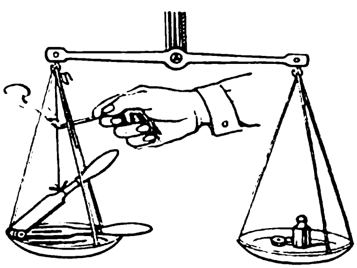
স্প্রিং-তুলার আঙটায় একটা ওজন ঝুলিয়ে দিয়ে ওজন সমেত তুলাকে দ্রুত নিচে নামাবার সময় যন্ত্রের কাঁটাটার উপর নজর রাখো। দেখার সুবিধার জন্য খাঁজের মধ্যে ছোট একটা ছিপির টুকরো গুঁজে দিয়ে এটার গতির উপর লক্ষ্য রাখো। যন্ত্রের কাঁটা পুরো ওজন নির্দেশ করতে সক্ষম হবে না; অনেক কম দেখাবে! তুলাটা যদি অব্যাহতভাবে পড়তো এবং সেসময় তুমি যদি তার কাঁটা-টার উপর নজর রাখতে পারতে তাহলে দেখতে এটা শূন্য ওজন দেখাচ্ছে।

সবচেয়ে ভারী বস্তুও তার সম্পূর্ণ ওজন হারাবে পতনের সময়। কারণটা সহজ। বস্তুর 'ওজন' হল সেই বল যার দ্বারা বস্তুটি এমন একটা কিছুকে টানে যার থেকে সে ঝুলছে কিংবা এমন একটা কিছুর উপর চাপ দেয় যার উপর তাকে রাখা হয়েছে। একটা পড়ন্ত বস্তু স্প্রিং-তুলাকে টানতে পারে না, কেননা সেও ওটার সঙ্গে সঙ্গে পড়ছে। একটা পড়ন্ত বস্তু কোনো কিছুকে টানতে বা কোনো কিছুর উপর চাপ দিতে পারে না। কাজেই পতনের সময় একটা কিছুর ওজন জানতে চাওয়া আর ওজনহীন অবস্থায় তার ওজন জানতে চাওয়া একই কথা।

বলবিদ্যার জনক গ্যালিলিও সেই কত কাল আগে 17 শতাব্দীতে তাঁর 'ডায়ালোগ অন টু নিউ সায়েন্সেস' গ্রন্থে লিখেছিলেন : "আমরা যখন কোনো বস্তুর পতন রোধ করার চেষ্টা করি, তখনই পিঠের উপর তার ভার অনুভব করি। কিন্তু আমরাও যদি বস্তুটার মতোই দ্রুত পড়তে থাকি, তাহলে ওটা কি করে আমাদের উপর চাপ বা বোঝা সৃষ্টি করবে? এটা অনেকটা সেই আমাদের সামনে আমাদেরই মত সমগতিতে দৌড়ে যাচ্ছে, এমন একজনকে বল্লমে ফুঁড়ে ফেলার চেষ্টা করার মতো আর কি?" [বল্লমটা ছোঁড়ার কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু —লেখক]

একটি সহজ উদাহরণ বেশ ভালভাবে ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে দেবে। তুলার একটা পাল্লার উপর একটা জাঁতি রাখ। জাঁতির একটা বাহু আছে পাল্লার উপর আর অন্যটি সুতো দিয়ে বাঁধা হয়েছে পাল্লার আংটার সঙ্গে (চিত্র 24)। অন্য

চিত্র 24



পড়ন্ত বস্তুর ওজন নেই

পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে জাঁতির ওজনের সমান করো। একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে সুতোয় ঠেকাও। সুতোটা পুড়ে যাবে এবং জাঁতির ঝুলন্ত বাহুটা পাল্লার উপর এসে পড়বে। যে পাল্লায় জাঁতিটা রয়েছে সেটা কি নেমে আসবে? না উপরে উঠবে? না কি যেমন আছে তেমনই থাকবে? তোমরা তো ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছ যে, পড়ন্ত বস্তুর কোনো ওজন নেই, তাই ঠিক উত্তরটা দিতে পারা উচিত। মুহূর্তের জন্য পাল্লাটা উপরে উঠবে। নিচের বাহুর সঙ্গে যুক্ত থাকলেও জাঁতির উপরের বাহুটা কিন্তু সত্যিই স্থির অবস্থার চেয়ে নিচে পড়বার সময় পাল্লার উপর কম চাপ দেয়। মুহূর্তের জন্য জাঁতির ওজন কমে এবং তার ফলে জাঁতি চড়ানো পাল্লাটা একটু উপরে ওঠে।

পৃথিবী থেকে চাঁদে?

1865 থেকে 1870-এর মধ্যবর্তী বছরগুলিতে ফ্রান্সে জুল্ ভার্নে'র লেখা 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তিনি একটা বিরাট গোলার মধ্যে

মানুষ ভরে চাঁদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার আশ্চর্য পরিকল্পনার কথা লিখেছিলেন। তাঁর বর্ণনা এমনই যে, পড়ে এতটুকু বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। তোমরা যারা এই বইটা পড়েছ হয়তো মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করেছ এটা সত্যিই সম্ভব কি না। বেশ, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা যাক। *

প্রথমে দেখা যাক, অন্ততপক্ষে তত্ত্বগতভাবেও আমরা কি কামান থেকে এমনভাবে কোনো গোলা ছুঁড়তে পারি যাতে সেটা আর কখনো পৃথিবীতে ফিরে না আসে। তত্ত্বানুসারে সেটা সম্ভব। অনুভূমিকভাবে ছোঁড়া একটা গোলা কেনই বা আবার পৃথিবীতে এসে পড়ে? কারণ পৃথিবী তাকে আকর্ষণ করে, তার গতিপথ বেঁকিয়ে দেয়। সরল গতিপথ অনুসরণ না করে, এটি ভূমির দিকে বেঁকে যায় এবং ফলত কোনো-না-কোনো সময়ে ভূমির উপরে এসে আঘাত করতে বাধ্য। পৃথিবীর পিঠটাও বাঁকা কিন্তু গোলার গতিপথ তার চেয়েও বাঁকা। সে যাই হোক, আমরা যদি গোলাটিকে দিয়ে এমন একটা গতিপথ অনুসরণ করাতে পারি যেটা ঠিক পৃথিবীর উপরিভাগের মতোই বাঁকা, তাহলেই আর গোলাটা কখনই পৃথিবীর উপর এসে পড়বে না। পরিবর্তে, সেটা তখন পৃথিবীর পরিধির সমকেন্দ্রিক একটি কক্ষপথে ঘুরবে, পৃথিবীর একটা উপগ্রহ, একটা শিশু চাঁদ হয়ে উঠবে।

কিন্তু কি করে একটা গোলাকে দিয়ে আমরা ওই রকম গতিপথ অনুসরণ করাবো? এখানে আমাদের করণীয় বলতে একটাই—যথেষ্ট পরিমাণে প্রাথমিক বেগ প্রদান করা। চিত্র 25-এ পৃথিবীর একাংশের প্রস্থচ্ছেদ দেখান হয়েছে। পাহাড়েব চুড়োয় *A* বিন্দুতে একটা কামান বসান হয়েছে (প্রকৃত উচ্চতার হিসাব নিচ্ছি না আমরা)। পৃথিবীর যদি অভিকর্ষীয় বল না থাকত তাহলে এখান থেকে অনুভূমিকভাবে গোলা ছুঁড়লে সেটি ভাবা যাক এক সেকেণ্ড পরে *B* বিন্দুতে পেঁছিত। পরিবর্তে, গোলাটা আসলে কিন্তু আকর্ষণের জন্য *B*-এর পাঁচ মিটার নিচে *C* বিন্দুতে গিয়ে পড়বে। পাঁচ মিটার হচ্ছে সেই দূরত্ব যা অবাধে পতনশীল বস্তু (শূন্যের মধ্যে) প্রথম সেকেণ্ডে অতিক্রম করে। এর জন্য দায়ী ভূপৃষ্ঠের অভিকর্ষীয় আকর্ষণ। এই পাঁচ মিটার পতনের পরেও যদি দেখা যায় যে, *A* বিন্দু থেকে ছোঁড়ার পর গোলাটা ভূমি থেকে যতটা উপরে ছিল এখনও তাই আছে, তাহলে বুঝতে হবে গোলাটা এমন এক গতিপথ অনুসরণ করছে যার বক্রতা পৃথিবীর পরিধির সমকেন্দ্রিক।

* বর্তমানে, স্পুতনিক ও লুনিকের পরবর্তী কালে আমরা জানতে পেরেছি যে, কামান-প্রক্ষেপক নয়, মহাশূন্যে ভ্রমণের জন্য রকেটই ব্যবহার হয়। সে যাইহোক, রকেট কিন্তু তার শেষ ইঞ্জিনটি পুড়ে যাবার পরেও এগিয়ে চলে। ব্যালিস্টিক্সের একই নিয়ম অনুসারে ঘটে এটা। কাজেই পেরেলম্যান সেকেলে হয়ে গেছেন ভেবো না।—সম্পাদক

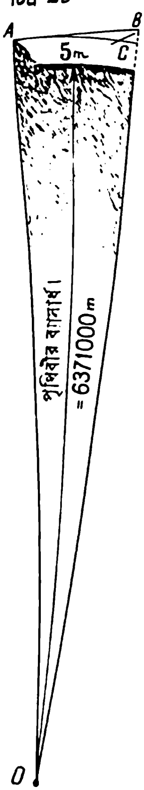
এরপর একমাত্র বাকী রইল *AB* দূরত্বের মাপ নেওয়া (চিত্র 25)। কিংবা ভিন্ন ভাবে বলতে গেলে, এক সেকেণ্ডের মধ্যে অনুভূমিকভাবে গোলাটা কত দূর যায়। এর থেকে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় বেগটা কত জানতে পারব। *AOB* ত্রিভুজে, *OA* বাহু হল পৃথিবীর ব্যাসার্ধ (প্রায় 6,371,000 মিটার) ; *OC*＝*OA* এবং *BC*＝5 মিটার ; কাজেই *OB* হল 6,371,005 মিটার। পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রয়োগ করে আমরা পাচ্ছি :

$$(AB)^2 = (6{,}371{,}005)^2 - (6{,}371{,}000)^2$$

সমীকরণটি সমাধান করে দেখা যায় *AB* মোটামুটিভাবে 8 কিমি।

কাজেই কোনো পিছুটান যদি না থাকে তাহলে কামানের নল থেকে 8 কিমি/সেকেণ্ড বেগে একটা গোলাকে অনুভূমিকভাবে ছোঁড়া হলে সেটা আর কখনোই পৃথিবীতে এসে পড়বে না। সেটা চিরকালের মতো শিশু চাঁদ হিসাবেই বিরাজ করবে।

চিত্র 25



প্রক্ষেপকের মুক্তি বেগ (escape velocity) কিভাবে নির্ধারণ করবে

এখন মনে করো, আমাদের গোলাটাকে আমরা এর চেয়েও বেশী প্রাথমিক বেগ প্রদান করলাম। এটা তাহলে কোথায় যাবে ? মহাকাশ বিষয়ক বলবিদ্যার চর্চা করছেন এমন সব বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, 8, 9, এমন কি 10 কিমি/সেকেণ্ড বেগও উপবৃত্তের আকারের মতো একটা গতিপথ প্রদান করে।

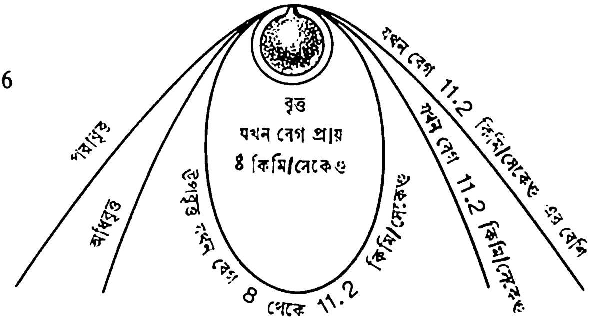
প্রাথমিক গতি যত বাড়ে এই উপবৃত্ত ততই আরও লম্বাটে চেহারা নেয়। বেগ 11·2 কিমি/সেকেণ্ডে পৌঁছলে গোলাটার গতিপথ আর তখন উপবৃত্ত থাকবে না। তখন সেটার গতিপথ হবে একটি মুক্ত বক্ররেখা, একটি অধিবৃত্ত এবং গোলাটা পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মতো বাইরে চলে যাবে (চিত্র 26)। কাজেই তত্ত্বগতভাবে, কামানের নলের মুখে যদি যথেষ্ট গতি থাকে তাহলে গোলার মধ্যে বসে চাঁদে গিয়ে পৌঁছন আদৌ অসম্ভব নয়। কিন্তু সে যাই হোক, এটা এমনই একটা সমস্যা যা বেশ কিছু বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। এর বিষয়ে বিস্তৃততর বিবরণের জন্য তোমাদের 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা-র' দ্বিতীয় খণ্ডটা দেখতে বলছি। (উপরোক্ত আলোচনায় পিছুটানকে আমরা হিসেবের মধ্যেই ধরিনি। এই পিছুটান কিন্তু বাস্তবে ওই

ধরনের বিরাট বেগ অর্জনের ব্যাপারে অত্যন্ত জটিলতা সৃষ্টি করবে এবং হয়তো কাজটাকে সম্পূর্ণ অসম্ভব করে তুলবে।)

চাঁদে পাড়ি : জুল ভার্ন বনাম বাস্তব

তোমরা যারা 'পৃথিবী থেকে চাঁদে' বইটা পড়েছ, নিশ্চয় সেই আকর্ষণীয় পরিচ্ছেদটার কথা এখনও ভোলনি, যেখানে প্রক্ষেপকের এমন এক সীমানা

চিত্র 26



একটি প্রক্ষেপককে যখন প্রাথমিক বেগ ৪ কিমি/সেকেণ্ড বা তার চেয়েও বেশীতে ছোঁড়া হয়।

অতিক্রম করার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে জায়গায় চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর সমান। আশ্চর্য সব ব্যাপার ঘটেছিল সেখানে। প্রক্ষেপকের ভিতরের সব জিনিসই ভারশূন্য হয়ে গিয়েছিল, স্বয়ং যাত্রীরা বাতাসে ভাসতে শুরু করেছিল।

এর মধ্যে কিছুই ভুল নেই। কিন্তু যেটা জুল ভার্নের নজরে পড়েনি, সেটা হল, এই ঘটনা যে শুধু ঔপন্যাসিক বর্ণিত সময়টুকুতেই ঘটে তা নয়। এর আগে ও পরেও একই ব্যাপার ঘটে—সত্যি বলতে, এটা ঘটতে থাকে অবাধ যাত্রা আরম্ভ হওয়ার শুরু থেকেই।

অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে, তাই না ? যদিও আমি নিশ্চিত যে, ইতিপূর্বে এই খামতি কেন নজরে আসেনি ভেবে তোমরাও অবিলম্বে অবাক হবে। একটা উদাহরণের জন্য জুল ভার্নের শরণাপন্ন হওয়া যাক। নিশ্চয় ভুলে যাওনি, মহাশূন্যের যাত্রীরা মৃত কুকুরটাকে কিভাবে বাইরে ছুঁড়ে দিয়েছিল এবং পৃথিবীতে না পড়ে সেটা প্রক্ষেপকের পিছনে পিছনে আসছে দেখে তারা কিরকম চমকে গিয়েছিল। জুল ভার্ন সঠিকভাবেই এই ঘটনার বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। শূন্যে সব বস্তুরই পতন ঘটে সমান দ্রুতিতে, প্রত্যেকটি বস্তুই অভিকর্ষের কারণে সমান ত্বরণ লাভ করে। কাজেই, অভিকর্ষের দরুন প্রক্ষেপক ও মৃত কুকুর উভয়েরই পতনের বেগ সমান হয়েছিল (সমান ত্বরণ)। অথবা এটাই বলা ভাল যে, অভিকর্ষের দরুন তাদের প্রাথমিক বেগ সমান হারে কমছিল। ফলে

উভয়েরই সমান বেগে ধেয়ে যাওয়ারই কথা। সেই জন্যই বাইরে ছ্ঁড়ে দেওয়ার পরেও মৃত কুকুরটা প্রক্ষেপকটাকে অনুসরণ করছিল।

জুল ভার্ন শুধু ধরতে পারেন নি : বাইরে ছুঁড়ে দেওয়ার পর মৃত কুকুরটা যখন পৃথিবীতে গিয়ে পড়ল না, তাহলে প্রক্ষেপকের ভেতরে থাকার সময়েই বা নিচে পড়বে কেন? একই বল তো উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করছে! প্রক্ষেপকের মধ্যে হাওয়ার মধ্যে ভাসমান মৃত কুকুরটা ঠিক ওই অবস্থাতেই থাকবে, কেননা তার ও প্রক্ষেপকের বেগের মধ্যে কোনোই তফাত নেই। অতএব প্রক্ষেপকের সাপেক্ষে এটা রয়েছে নিশ্চল অবস্থায়।

মৃত কুকুরটার বেলায় যা সত্যি, প্রক্ষেপকের ভেতরে সমস্ত যাত্রী, সমস্ত বস্তুর বেলায়ও সাধারণভাবে তাই সত্যি। কেননা এরা সকলেই প্রক্ষেপকের সঙ্গে সমান দ্রুতিতে ধাবমান। দাঁড়াবার, বসবার বা শোবার জায়গা না থাকলেও কিছুতেই তাদের পতন ঘটবে না। একজন একটা চেয়ার নিয়ে সেটাকে উল্টে ছাতের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরতে পারে, তবু সেটা 'নিচে' পড়বে না, কেননা ছাতের সঙ্গে সঙ্গেই সেটা ধাবিত হচ্ছে। মাথা নিচের দিকে করে যে কেউ এই চেয়ারে চড়ে বসতেও পারে, তবুও পড়বে না। লোকটাকে টেনে ফেলবেই বা কে? সত্যিই যদি লোকটা পড়ে যায় বা ভেসে নেমে আসে, তার মানে হল প্রক্ষেপকের গতি চেয়ারে আসীন লোকটির চেয়েও বেশি। তা না হলে চেয়ারটা ভাসতে বা পড়তে পারে না। এটা কিন্তু অসম্ভব, কারণ আমরা জানি যে প্রক্ষেপকের ভেতরকার সবকিছুরই ধরন ওই প্রক্ষেপকেরই সমান। এই ব্যাপারটাই জুল ভার্ন খেয়াল করতে ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন ধাবমান প্রক্ষেপকের মধ্যে যা কিছু আছে তাদের উপর শুধু আকর্ষণের বলগুলি কাজ করছে, তাই মহাশূন্যে থাকাকালীন এই জিনিসগুলো যথাপূর্বং কামরার মেঝের উপরেই চাপ দিতে থাকবে। তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে, আকর্ষণের বলগুলির ক্রিয়া থেকে [ধাক্কা (thrust) এবং বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধ ইত্যাদি অন্যান্য বলের কথা ধরা হচ্ছে না] উৎপন্ন বেগের সঙ্গে বস্তুটি ও তার বাহক উভয়েই যদি ধাবিত হয় তাহলে তারা পরস্পরের উপরে চাপ দিতে পারে না।

কাজেই যেই প্রক্ষেপকের নিজস্ব ভরবেগে আরো উড়ে যেতে শুরু করল, এর যাত্রীরা পুরোপুরি ভারশূন্য হয়ে গেল এবং তখন তারা প্রক্ষেপকের ভেতরে ভাসতে পারে, যেমন ভাসতে পারে ভেতরকার অন্য সব কিছুই। শুধু এই ঘটনাটা থেকেই যাত্রীদের পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাওয়া সম্ভব যে তারা মহাশূন্যে ধাবিত হচ্ছে, না কামানের মধ্যেই রয়েছে। জুল ভার্ন কিন্তু বলেছেন যে, মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রথম আধ ঘণ্টার মধ্যে যাত্রীরা হাজার চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি যে তারা এগোচ্ছে কি না।

" 'নিকোল, আমরা কি এগোচ্ছি ?'

নিকোল ও বারবিকেন এ-ওর দিকে তাকাল। এ অবধি তারা প্রক্ষেপক নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

" 'বলো, আমরা কি সত্যিই এগিয়ে চলেছি ?' মাইকেল আর্দান আবার বললে।

" 'না কি ফ্লোরিডার মাটির উপরেই শান্তভাবে দাঁড়িয়ে আছি ?' নিকোল জিজ্ঞাসা করল।

" 'না কি মেক্সিকো উপসাগরের তলায় ?' মাইকেল আর্দান যোগ করল।"

এই ধরনের সন্দেহ স্টিমারের যাত্রীকেই মানায়। মহাশূন্যের কোনো যাত্রীর পক্ষে এগুলো নেহাতই অবান্তর, কেননা, নিজের সম্পূর্ণ ভারশূন্যতার দিকে তাঁর তো নজর পড়তে বাধ্য। স্টিমারের যাত্রীর ভার কিন্তু একই থাকে।

জুল ভার্নের প্রক্ষেপকটি একটি ভারী অদ্ভুত জায়গা তো বটেই। এটি এক ছোট্ট জগৎ যার হালচাল একেবারে নিজস্ব অভিনব। এখানে জিনিসপত্র ভারহীন এবং যে যেখানে আছে সেখানেই থাকে বা ভাসে। যেখানে জিনিসপত্রকে যে কোনো জায়গাতেই রাখা হোক তাদের সাম্য বজায় থাকে। যেখানে বোতল কাত করে ফেললেও জল পড়ে না। ভারী আপশোষের কথা যে, কল্পনাকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেওয়ার এমন সুন্দর সুযোগ গণ্ডগোলে জুল ভার্ন হাতছাড়া করেছিলেন !*

ত্রুটিপূর্ণ তুলাও প্রকৃত ওজন জানাতে পারে

প্রকৃত ওজন জানার জন্য কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ—তুলা না বাটখারা ? দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ভেবো না যেন। বাটখারায় যদি গণ্ডগোল না থাকে তাহলে একটা ত্রুটিপূর্ণ তুলার সাহায্যেও তুমি প্রকৃত ওজন জানতে পারবে। বেশ কয়েক রকম পদ্ধতি আছে, তার মধ্যে দুটোর কথার বলব।

একটার কথা জানিয়েছিলেন বিখ্যাত রুশ রসায়নবিদ দিমিত্রি মেন্ডেলিভ। তুলার একটা পাল্লার উপর হাতের কাছে যা পাও, একটা কিছু চাপিয়ে দাও। শুধু খেয়াল রেখো যে, জিনিসটা যেন তুমি যেটার ওজন নিতে চাও তার চেয়ে ভারী হয়। অপর পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে এটার ওজন বার করো। এবার তুমি যার ওজন নিতে চাও সেটাকে বাটখারা চড়ানো পাল্লাটার উপর তুলে দাও। তারপর প্রয়োজন মতো বাটখারা নামিয়ে পাল্লাদুটো মেলাও। এবার সরিয়ে

* সোভিয়েত ও মার্কিন মহাকাশচারীদের কাছ থেকে শুনে এবং মহাশূন্যে তোলা ছবি দেখে আমরা খুব ভালভাবেই জানতে পেরেছি, ভারহীন অবস্থায় জীবন ধারণ ও কাজ করার ব্যাপারটা কিরকম। মহাশূন্য থেকে পাঠানো দূরদর্শন চিত্রও তোমাদের মধ্যে অনেকেই নিশ্চয় দেখেছ।—সম্পাদক।

নেওয়া বাটখারাগুলোর মোট ওজন কত সেটা বার করলেই জিনিসটার ঠিক ওজন বেরিয়ে পড়বে। একে বলে 'নিত্য ভার পদ্ধতি' (constant load method) এবং একাদিক্রমে কয়েকটি বস্তু ওজন করার ব্যাপারে এ পদ্ধতিটা বিশেষভাবে সুবিধাজনক। যা-ই ওজন করা হোক, তার জন্য ওই প্রাথমিক ভারটাকেই ব্যবহার করা হয়।

আরেকটি পদ্ধতিকে এটির প্রস্তাবক বিজ্ঞানীর নামানুসারে 'বোর্দা পদ্ধতি' বলা হয়। ব্যাপারটা এই রকম। যে বস্তুকে ওজন করতে চাও সেটা একটা পাল্লার উপর বসিয়ে দাও। তারপর অন্য পাল্লাটার ভার সমান না হওয়া অবধি তার উপরে বালি বা সীসার গুলি ঢালতে থাক। বস্তুটাকে এবার তুলে নাও, কিন্তু অন্য পাল্লার উপরকার বালি বা সীসায় হাত লাগিও না। খালি পাল্লার উপর প্রয়োজন মতো বাটখারা বসিয়ে ওজন মেলাও। এই বাটখারাগুলোর ওজন যোগ দিলেই তোমার জিনিসটার ওজন জানতে পারবে। এটাকে 'পুনঃস্থাপন ভারগ্রহণ' (replacement weighing)-ও বলা হয়।

বাটখারার ওজন যদি ঠিক থাকে তাহলে এই সহজ পদ্ধতি এক পাল্লাওলা স্প্রিং-তুলার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়। এক্ষেত্রে তোমার বালি বা সীসা কোনোটাই দরকার হবে না। জিনিসটাকে সরাসরি পাল্লার উপর তুলে দিয়ে পাঠ নাও। তারপর জিনিসটাকে সরিয়ে পাল্লার উপর এমনভাবে বাটখারা চড়াও যাতে আবার আগের পাঠ পাওয়া যায়। বস্তুটির পরিবর্তে বসানো বাটখারাগুলোর সম্মিলিত ওজনই ওই বস্তুটির ওজন বাতলে দেবে।

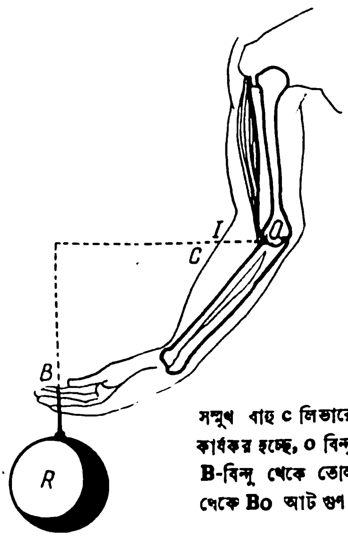
তোমার ভাবতে পারা থেকেও বেশী শক্তিশালী

এক হাতে কত ভার তুলতে পার? ধরা যাক, দশ কিলোগ্রাম। এই পরিমাণ কি তোমার বাহুর পেশীশক্তির ক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছে? মোটেই নয়। তোমার বাইসেপ (হাতের গুলি) এর চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। 27 নং চিত্রে এই পেশীর কার্যপ্রণালী দেখান হয়েছে। তোমার সম্মুখবাহুর অস্থি একটি লিভারের মতো। এই লিভারের আলম্বের কাছেই পেশীটি যুক্ত আছে। তুমি যে ওজন তোলো, তা এই জ্যান্ত লিভারের অপর প্রান্তে ক্রিয়াশীল হয়। ওজন ও আলম্বের তথা জয়েন্টের মধ্যে যে দূরত্ব সেটা হাতের গুলির শেষ প্রান্ত থেকে আলম্ব অবধি দূরত্বের প্রায় আট গুণ। তার মানে, তুমি যদি 10 কেজি ভার তোলো, তোমার হাতের গুলি তার আট গুণ শক্তি প্রয়োগ করে, অর্থাৎ 80 কেজি তুলতে পারে।

যদি বলি, প্রত্যেকেই সে যা তার চেয়েও অনেক বেশী শক্তিশালী, তাহলে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। কিংবা এভাবেও বলা যায় যে, আমরা আমাদের পেশীর সাহায্যে যা করতে পারি পেশীগুলো তার চেয়েও শক্তিশালী। এই

ব্যবস্থাটার কি কোনো সুফল আছে? কিছু না, এরকমটা প্রথম নজরে তোমাদের মনে হতে পারে। এটাকে যেন একেবারেই অকারণ লোকসান বলে মনে হয়। মনে যাই হোক, বলবিদ্যার সেই পুরনো 'সুবর্ণ নিয়মের' কথা স্মরণ করো এবার: ক্ষমতার যেটুকু হারাবে সরণে তাই ফিরে পাবে। এক্ষেত্রে তোমার লাভ হচ্ছে দ্রুতির বেলায়। তোমার বাহুর পেশীর থেকে তোমার বাহু আটগুণ দ্রুত নড়াচড়া করে। পশুদের মধ্যে পেশীর সংস্থান এমন যে, তারা তাদের

চিত্র 27



সম্মুখ বাহু C লিভারের কাজ করে। I বিন্দুর ওপর বল কার্যকর হচ্ছে, O বিন্দুতে রয়েছে আলম্ব এবং ভার R-কে B-বিন্দু থেকে তোলা হচ্ছে। মোটামুটি ভাবে IO-র থেকে BO আট গুণ লম্বা।

অঙ্গের প্রান্তগুলো আরো চটপট নাড়াতে পারে। বেঁচে থাকার সংগ্রামে এই ক্ষিপ্রতাটা শক্তির থেকেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। না হলে আমাদের সত্যিসত্যিই শম্বুক গতিতে চলা-ফেরা করতে হত।

তীক্ষ্ণ জিনিস বেঁধে কেন?

কখনো ভেবে দেখেছ কি যে, একটা সূচ কেন অত সহজে অন্য জিনিস ভেদ করে? কাপড় বা কার্ডবোর্ডের টুকরোর মধ্যে একটা সূচকে বসিয়ে দেওয়া অত সহজ, অথচ একটা ভোঁতা পেরেকের বেলায় সেটাই বা অত কঠিন কেন? উভয় ক্ষেত্রেই কি একই বল কাজ করছে না? বল সমান, কিন্তু চাপ সমান নয়। সূচের বেলায় সম্পূর্ণ বল তার মুখের উপর কেন্দ্রীভূত হয়, পেরেকের বেলায় সমান

পরিমাণের বল তার ভোঁতা মুখের বিস্তৃততর ক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই, আমরা সমান বল প্রয়োগ করলেও ভোঁতা পেরেকের চাইতে সূচ অনেক বেশী চাপ দেয়।

তোমরা সকলেই জানো যে, জমিতে মাটি গুড়োবার সময় ষাট দাঁত-ওলা মইয়ের থেকে সমান ওজনের কুড়ি দাঁতওলা মই মাটির আরো গভীরে প্রবেশ করে। কেন? কারণ দ্বিতীয় মইটির প্রত্যেক দাঁতের উপর যে ভার পড়ে তা প্রথমটির চেয়ে বেশী।

চাপের কথা বলার সময়, শুধু বল নয়, যে ক্ষেত্র জুড়ে এই বল কাজ করছে, সেটাও সর্বদা হিসেবের মধ্যে রাখা দরকার। কেউ যদি আমাদের বলে যে, একজন শ্রমিককে একশ রুবল দেওয়া হয়েছে, তাহলে সেটা বেশী হল না কম হল জানতে পারব না, কারণ এটা তাকে পুরো এক বছরের জন্য, না কি এক মাসের জন্য দেওয়া হল তা জানি না।

একই ভাবে বলের কার্যকারিতাও নির্ভর করে সেটা এক বর্গ সেণ্টিমিটার জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বা এক বর্গ মিলিমিটারের একশ ভাগের এক ভাগে কেন্দ্রীভূত হল তার উপর।

স্কির সাহায্যে সহজেই আমরা তাজা ঝুরোঝুরো নরম তুষার প্রান্তর পেরোতে পারি। কিন্তু স্কি না থাকলে ডুবে যাই। কেন? স্কির উপরে তোমার দেহের ওজন অনেকটা বেশী ক্ষেত্র জুড়ে ছড়িয়ে থাকে। ধরা যাক, স্কি-র তলের ক্ষেত্র আমাদের পায়ের পাতার ক্ষেত্রের চেয়ে কুড়িগুণ বেশী। তাহলে স্কি চড়ে তুষারের উপর আমরা যা চাপ দেব সেটা স্কি না থাকলে যে চাপ পড়বে তার মাত্র কুড়িভাগের একভাগ। আমরা আগেই দেখেছি স্কির উপর থাকলে তাজা নরম তুষার তোমার চাপ সয়, কিন্তু না থাকলে দারুণ শত্রুতা করে।

একই কারণে জলাজায়গায় যে সমস্ত ঘোড়া ব্যবহার করা হয় তাদের এক বিশেষ ধরনের নাল পরানো হয়। এতে তাদের পা ফেলার জায়গাটার আয়তন বৃদ্ধি পায় ও প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটার পিছু চাপ কমে আসে। একই কারণে কাদা ভাঙতে আর পাতলা তুষারের স্তর পেরতে হলে মানুষেও একই সাবধানতা অবলম্বন করে। ওজনটা যাতে ব্যাপকতর ক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য প্রায়ই তাদের হামাগুড়ি দিতে দেখা যায়।

শেষে বলি, ট্যাংক বা ক্যাটারপিলার-ট্রাক্টরগুলো ভীষণ ভারী হয়েও যে আলগা মাটিতে বসে যায় না তারও ওই একই কারণ। ব্যাপকতর ক্ষেত্রের উপর তাদের ওজন ছড়ানো থাকে। একটা আট টনের ট্রাক্টর প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে মাত্র 600 গ্রাম চাপ দেয়। এমন ক্যাটারপিলারও আছে যা দুই টন ওজন সত্ত্বেও মাত্র 160 গ্রাম/সেমি^{2} চাপ দেয় বলে সহজেই ছোট ছোট জলাভূমি ও

বালিয়াড়ি পেরিয়ে যায়। এখানে ধারক-ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় আমাদের সুবিধা হয় আর সূচের বেলায় ঠিক তার বিপরীত।

এই সব থেকে বোঝা যায় যে, তীক্ষ্ণ জিনিস অন্য জিনিসে বেঁধবার একমাত্র কারণ হল এর মধ্যে অত্যন্ত নগণ্য ক্ষেত্র থাকে যার উপর বল কাজ করতে পারে। সেই জন্যই ভোঁতা ছুরির চেয়ে ধারালো ছুরি দিয়ে ভালভাবে কাটা যায়: ছুরির ফলায় স্বল্প ক্ষেত্রের উপর বল কেন্দ্রীভূত হয়। মোদ্দা কথা, তীক্ষ্ণ জিনিস ভালভাবে বেঁধে বা কাটে কারণ, তাদের মুখে বা ফলায় অনেক বেশী চাপ জমা হয়।

আরামদায়ক শয্যা ·····পাথরে তৈরী

চ্যাপ্টা মাথা টুল আর চেয়ার দুটোই যদি কাঠ দিয়ে তৈরী হয়, তবু চেয়ারে বসতেই বেশী আরাম লাগে কেন? খুব যে নরম দড়ি দিয়ে দোলনা তৈরী হয় তা নয়, তবু দোলনায় শুয়ে আরাম লাগে কেন?

মনে হচ্ছে, কারণটা তোমরা ইতিমধ্যেই আন্দাজ করেছ। টুলের উপরটা চ্যাপ্টা, এটার উপর বসার সময় তোমার সমস্ত ওজনটা এসে পড়ে ছোট্ট একটা ক্ষেত্রের উপর। অপর দিকে সাধারণত চেয়ারের বসার জায়গাটা আকারে অবতল হয়। এ ক্ষেত্রে তোমার চাপটা পড়ছে অনেক বড় ক্ষেত্রের উপর, এর উপরই ছড়িয়ে রয়েছে তোমার ভার। তলের ক্ষেত্রফলের প্রতি একক পিছু তোমার ওজন এখানে কম, অর্থাৎ চাপ কম।

দেখতেই পাচ্ছ, কৌশলটা হল চাপকে যতটা সম্ভব সমত্ব রক্ষা করে ছড়িয়ে দেওয়া। আমাদের দেহের অসমান আকৃতি অনুযায়ী নরম বিছানার উপর আমরা অবনমন ঘটাই। প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে মাত্র কয়েক গ্রাম হারে চাপ এখানে মোটামুটি সমানভাবেই বিতরিত হয়। আমাদের আরাম লাগাটাই তাই স্বাভাবিক।

নীচের হিসাব থেকে পার্থক্যটা ভালভাবে ধরা পড়ে। একজন প্রাপ্তবয়স্কের দেহের তলের ক্ষেত্রফল প্রায় 2 বর্গ মিটার, বা 20,000 বর্গ সেমি। বিছানার উপর এর প্রায় এক-চতুর্থাংশ তার ওজন বহন করে অর্থাৎ, 0·5 বর্গ মিটার, বা 5,000 বর্গ সেমি। যদি ধরা যায় তার ওজন 60 কেজি, বা 60,000 গ্রাম, তার মানে চাপ সৃষ্টি হচ্ছে মাত্র 12 গ্রাম সেমি^{2}। ন্যাড়া তক্তাপোষের উপর মানুষটির ভারবহনের ক্ষেত্র হবে মাত্র 100 বর্গ সেমি গোছের। শরীর ও শয়নের জায়গার মধ্যে সংযোগ ঘটবে অনেক কম সংখ্যক বিন্দুতে। তার মানে প্রতি বর্গ সেমি পিছু চাপ দাঁড়াবে গিয়ে বারো গ্রামের বদলে আধ কেজি মত। বেশ চোখে পড়ার মতোই পার্থক্যটা, তাই না? এবং এটা ধরতে কারুর সময় লাগে না।

কিন্তু সবচেয়ে কঠিন বিছানাও পালকের বিছানার মতো ঠেকবে যদি তোমার ওজনটা এর উপর সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। ধরো কাদার উপর তুমি তোমার দেহের একটা ছাপ তুলে নিয়েছ। কাদা শুকোবার সময় পাঁচ থেকে দশ শতাংশ সংকুচিত হয় বটে কিন্তু সেটা আমরা এখন ধরছি না। কাদা শুকোবার পর এর উপর তুমি আবার শুতে পার এবং তখন মনে হবে পালকের বিছানায় রয়েছ। যদিও তুমি যার উপর শুয়ে আছ সেটাকে পাথর বললে তেমন কোনো ভুল হয় না, তবু তোমার নরম লাগবে ; কারণ, তোমার ওজনটা ছড়িয়ে আছে অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে।

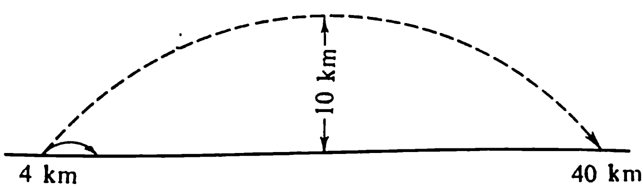
পরিচ্ছেদ ৩

বায়ুমণ্ডলের বাধা

বুলেট ও বায়ু

স্কুল পড়ুয়ারা প্রত্যেকেই জানে যে, বায়ু ছুটন্ত বুলেটের গতি মন্থর করে দেয়। কিন্তু এই বাধা যে কত বড় সেটা খুব কম লোকেই জানে। বেশীর ভাগ লোকেরই ধারণা, বাতাসের মতো স্নেহপরশ দাতা (এটাও আমরা সচরাচর কখনোই অনুভব করি না) একটা পরিবেশ কখনো দুরন্ত গতি রাইফেল বুলেটের সামনে বাধা হয়ে উঠতে পারে না।

চিত্র 28



বাতাস এবং শূন্যতার মধ্যে একটি বুলেটের গতিপথ। বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতিতে প্রক্ষেপপথ বড় আকারের বৃত্তচাপটি অনুসরণ করে। বাঁ দিকের ছোট বৃত্তচাপটা সত্যিকার প্রক্ষেপপথ

সে যাই হোক, চিত্র 28-এর দিকে একবার ভাল করে তাকালেই বুঝতে পারবে যে, বাতাস বুলেটের পথে বেশ ভাল মতই বাধা স্থাপন করে। চিত্রের বড় বক্ররেখাটি বায়ুর অনুপস্থিতিতে বুলেটের প্রক্ষেপ-পথ নির্দেশ করছে। এক্ষেত্রে 45° কোণে হেলানো একটি রাইফেল থেকে 620 মিটার/সেকেণ্ড প্রাথমিক বেগে নির্গত একটি বুলেট দশ কিলোমিটার উঁচু বিরাট একটা বৃত্তচাপ অনুসরণ করে প্রায় 40 কিমি অতিক্রম করবে। কিন্তু আসলে একটা বুলেট কিন্তু মাত্র 4 কিমি যায়। তখন তার অনুসৃত ছোট্ট বৃত্তচাপটা প্রথমটার পাশে প্রায় চোখেই পড়ে না। এমনি কাণ্ড করে বায়ুর বাধা, বায়ুর পিছুটান।

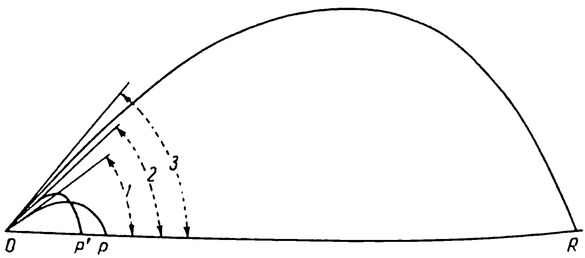
বিগ বার্থা

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে 1918 সালে ফরাসী ও ব্রিটিশ এরোপ্লেনগুলো জার্মান বিমান আক্রমণের হামলাকে রুখে দেওয়ার পর, জার্মানরাই সর্বপ্রথম

100 কিলোমিটার বা তার চেয়েও দূরে থেকে দূরপাল্লার কামান দাগা শুরু করে।

জার্মান সৈন্যরা তখন ফ্রান্সের রাজধানী থেকে 110 কিমি দূরে রয়েছে। সেই সময় খুব আকস্মিকভাবে জার্মান গোলন্দাজরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফ্রান্সের রাজধানীর উপর গোলাবর্ষণের এক অভিনব উপায় বার করেছিল। বেশী কোণে হেলানো একটা বড় কামান থেকে গোলা ছোঁড়ার পর তারা অপ্রত্যাশিতভাবে

চিত্র 29



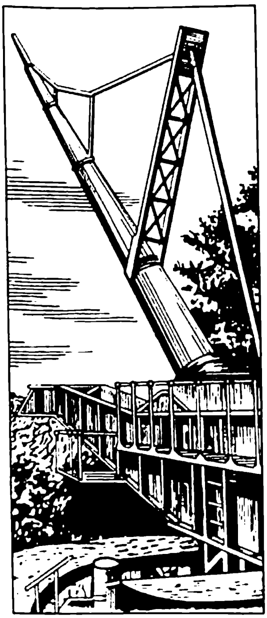
দূর-নিক্ষেপকারী কামানের মুখ বিভিন্ন কোণে পরিবর্তন করলে তার পাল্লা পরিবর্তিত হয়। কোণ 1-এর ক্ষেত্রে প্রক্ষেপক P-তে গিয়ে পড়ে এবং কোণ 2-এর ক্ষেত্রে পড়ে P'-এ, কিন্তু কোণ 3-এর ক্ষেত্রে হালকা বায়ুস্তর পেরিয়ে যাচ্ছে বলে তা আরো অনেক দূরে গিয়ে পড়ে

আবিষ্কার করল যে, এভাবে গোলাগুলোকে 20 কিমি-র বদলে 40 কিমি অবধি ছোঁড়া যাচ্ছে। মুখটা অনেকটা খাড়া রেখে একটা কামান থেকে যদি বিপুল প্রাথমিক বেগে গোলা ছোঁড়া যায়, সেটা অনেকটা উপরে, এমন হালকা বায়ুস্তরে উঠে যায় যেখানে বাতাসের পিছুটান কিছুটা কম। গোলাটা এ অবস্থায় বেশ কিছু এগিয়ে যায়, তার পরেই সোজা গোত্তা খেয়ে নেমে আসে মাটির উপর। চিত্র 29-এ দেখান হয়েছে কামানের নল বিভিন্ন কোণে রেখে গোলা ছুঁড়লে প্রক্ষেপ-পথ কতটা পাল্টে যায়। এইটাই ছিল মূল নীতি, যার ভিত্তিতে 115 কিমি দূরে থেকে প্যারিসের উপর গোলাবর্ষণের জন্য একটা দূর পাল্লার কামানের নক্সা তৈরি করেছিল, জার্মানরা। বিগ বার্থা নামে সত্যিই এমন একটা কামান তৈরী হয়েছিল এবং 1918-এর সারা গ্রীষ্ম ধরে কামানটা 300-রও বেশি গোলা দেগেছিল প্যারিসের উপর।

পরবর্তীকালে জানা গেছে বিগ বার্থার ইস্পাতের তৈরী বিশাল নলটা ছিল 34 মিটার লম্বা এবং 1 মিটার পুরু। তার পিছনের গোলা ভরার জায়গাটার দেওয়ালগুলো ছিল 40 সেমি পুরু। কামানটার নিজের ওজনই 750 টন।

তার 120 কেজি গোলাগুলি লম্বায় ছিল এক মিটার আর 21 সেমি করে মোটা। প্রত্যেকবার গোলা ছুঁড়তে 150 কেজি বারুদ লাগত যা 5,000 অ্যাটমস্ফিয়ার চাপ উৎপন্ন করে 2,000 মিটার/সেকেণ্ড প্রাথমিক বেগে গোলাগুলোকে নিক্ষেপ করত। কামানের নলটা 52° কোণে উঁচু করে রাখা হত বলে গোলাটা বিশাল এক বৃত্তচাপ অনুসরণ করত, যার সবচেয়ে উচ্চতম বিন্দুটির অবস্থান মাটি থেকে থাকত 40 কিমি ঊর্ধ্বে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে। গোলাটা মাত্র 3·5 মিনিট সময় নিত 115 কিমি দূরবর্তী প্যারিসে পেঁছতে। তার মধ্যে দু' মিনিটই কাটত স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে।

চিত্র 30



বিগ বার্থা

ইতিহাসের প্রথম দূরপাল্লার কামান বিগ বার্থা আধুনিক দূরপাল্লার অস্ত্রের পূর্বসূরী।

এখানে বলে রাখি বুলেট বা গোলার প্রাথমিক গতিবেগ যত বেশী হবে ততই বাড়বে বায়ুর প্রতিরোধ। উপরন্তু বেগের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এই প্রতিরোধ গতিবেগের কি হারে বৃদ্ধি পাবে—প্রথমে বর্গ হারে, পরে ঘন হারে, এবং এর পরে আরো বেশী হারে, সেটা নির্ভর করে গতিবেগের মাত্রার উপর।

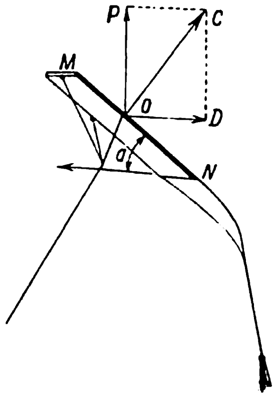
ঘুড়ি ওড়ে কেন ?

সুতো ধরে সামনে টান দিলে একটা ঘুড়ি উপরে ওঠে কেন জান কি ? যদি জান তাহলে এরোপ্লেন কেন ওড়ে এবং ম্যাপলের বীজ কেন ভেসে বেড়ায়, তাও বুঝতে পারবে। এমন কি বুমেরাঙের অদ্ভুত আচরণের কারণ সম্বন্ধেও কিছুটা হদিশ পাবে। কারণ এদের সকলকার মধ্যেই একটা সম্পর্ক আছে। যে বায়ু বুলেট বা গোলাকে অমন বাধা দেয় সেই বায়ুর জন্যই আবার ম্যাপলের হালকা বীজ এবং ভারী এরোপ্লেন পর্যন্ত উড়তে পারছে।

ঘুড়ি কেন ওড়ে তা যদি না জান তবে 31 নং চিত্রের সহজ রেখাগুলো তার ব্যাখ্যা দেবে। ধরো, *MN* রেখা ঘুড়ির প্রস্থচ্ছেদ বোঝাচ্ছে। ঘুড়িটাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি যখন সুতো টানো, ঘুড়িটা তখন তার ভারী লেজের দরুন মাটির সঙ্গে একটা কোণ করে চলতে থাকে। ধরো ঘুড়িটা ডান থেকে বাঁ দিকে যাচ্ছে এবং ঘুড়ির তল অনুভূমির সঙ্গে যে কোণে হেলে রয়েছে সেটা হল a। এবার আমরা

ঘুড়ির উপর ক্রিয়াশীল বলগুলোর হদিশ করব। বায়ু অতি অবশ্য ঘুড়ির গতিকে বাধা দেবে এবং তার উপর কিছুটা চাপ সৃষ্টি করবে। সেটাই *OC* ভেক্টর দিয়ে দেখান হয়েছে 31 নং চিত্রে। বায়ু সর্বদাই ঘুড়ির তলের উপর সমকোণে চাপ দেয়, কাজেই, *OC* রয়েছে *MN*-এর সমকোণে। তথাকথিত 'বল

চিত্র 31



যে বলগুলির কারণে ঘুড়ি ওড়ে

সামান্তরিক' (parallelogram of forces) এঁকে *OC* বলকে দুটো উপাংশে বিভাজন করা যায়। এর থেকে আমরা দুটো বল পাই—*OD* এবং *OP*। এই দুটোর মধ্যে *OD* বল ঘুড়িটাকে পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে তার প্রাথমিক বেগ কমিয়ে দেয়। অন্য বল *OP* ঘুড়িটাকে উপরে টেনে ধরে তার ওজন কমিয়ে দেয়। এই বলটা বেশি হলে ঘুড়িটার ভার অতিক্রম করে তাকে টেনে তোলে। এই জন্যই তুমি যখন সামনের দিকে টান দাও ঘুড়িটা উপরে ওঠে।

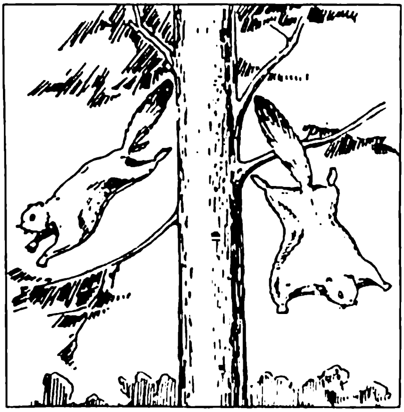
সত্যি বলতে এরোপ্লেনও একটা ঘুড়ি। তফাত এই, যে সম্মুখগতি এরোপ্লেনকে উপরে তুলে নিয়ে যায় সেটার উৎপত্তি সুতোর টান থেকে নয়, প্রপেলার বা জেট ইঞ্জিন থেকে। এটা অবশ্য খুবই সহজ সরল ব্যাখ্যা। এছাড়াও অন্য কারণ আছে যা এরোপ্লেনকে উপরে তুলে নিয়ে যায়। সেগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে 'পদার্থবিদ্যার মজার কথা' দ্বিতীয় খণ্ডে 'তরঙ্গ ও ঘূর্ণিহাওয়া' শিরোনামে।

জ্যান্ত প্লাইডার

দেখতেই পাচ্ছ, এরোপ্লেনগুলোকে পাখির মতো করে তৈরি করা হয় না। যদিও লোকে সাধারণত এরকম মনে করে। বরং এরোপ্লেনগুলো অনেকটা উড়ন্ত কাঠবিড়ালী বা উড়ুক্কু মাছের মতো। এখানে বলে রাখি, এই জন্তুগুলো কিন্তু উপরে উড়ে যাবার জন্য তাদের উড়বার কোনো ক্রিয়াবিধি (mechanism) ব্যবহার করে না, ব্যবহার করে শুধু বড়সড় ধরনের লাফ মারার বিশেষ কায়দা—বৈমানিকরা

যাকে 'প্লাইড করা' বলবেন। এদের ক্ষেত্রে *OP* বলটি (চিত্র 31) এত কম যে তাদের ভারকে অতিক্রম করতে পারে না। এটা শুধু তাদের ভারের কিছুটা লাঘব করে দেয় ফলে তারা কোনো একটা উঁচু জায়গা থেকে বড়-সড় ঝাঁপ মারতে পারে (চিত্র 32)। উড়ন্ত কাঠবিড়ালী একটা গাছের মাথা থেকে 20-30 মিটার দূরে আরেকটা গাছের নিচের ডালে লাফিয়ে হাওয়ায় ভেসে যেতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিজ ও সিংহলে আরো বড় চেহারার প্রজাতির উড়ন্ত কাঠবিড়ালী পাওয়া

চিত্র 32



উড়ন্ত কাঠবিড়ালী 20 থেকে 30 মিটার লাফ দেয়

যায়। তাগুয়ান বলে এক ধরনের উড়ন্ত লেমুর আছে, যারা আকারে প্রায় আমাদের বাড়ির বেড়ালের মতোই। এরা প্রায় আধ মিটার জুড়ে ডানা ছড়াতে পারে বলে খুব বেশী ওজন সত্ত্বেও প্রায় 50 মিটার ঝাঁপ দিতে পারে। সুন্দা দ্বীপ ও ফিলিপাইনের বাসিন্দা ফ্যালানজার্সরা তো 70 মিটার অবধি লাফাতে পারে।

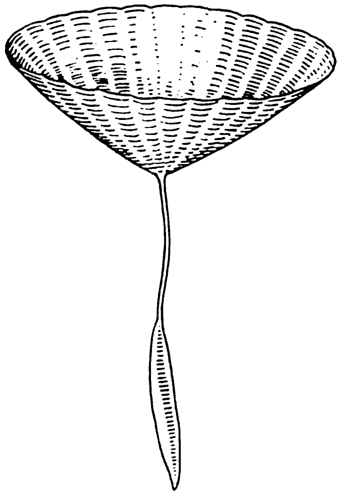
ভাসমান বীজ

গাছেরাও প্রায়ই বংশবৃদ্ধির জন্য ভেসে চলার ক্রিয়াবিধি প্রয়োগ করে। অনেক বীজের হয়ত প্যারাসুটিয় গুচ্ছ, নয়ত রোয়াওয়ালা উপাঙ্গ (কুণ্ডলোম) থাকে যেমন দেখা যায় ড্যাণ্ডেলিয়নে, বুড়ির সুতোয় ও 'ছাগল দাড়ি'তে। অনেক বীজের আবার 'ডানা' থাকে, যেমন দেখা যায় মোচাকৃতি ফলপ্রসু বৃক্ষে, ম্যাপলে, শ্বেত-ভূর্জপত্র বৃক্ষে, এলুমে, লিণ্ডেনে ও বিভিন্ন ধরনের আম্বেলিফেরিতে (ধান্য-গোত্রের গাছ)।

কেয়ার্নার ফন মারিলাউমের 'উদ্ভিদ জীবন' বইটিতে আমরা নিম্নোক্ত প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিটি দেখতে পাই ঃ

"নির্বাত রোদ ঝলমলে দিনে বেশ কিছু বীজ ও ফল ঊর্ধ্বমুখী বাতাসের স্রোতে উপরের দিকে উঠে যায়। অবশ্য গোধূলির পর তারা সাধারণত ভাসতে ভাসতে আসেপাশেই কোথায় নেমে আসে। অনেকটা দূরে যাবার জন্য বীজদের পক্ষে উড়াটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল উঁচু চত্বর বা পাহাড়ের চূড়ার ফাটলে জায়গা দখল করা। তাদের পক্ষে অন্য কোনো উপায়ে আর এখানে পেঁছন সম্ভব নয়। ইতিমধ্যে পার্শ্ব বায়ু-স্রোত এইসব ভাসমান বীজ ও ফলকে আরও দূরে বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

চিত্র 33



"ছাগল দাড়ি" ফল

'কিছু উদ্ভিদের বীজের ডানা ও প্যারাসুটগুলো শুধু উড়বার সময়েই থাকে। থিস্‌লের বীজ শান্তভাবে ভেসে চলে, তারপর যেই কোনো বাধার সম্মুখীন হয় বীজটা তার প্যারাসুট ত্যাগ করে মাটির উপর পড়ে যায়। সেই জন্যই দেওয়াল বা বেড়ার কাছে আমরা প্রায়ই থিস্‌লের কাঁটাগাছ দেখতে পাই। কিন্তু এমন উদাহরণও আছে, যখন বীজটা চিরকালের মতো প্যারাসুটের সঙ্গে আটকে থাকে।"

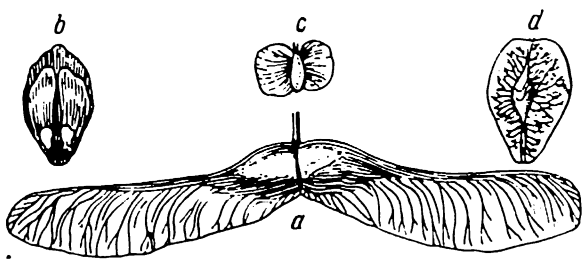
33 এবং 34 নং চিত্রে ভেসে বেড়াবার ক্রিয়াবিধি সম্পন্ন কয়েকটি বীজ ও ফল দেখানো হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে এইসব 'উদ্ভিদ-গ্লাইডার' মানুষের তৈরী

গ্লাইডারকেও বেশ কিছু বিষয়ে হার মানায়। এরা নিজেদের ভারের চেয়ে অনেক বেশী বোঝা উত্তোলন করতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাকে সুস্থিতি প্রদান করে। তাই দেখা যায় ভারতীয় মল্লিকার বীজ যদি হঠাৎ কখনো উল্টেও যায়, সেটা আপনা থেকেই আবার তার প্রাথমিক অবস্থান ফিরে পায়, অর্থাৎ বীজের উঁচু অংশটা নেমে আসে সবচেয়ে নিচের দিকে। কিন্তু কোনো বাধার সম্মুখীন হলে এটা উল্টে গিয়ে ঢিলের মতো খসে পড়ে না, ধীরে ধীরে নেমে আসে নিচে।

দেরী করে প্যারাসুটে ঝাঁপ দেওয়া

প্যারাসুটে অবতরণকারীরা মাঝে মাঝে যে দুঃসাহসী ঝাঁপ দেয়, তার কথাই নিশ্চয় স্বাভাবিকভাবে এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে। তারা প্রায় দশ কিলোমিটার উপর থেকে ঝাঁপ দেয় এবং বেশ কিছু দূর প্যারাসুট না খুলেই প্রায় পাথরের মতো খসে পড়ার পর প্যারাসুট খোলার দড়ি ধরে টান দেয়। অনেকে ভাবে যে এই দেরী করে ঝাঁপ দেওয়ার সময় প্যারাসুট আরোহী বুঝি শূন্যস্থানের মধ্য

চিত্র 34



(a) ম্যাপল, (b) পাইন গাছ, (c) বার্চ এবং (d) এল্‌ম্‌-এর ডানাওলা বীজ

দিয়ে পড়ে। সেটাই যদি সত্যি হত, তাহলে দেরীতে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারটা হত আরো সংক্ষিপ্ত, আর মাটির কাছে বেগ হত সাংঘাতিক।

বায়ুর প্রতিরোধ অবশ্য ত্বরণকে বাধা দেয়। দেরীতে ঝাঁপ দিয়েছে এমন প্যারাসুট আরোহীর পতনের বেগ শুধু প্রথম দশ সেকেন্ডে বৃদ্ধি পায়, শুধু প্রথম কয়েক শত মিটার পর্যন্ত। ইতিমধ্যে বায়ুর প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেতে পেতে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় পৌঁছয় যখন ত্বরণ একেবারে বন্ধ হয়ে যায় আর পতনও ঘটতে থাকে সুষমভাবে।

এবার বলবিদ্যার দৃষ্টি থেকে দেরী করে ঝাঁপ দেওয়া সম্বন্ধে একটা মোটা-মুটি ধারণা দেওয়া হচ্ছে। প্যারাসুট আরোহীর ওজনের উপর নির্ভর করে

ত্বরণ শুধু প্রথম 12 সেকেণ্ড বা তারও কম সময় ধরে স্থায়ী হবে কি না। এই সময়ের মধ্যে লোকটি 400-450 মিটার নেমে আসে আর তার বেগ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 50 মিটার/সেকেণ্ড। তারপর থেকে প্যারাসুট খোলার দড়িতে টান না দেওয়া পর্যন্ত সে সুষমভাবে, সমান বেগে নামতে থাকে। বৃষ্টির ফোঁটাও একই ভাবে পড়ে। একমাত্র পার্থক্য হল, বৃষ্টির ফোঁটার বেলায় প্রাথমিক পর্যায়ে ত্বরণের স্থায়িত্ব এক সেকেণ্ডের বেশী নয়। ফলে প্যারাসুটে করে দেরীতে লাফ দিলে মাটির কাছে যা বেগ হয়, মাটির কাছে বৃষ্টির ফোঁটার বেগ তার চেয়ে অনেক কম। ফোঁটার আকার অনুসারে এই বেগ সেকেণ্ডে 2 থেকে 7 মিটারের মধ্যেই থাকে।

বুমেরাং

আদিম মানুষের সেরা উদ্ভাবন এই অভিনব অস্ত্রটির নিখুঁত যন্ত্রকৌশল বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকাল বিহ্বল করে রেখেছিল। বুমেরাং যে অদ্ভুত আঁকাবাঁকা

চিত্র 35

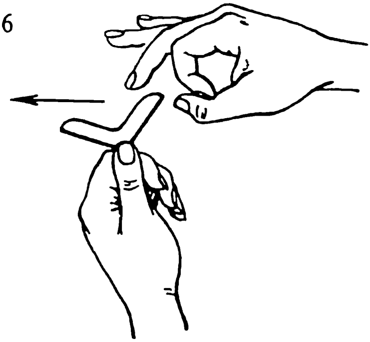


অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী বুমেরাং ছুঁড়ছে। বুমেরাং লক্ষ্য ভুল করলে যে প্রক্ষেপ-পথ নেবে সেটা দেখান হয়েছে ডোরাকাটা রেখা দিয়ে

পথে এগোয় তা দেখে সত্যিই যে কোনো লোকের ধাঁধা লাগতে পারে (চিত্র 35)। এখন আমরা বুমেরাংকে ব্যাখ্যা করার মতো বিস্তারিত তত্ত্ব পেয়েছি, এর মধ্যে আর বিস্ময়কর কিছু নেই। এই তত্ত্ব সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার পক্ষে অত্যন্ত জটিল। শুধু এইটুকুই জানিয়ে রাখি যে, বুমেরাঙের গতি তিনটি কারণের সম্মিলিত ফল—প্রাথমিক নিক্ষেপ, বুমেরাঙের নিজস্ব ঘূর্ণন এবং বায়ুর প্রতিরোধ। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা প্রবৃত্তিগতভাবেই জানে কিভাবে এই তিনটি

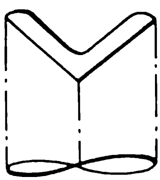
কারণকে একত্রিত করতে হয় এবং প্রত্যাশিত ফল পাওয়ার জন্য তারা নিপুণ হাতে বুমেরাঙের ঢাল ও দিকের পরিবর্তন করে ও প্রয়োজন মতো ছোঁড়ার বলকে বাড়ায় বা কমায়।

চিত্র 36



একটি কার্ড বোর্ড ব্যুমেরাং এবং সেটা কিভাবে "ছুঁড়তে" হয়

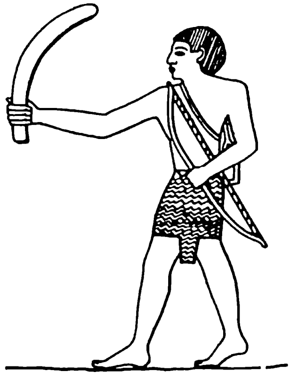
চিত্র 37



আরেকটি কার্ডবোর্ড ব্যুমেরাং

তুমিও বুমেরাং নিক্ষেপে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে পার। বাড়ির মধ্যে ব্যবহারের জন্য 36 নং চিত্রের আকারে এটাকে একটা কার্ডবোর্ড থেকে কেটে নাও। প্রত্যেক বাহু প্রায় 5 সেমি লম্বা হবে আর চওড়ায় এক সেণ্টিমিটারের কিছু

চিত্র 38



প্রাচীন মিশরীয় যোদ্ধা ব্যুমেরাং ছুঁড়ছে

কম। এটাকে বুড়ো আঙুলের নখের নিচে চেপে ধরো এবং সামনের দিকে ও একটু উপরে লক্ষ্য করে টোকা মারো। এটা প্রায় পাঁচ মিটার এগিয়ে যাবে, পাক খাবে

এবং তোমার পায়ের কাছে ফিরে আসবে। অবশ্য পথের মধ্যে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেলে হবে না। 37 নং চিত্রের অনুকরণে তুমি এর চেয়েও ভাল একটা বুমেরাং তৈরি করতে পার এবং এক্ষেত্রে এটাকে একটু মুচড়ে নিতে হবে যাতে প্রপেলারের মতো দেখতে হয় (যেমন দেখানো হয়েছে চিত্র 37-এর তলায়)। কিছু অভিজ্ঞতার পর তুমি এটাকে জটিল আঁকাবাঁকা পথে পাঠিয়ে, পাক খাইয়ে আবার নিজের পায়ের কাছে ফেরত নিয়ে আসতে পারবে।

শেষ করার আগে বলি, প্রচলিত ধারণা অনুসারে বুমেরাংটা একচেটিয়াভাবে অস্ট্রেলীয়রাই যে শুধু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করত তা নয়। ভারতেও এটা ব্যবহার হত এবং এখনও টিকে থাকা কিছু দেওয়াল চিত্র সাক্ষ্য দেয় যে, আসিরীয় যোদ্ধারাও তা হামেশাই ব্যবহার করত। অস্ট্রেলীয়দের বুমেরাঙের একমাত্র বৈশিষ্ট্য হল ওই প্রপেলারের মতো প্যাঁচটা, যার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এর জন্যই এটা ওইরকম চোখ ধাঁধানো নানারকম পাক মেরে এঁকেবেঁকে চলে আর যদি বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তো নিক্ষেপকারীর কাছেই ফিরে আসে।

পরিচ্ছেদ 8

ঘূর্ণন।

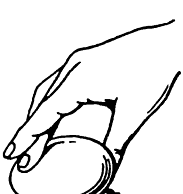
'অবিরাম গতি' যন্ত্র

সিদ্ধ ও কাঁচা ডিমের মধ্যে তফাত বুঝবে কি করে?

খোলা না ভেঙে আমরা কি করে জানতে পারব যে, ডিমটা সিদ্ধ করা হয়েছে, না হয়নি?

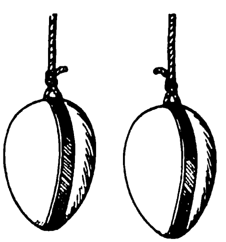
বলবিদ্যা এর উত্তর দেয়। সিদ্ধ ডিম যেভাবে পাক খায় কাঁচা ডিম সেভাবে পাক খায় না—কৌশল বলতে এইটাই। একটা ডিম নিয়ে চ্যাপ্টা থালার উপর রেখে সেটাকে পাক খাইয়ে দাও (চিত্র 39)। একটা সিদ্ধ ডিম, বিশেষ করে খুব বেশিক্ষণ সিদ্ধ হলে, কাঁচা ডিমের চেয়ে অনেক দ্রুত ও অনেক বেশিক্ষণ ধরে ঘুরবে। সত্যি বলতে, কাঁচা ডিমকে পাক খাওয়ানোই শক্ত। ভালভাবে সিদ্ধ করা ডিম এত দ্রুত পাক খায় যে, একটা চ্যাপ্টা সাদা উপবৃত্তজের আবছা আকার গ্রহণ করে। খুব জোরে পাক দিয়ে ছেড়ে দিলে এটা তার সরু দিকটার উপরে উঠেও দাঁড়াতে পারে।

চিত্র 39



একটি ডিমকে পাক খাওয়ানো

চিত্র 40



সেদ্ধ ডিম ও কাঁচা ডিম চেনা

এর ব্যাখ্যাটা হল, বেশি সিদ্ধ ডিম যেখানে পুরোটাই একক বস্তু হিসাবে পাক খায়, সেখানে কাঁচা ডিম তা করে না। কাঁচা ডিমের ভিতরের জলীয় অংশ খোলার

সঙ্গে সঙ্গে ঘূর্ণনের প্রদত্ত গতি লাভ করে না বলে বাধা হিসাবে কাজ করে, তরলাংশের জাড্য-বল কঠিন খোলার পাক খাওয়াকে কমিয়ে দেয়। তাছাড়া সিদ্ধ ও কাঁচা ডিমের ঘূর্ণন থামে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। ঘূরন্ত সিদ্ধ ডিমে একটা আঙুল ছোঁয়ান মাত্র সেটা থেমে যায়। কিন্তু কাঁচা ডিম ছোঁয়ান আঙুলটি সরিয়ে নেবার পরেও কিছুক্ষণ ঘোরে। এখানেও জাড্য-বল কাজ করছে। আঙুল ছোঁয়ানতে শক্ত খোলাটা স্থির অবস্থায় আসার পরেও কাঁচা ডিমের তরল অংশ ঘুরতেই থাকে। এ অবস্থায় সিদ্ধ ডিমের বেলায় কিন্তু বাইরের খোলা সমেত ভিতরের অংশের ঘূর্ণন এক সঙ্গেই বন্ধ হয়ে যায়।

একই জাতের আরেকটা পরীক্ষার কথা বলি। একটা কাঁচা ও একটা সিদ্ধ ডিমের দুটোরই লম্বাটে দিক বরাবর দুটো রবারের ব্যাণ্ড পরিয়ে দাও। তারপর একই প্রকার দড়ি বেঁধে ডিম দুটোকে ঝুলিয়ে দাও (চিত্র 40)। দড়ি দুটোর প্রত্যেকটাকেই সমান সংখ্যক পাক্ দিয়ে তারপর ছেড়ে দাও। সঙ্গে সঙ্গে ডিম দুটোর মধ্যে তফাত ধরতে পারবে। জাড্যের দরুন সিদ্ধ ডিম পাক খুলতে খুলতে প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে দড়িটাকে উল্টো দিকে কয়েকবার পাক্ খাওয়াবে, তারপর ডিমটার ঘোরার জন্য দড়িটা আবার কয়েক পাক্ খুলবে, এবং এই চলতে থাকবে কিছুক্ষণ ধরে। পাকের সংখ্যা কমতে কমতে শেষে ডিমটা দাঁড়িয়ে পড়বে। অন্য দিকে কাঁচা ডিমটা কিন্তু দড়ির পাক খুলতে খুলতে কোনোক্রমে হয়তো তার প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে, এক বা দু'বার পাক খেয়েই সিদ্ধ ডিমের অনেক আগেই থেমে যায়। আমরা তো আগেই জানতে পেরেছি যে, এর কারণ হল ডিমের ভেতরকার তরলাংশ তার গতিকে বাধা দেয়।

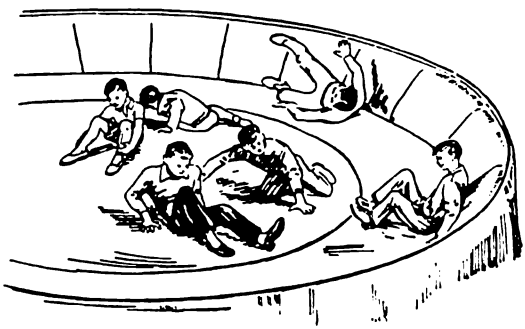
ঘূর্ণি

একটা ছাতা খুলে উপর দিকটা মেঝের উপর রেখে হাতলটাকে ঘুরাতে থাক। খুব সহজেই এটাকে বেশ জোরে ঘোরাতে পারবে। এবার ছোট্ট একটা বল বা একটা কাগজ মুচড়ে নিয়ে ছাতার মধ্যে ফেলে দাও। এটা ছাতার মধ্যে থাকবে না, ছিটকে বাইরে বেরিয়ে আসবে। এর জন্য ভুল করে 'অপকেন্দ্র বল'কে দায়ী করা হয়, কিন্তু আসলে এটা শুধু জাড্যের বলের প্রকাশ। বল বা কাগজের টুকরোটা প্রসারিত ব্যাসার্ধ বরাবর ছিটকে যায় না, ছিটকে যায় বৃত্তীয় গতির স্পর্শরেখা বরাবর।

ঘূর্ণনের এই নীতি অনুযায়ী অনেক পাবলিক পার্কে এরকম মজার জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। এখানে তুমি নিজের উপর জাড্যের সূত্র প্রয়োগ করে দেখতে পারো। এটা গোলাকার মেঝেওলা এক ধরনের ঘূর্ণি, যার উপর লোকে দাঁড়াতে, বসতে বা শুতে পারে। চোখের আড়াল থেকে একটা মোটর মেঝেটাকে ঘোরাতে

শুরু করে আস্তে আস্তে তার দ্রুতি এমন বাড়িয়ে তোলে যে, জাড্যের ফলে প্রত্যেকেই গড়িয়ে বা হড়কে তার কিনারায় চলে আসে। প্রথম দিকে ব্যাপারটা প্রায় বোঝাই যায় না, কিন্তু যে যত কেন্দ্র থেকে দূরে সরে আসে, ততই বোঝা যায় যে গতি এবং গতি-জনিত জাড্য কত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যতই নিজেকে সামলে রাখতে চেষ্টা করো, শেষ পর্যন্ত তোমায় ছিটকে ফেলবেই।

চিত্র 41



ঘুরন্ত-চাকির মধ্যে ছেলেদের পড়ে যাওয়া দেখান হয়েছে

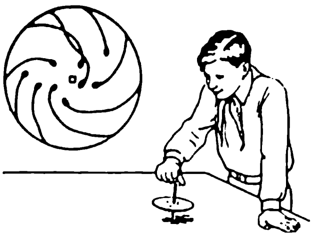
সত্যি বলতে পৃথিবীটাও একটা বিশাল ঘূর্ণি। এটা আমাদের ছিটকে ফেলে না কিন্তু ওজন কমিয়ে দেয়। ঘূর্ণনের মাত্রা বিষুবরেখা বরাবর সব চেয়ে বেশি। সেখানে এইভাবে একজনের ওজনের 300 ভাগের এক ভাগ মত কমে যায়। এটা এবং এর সঙ্গে আরেকটা কারণ অর্থাৎ পৃথিবীর চাপাভাবের জন্য বিষুবরেখায় প্রায় শতকরা 0·5 ভাগ বা $\frac{1}{200}$ অংশ ওজন কমে যায়। ফলে একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোক মেরু অঞ্চলের তুলনায় বিষুবীয় অঞ্চলে 300 গ্রাম কম ওজন হবে।

কালিমাখা ঘূর্ণিহাওয়া

চিত্র 42 অনুসারে এক মুখ সরু করা দেশলাই কাঠি ও সাদা কার্ডবোর্ড থেকে 42 মিমি ব্যাসের একটি টিটোটাম (চ্যাপ্টা লাট্টু) তৈরি করো। এটাকে পাক খাওয়াতে তেমন কোনো দক্ষতা লাগে না—বাচ্চারাও পারে। কিন্তু বাচ্চাদের খেলনা হলেও এর থেকে অনেক কিছু শেখবার আছে। এবার একটা কাজ করো। এটার উপর কয়েক ফোঁটা কালি ছড়িয়ে দিয়ে কালিটা শুকোবার আগেই এটাকে

ঘুরিয়ে দাও। থামবার পর কালির ফোঁটাগুলোর অবস্থা কি হয়েছে দ্যাখো। এগুলো কতকগুলো আবর্ত আঁকবে—ছোটখাট চেহারার ঘূর্ণিহাওয়া।

চিত্র 42



ঘূরন্ত চাকতি লাট্টুতে কালির রেখা

তাবলে এই সাদৃশ্য কিন্তু কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। টিটোটামের উপরকার আবর্তগুলো কালির ফোঁটার গতি অনুসারে রচিত। ঘুরন্ত মেঝের উপর তোমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল এখানে ঠিক তাই হয়েছে কালির ফোঁটাগুলোর বেলায়। অপকেন্দ্র বলের জন্য ফোঁটাগুলো যতই কেন্দ্র থেকে বাইরে ছড়িয়ে গিয়ে টিটোটামের উপর এমন জায়গায় পেঁছয় যেখানে টিটোটামের দ্রুতি ফোঁটার চেয়ে বেশী। থালাটা এখানে ফোঁটার চেয়ে দ্রুত ঘুরছে তাই মনে হয় ফোঁটাটা যেন চাকার স্পোক থেকে হড়কে পিছিয়ে পড়ছে। এই জন্যই ফোঁটাগুলো বেঁকে যায় আর আমরা বক্রগতির অনুরেখ দেখতে পাই।

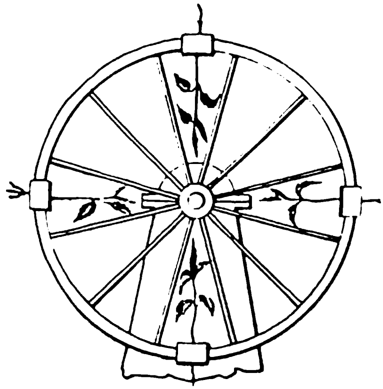
উচ্চ বায়ুচাপের কেন্দ্র থেকে ('অ্যান্টিসাইক্লোনের') অপসারী বা নিম্ন বায়ুচাপের কেন্দ্রের দিকে ('সাইক্লোনের') অভিসারী বায়ুপ্রবাহের বেলাতেও একই কথা খাটে। কালির আবর্তগুলো সাংঘাতিক ঘূর্ণিহাওয়ার ক্ষুদ্র সংস্করণের পরিচয় দেয়।

গাছকে ঠকানো

দ্রুত ঘূর্ণনের জন্য সৃষ্ট অপকেন্দ্র বল যে অভিকর্ষকেও পরাস্ত করতে পারে সেটা একশ বছরেরও আগে ব্রিটিশ উদ্ভিদ-বিশারদ নাইট প্রদর্শন করেছিলেন। সবাই জানে যে তরুণ গাছ তার কাণ্ডকে সর্বদাই অভিকর্ষের বিপরীত দিকে বাড়িয়ে দেয় বা চলতি ভাষায়, উপর দিকে বৃদ্ধি পায়। নাইট কিন্তু দ্রুতগতি চাকার বাইরের কিনারা থেকে বীজদের দিয়ে ভিতরের দিকে, চাকার কেন্দ্রের দিকে, অংকুরোদ্গম করিয়েছিলেন। আর কাণ্ডগুলো বৃদ্ধি পেয়েছিল বাইরের দিকে (চিত্র 43)। বলা যেতে পারে, অভিকর্ষের বদলে অপকেন্দ্র বলের সাহায্যে

তিনি গাছকে বোকা বানিয়েছিলেন। পৃথিবীর স্বাভাবিক আকর্ষণের থেকে বেশী শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছিল এই কৃত্রিম অভিকর্ষ। কথা প্রসঙ্গে

চিত্র 43



পাক-খাওয়া চাকার রীমের ওপর অঙ্কুরিত বীজ অ্যাক্সেলের দিকে ডগা বাড়ায় এবং তাদের শিকড়গুলোকে পাঠায় বাইরের দিকে

জানিয়ে রাখি, নীতিগতভাবে ঘটনার এই ব্যাখ্যার সঙ্গে অভিকর্ষের আধুনিক তত্ত্বের কোন বিরোধ নেই।

'অবিরাম গতি' যন্ত্র

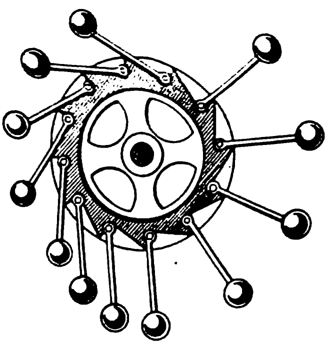
কথায় কথায় প্রায়ই 'অবিরাম গতি'র প্রসঙ্গ ওঠে। কিন্তু এটা বলতে ঠিক কি বোঝায় তা বোধহয় সকলে জানে না। 'অবিরাম গতি' যন্ত্র একটা কাল্পনিক ক্রিয়াবিধি (mechanism), যা অনন্তকাল ধরে তার গতি বজায় রাখে এবং ইতিমধ্যে কিছু কাজের কাজও করতে পারে, যেমন ধরা যাক ভার উত্তোলন। প্রাচীন কাল থেকেই এই যন্ত্রটি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু কোনোদিনই তা তৈরি করা যায়নি। এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে এই দৃঢ় ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, 'অবিরাম গতি' যন্ত্র অসম্ভব এবং এর থেকেই জন্ম নেয় শক্তির সংরক্ষণ সূত্র— আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। তথাকথিত 'অবিরাম গতি' হল বিনা কার্যে প্রাপ্ত অফুরন্ত গতি।

'অবিরাম গতি' যন্ত্রের সবচেয়ে প্রাচীন পরিকল্পনাগুলির মধ্যে একটিকে দেখানো হয়েছে 44 নং চিত্রে। কিছু ক্ষ্যাপা লোক এটিকে নিয়ে এখনও মাথা ঘামাতে চায়। যন্ত্রটির চাকার কিনারায় কতকগুলি রড আছে যাদের প্রান্তে রয়েছে ওজন। চাকার যে কোনো অবস্থানে ডানদিকের ওজনগুলো, বাঁদিকের

চেয়ে কেন্দ্র থেকে বেশি দূরে থাকে। ফলে ডানদিকের ওজনগুলো বাঁদিকের চেয়ে সব সময়ই বেশি হবে এবং এতে চাকাটাকে ঘুরতে বাধ্য করাবে। সুতরাং চাকাটি চিরকাল ধরে ঘুরবে। নিদেন পক্ষে তার অক্ষ যতদিন না ক্ষয়ে যাচ্ছে ততদিন তো বটেই। এর উদ্ভাবক অন্তত তাই ভেবেছিল। এমন যন্ত্র তৈরি করার চেষ্টা করো না। এটা কখনোই ঘুরবে না। কেন?

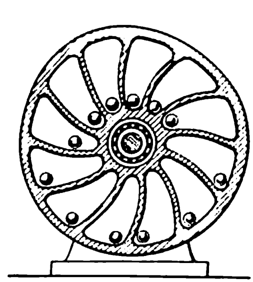
ডানদিকের ভারগুলো কেন্দ্র থেকে সর্বদাই বেশি দূরে থাকে বটে, কিন্তু এমন একটা অবস্থান আসবেই যখন দেখবে তাদের সংখ্যা বাঁদিকের ভারগুলোর

চিত্র 44



মধ্যযুগের একটি "চিরস্থায়ী" ঘূর্ণায়মান চাকা।

চিত্র 45



একটি "অবিরাম গতি" যন্ত্র যার খোপের মধ্যে বল নড়াচড়া করছে।

চেয়ে কম। আরেকবার 44 নং চিত্রটি দ্যাখো। ডানদিকে মাত্র চারটে ভার দেখতে পাচ্ছ আর বাঁদিকে আটটা। সমস্ত ব্যবস্থাটার মধ্যে এইভাবে সমতা রক্ষা হচ্ছে। চাকাটা আদপেই ঘুরবে না, শুধু একটু দুলে উঠে তারপর এই অবস্থানে এসে থেমে যাবে। (এই যন্ত্রের গতিকে তথাকথিত ভরবেগের উপপাদ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।)

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, শক্তির উৎস হিসাবে 'অবিরাম গতি' যন্ত্র পুরোপুরি অসম্ভব। এ কাজ হাতে নেওয়া নিরর্থক। প্রাচীনকালের অ্যালকেমিস্টরা, বিশেষ করে মধ্যযুগে, বৃথাই এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে মাথা খাটিয়েছিলেন। এই কাজটি তাঁদের 'পরশ পাথর'-এর থেকেও বেশী প্রলুব্ধ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত রুশ কবি পুশকিন তাঁর 'শিভালরাস এপিসোড'-এ বার্থোল্ড নামে এমনই এক স্বপ্নদর্শীর বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

" 'অবিরাম যন্ত্রটা কি জিনিস ?' মার্টিন জিজ্ঞাসা করল।

" 'অবিরাম যন্ত্র হল অবিরাম গতি।' উত্তর দিল বার্থোল্ড, 'আমি যদি অবিরাম গতি খুঁজে পাই তাহলে মানুষের সৃষ্টিধর্মী প্রয়াসের আর সীমা বলে কিছু থাকবে না। বুঝলে হে মার্টিন, সোনা তৈরি করাটা খুবই মোহময়, হয়তো বা এ আবিষ্কার যেমন অদ্ভুত তেমনই লাভজনক, কিন্তু তবু কি চমৎকার ব্যাপারই না হবে যদি অবিরাম গতির যন্ত্রটা পাই… !'

শয়ে শয়ে 'অবিরাম গতি' যন্ত্র তৈরী হয়েছে কিন্তু তার কোনোটাই কখনও চলেনি। প্রত্যেক উদ্ভাবকই অতি অবশ্য এমন একটা কিছু খেয়াল করেননি যা ব্যাপারটিকে বানচাল করে দিয়েছে।

45 নং চিত্রে এই জাতীয় আরেকটি 'অবিরাম গতি' যন্ত্র দেখা যাচ্ছে। চাকাটির বাইরের কিনারা ও অক্ষসংলগ্ন কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যবর্তী খোপে কতক-গুলি ভারী বল গড়াগড়ি করে। ধারণাটা ছিল, চাকার এক পাশের কিনারার নিকটবর্তী বলগুলোর ওজনের জন্য চাকাটা ঘুরতে বাধ্য হবে।

এমনটা কিন্তু কখনই ঘটবে না। কারণটা সেই একই যার জন্য 44 নং চিত্রের চাকাটাও ঘোরে না। তবু, একটা কাফের বিজ্ঞাপণ হিসাবে লস এঞ্জেলসে এই রকমের বিশাল একটা চাকা তৈরি করা হয়েছিল (চিত্র 46)। আসলে এটা ছিল ধাপ্পা, সুচতুরভাবে চোখের আড়ালে রাখা একটা যন্ত্র দিয়ে চাকাটা ঘোরানো হত। আর লোকে ভাবত খোপের মধ্যে ভারী ভারী বলগুলো গড়িয়ে গড়িয়েই বুঝি চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে। মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই ধরনের আরো অনেক লোক-ঠকানো 'অবিরাম গতি' যন্ত্র বসানো হয়েছিল ঘড়ির দোকানের জানলায়। এগুলো সবই চলত বিদ্যুতে।

প্রসঙ্গত বলি, এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন আমার ছাত্রদের খুব প্রভাবিত করেছিল। আমি যখন তাদের বললাম অবিরাম গতি সম্ভব নয়, তারা বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। কথায় আছে, দেখা মানেই বিশ্বাস করা। আমার ছাত্ররা দেখেছিল বলগুলো গড়াতে গড়াতে চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে, তাই আমি যা-ই বলি না কেন, চাকাটাকে তার চেয়ে বেশী বিশ্বাসজনক মনে হয়েছিল। আমি তাদের বললাম, শহরের সরবরাহ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে ওই ধাপ্পাবাজীর 'আশ্চর্য" যন্ত্রটা চালান হচ্ছে। তাতেও কোনো লাভ হল না। তখন মনে পড়ল রবিবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে। ছাত্রদের উপদেশ দিলাম কোনো এক রবিবারে ওই দোকানে গিয়ে হাজির হতে।

" 'অবিরাম গতি' যন্ত্রটাকে চলতে দেখলে ?" পরে জিজ্ঞাসা করলাম।

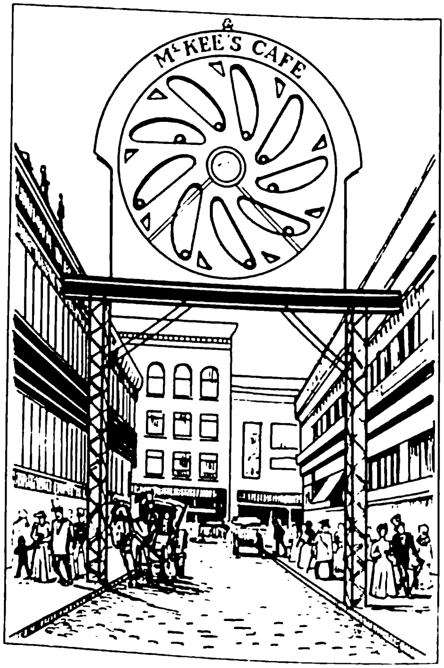
মাথা নীচু করে তারা জানাল, "না, একটা খবরের কাগজ দিয়ে ঢেকে রেখেছিল।"

শক্তির সংরক্ষণ সূত্রের প্রতি সেই যে তাদের আবার আস্থা ফিরে এল আর কখনো সে সম্বন্ধে বিশ্বাস হারায় নি।

গল্প

স্ব-শিক্ষিত অনেক অভিনব রুশ উদ্ভাবক 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের আকর্ষণীয় সমস্যার সমাধান করেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর খ্যাতনামা রুশ ব্যঙ্গ সাহিত্যিক

চিত্র 46



লস এঞ্জেলসের একটি কাফেতে লোক-ঠকানো "অবিরাম গতি যন্ত্রের" বিজ্ঞাপন।

সলতিকভ শেদ্রিন তাঁর 'মডার্ন আইডিল'-এ সাইবেরিয়ার এই রকম একজন কৃষক আলেকজান্দার শেগলভের কথা লিখেছেন। গল্পে অবশ্য তিনি নামটা পাল্টে প্রেজেন্তভ করেছেন। উদ্ভাবকের কারখানা পরিদর্শনের বর্ণনা দিয়ে তিনি লিখছেন ঃ

"35টি গ্রীষ্মকাল পার করেছে প্রেজেন্তভ নামে মানুষটি। গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, মুখটা ফ্যাকাশে। চোখদুটি বড় বড় ও বিষণ্ণ, লম্বা চুলের গুচ্ছ এসে পড়েছে

ঘাড়ের উপর। তার মোটামুটি প্রশস্ত ঘরের আধখানা দখল করে নিয়েছে বিরাট একটা ফ্লাইহুইল। কোনোক্রমে চেপেচুপে ভিতরে প্রবেশ করলাম। চাকাটায় পাখি (spoke) লাগানো আছে—পেরেক দিয়ে তক্তা-জুড়ে তৈরী বাইরের কিনারাটা অনেকটা ঠিক বাক্সের মতো আকারে রীতিমতো বড়সড়। এর ভেতরটা ফাঁকা আর এর মধ্যেই আছে কার্যসাধনের বন্দোবস্তগুলি উদ্ভাবকের গুপ্ত কৌশল। এর মধ্যে তেমন কোনো চাতুর্যের ব্যাপার নেই—শুধু কিছু বালির বস্তা যা পরস্পরকে সুষম অবস্থায় রাখছে। পাখির মধ্যে একটা কাঠি পুরে চাকাটাকে স্থির রাখা হয়েছে।

"'আমরা শুনেছি আপনি নাকি অবিরাম গতির সূত্রকে বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন। কথাটা কি সত্যি ?' আমি শুরু করলাম।

"'ঠিক কি বলব বুঝতে পারছি না।' দ্বিধাগ্রস্তভাবে উত্তর দিল। 'মনে তো হয় করেছি।'

"'আমরা কি একটু দেখতে পারি ?'

"'অবশ্যই ! অত্যন্ত খুশি হব।'

"তিনি আমাদের চাকার কাছে আর তারপর ঘুরে পিছন দিকে নিয়ে গেলেন। দু'দিক থেকেই দেখলাম জিনিসটা—চাকা ছাড়া কিছুই নয়।

"'এটা কি ঘোরে ?'

"'ঘোরা তো উচিত। তবে ও বড়ই খামখেয়ালী !'

"'কাঠিটাকে কি বার করে নিতে পারেন ?'

"প্রেজেন্তভ কাঠিটা সরিয়ে নিল, কিন্তু চাকাটা দাঁড়িয়েই আছে।

"'আবার বদমাইশি জুড়েছে।' প্রেজেন্তভ বলল। 'একটু ঠেলে দেওয়া দরকার।'

"দু'হাতে চাকার কিনারাটা ধরে কয়েকবার সামনে-পিছনে দুলিয়ে তারপর, যত জোরে সম্ভব ঠেলে দিল। চাকা ঘুরতে শুরু করল। কয়েক পাক বেশ দ্রুত ও স্বচ্ছন্দে ঘুরল। কিনারার ভিতর বালির বস্তাগুলোর তক্তার গায়ে আঘাত করার ও হড়কে সরে যাওয়ার আওয়াজ কানে আসছে। তারপর চাকাটার গতি ক্রমেই কমতে লাগল। ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ তুলে চাকাটা শেষ পর্যন্ত একেবারেই থেমে গেল।

"'কোথায় একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে।' চাকাটায় আবার পাক মেরে বিব্রত উদ্ভাবক বুঝিয়ে বলল। কিন্তু এবারেও সেই একই হাল।

"'আপনি বোধহয় ঘর্ষণের কথা ভুলে গেছেন ?'

"'না ভুলিনি…ঘর্ষণের কথা বলছেন তো ? তার জন্য নয়। ঘর্ষণ কিছু নয়। এটা কখনো কখনো আমাদের খুশি করে, আর তারপরেই হঠাৎ আবার

খেল্ শুরু করে দেয়। খেলো জিনিসের মতো হয়ে যায়। এই হচ্ছে ব্যাপার। বাতিল কাঠকুটো দিয়ে তৈরী কিনা তাই, যদি বাজে মাল না হয়ে খাঁটি জিনিসের হত তো দেখতেন !' ”

একটা 'গণ্ডগোল' বা 'খাঁটি জিনিস' কিন্তু এই ত্রুটির জন্য দায়ী নয়। এর মূলে রয়েছে ভুল নীতি। উদ্ভাবকের ঠেলার জন্যই চাকাটা কিছুক্ষণ ঘুরেছিল। কিন্তু ঘর্ষণের জন্য বাইরে থেকে প্রযুক্ত শক্তি ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে চাকাটাকে থামতেই হবে।

'ওই বলগুলোই যা করছে'

লেখক কারোনিন (এন. ইয়ে. পেত্রোপাভলোভস্কীর ছদ্মনাম) তাঁর 'পারপিচুয়াম মোবাইল' গল্পে আরেকটি 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের এক রুশ উদ্ভাবকের কাহিনী লিখেছেন। ইনি হলেন, পার্ম গুবেরনিয়ার লাভ্রেন্তী গোল্দিরেভ নামে এক কৃষক। 1884 সালে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। গল্পে কারোনিন তাঁর নামটাকে পাল্টে পিথাঁতিন করেছেন এবং যন্ত্রটার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন।

“ সামনেই দেখলাম বিরাট চেহারার অদ্ভুত এক যন্ত্র। প্রথম দর্শনেই মনে হল, ঘোড়ায় খুর লাগাবার সময় কামাররা যে জিনিসটা ব্যবহার করে তার সঙ্গে এর বেশ সাদৃশ্য আছে। কিছু এলোমেলো কাঠের থাম ও কড়িকাঠ এবং ফ্লাইহুইল ও গীয়ার-হুইলের ব্যাপক ব্যবস্থা চোখে পড়ল। পুরো ব্যাপারটাই দেখতে খুব জেবড়া-জোবড়া, স্থূল আর কুৎসিত। যন্ত্রটার নিচে কয়েকটা লোহার বল পড়ে ছিল এবং এক পাশে রাখা ছিল তাদের পুরো একটা সারিও।

“ 'এই কি সেই জিনিস ?' মেজর-ভোমো জিজ্ঞেস করলেন।

“ 'সেই জিনিস।'

“ 'তা, এটা ঘোরে না কি ?'

“ 'ঘোরে না মানে ?'

“ 'ঘোরাবার জন্য ঘোড়া আছে বুঝি ?'

“ 'ঘোড়া ? কি দরকার ? এ তো আপনা থেকেই ঘোরে।' পিথাঁতিন উত্তর দিল। তারপর দৈত্যটার ক্রীয়াকাণ্ড প্রদর্শন করাতে শুরু করল।

“ 'কাছেই স্তূপ করে রাখা লোহার বলগুলোই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করল।

“ 'এই বলগুলো যা করার করছে। দেখুন, প্রথমেই এটা গপ্ করে এই চামচটাতে গিয়ে আঘাৎ করবে। তারপর ওই খাঁজটা ধরে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়ে আবার ওই চামচটায় পড়বে। তারপর পাগলের মতো ছুটে গিয়ে ওই যে চাকাটা, ওটার উপর এমন জোরসে ধাক্কা মারবে যে, চাকাটা কঁকিয়ে উঠবে। ইতিমধ্যে আরেকটা বলও ঐ পথে এগোতে শুরু করেছে। এটা আবার চোখের

নিমেষে ছুটে আসবে এখানে। এখান থেকে খাঁজ বেয়ে ছুটে গিয়ে চামচটায় মারবে ধাক্কা, লাফিয়ে উঠবে চাকায়, তারপর আবার! এইভাবেই চলতে থাকে। দাঁড়ান, চালু করে দিচ্ছি।'

" 'পিথাতিন তাড়াহুড়ো করে এদিক-ওদিক থেকে বলগুলো সংগ্রহ করে আনল। শেষ পর্যন্ত পায়ের কাছে সবগুলোকে জড় করে একটাকে তুলে নিয়ে যত জোরে সম্ভব ছুঁড়ে মারল যন্ত্রের নিকটতম চামচের গর্তে। তারপর হাত চালিয়ে তুলে নিল দ্বিতীয় বলটা, তারপরে তৃতীয়টা। সে যা শব্দ, চিন্তা করা করা যায় না। লোহার চামচগুলোর গায়ে বলগুলো ঝনঝন করে উঠল, চাকাটা ক্যাঁচক্যাঁচ করছে, থামগুলো গোঙাচ্ছে। আঁধারি জায়গাটা জুড়ে এক নারকীয় আর্তনাদ ও কোলাহল ছড়িয়ে পড়ল।"

কায়োনিন দাবি করেছিলেন যে, গোল্ডিরেভের যন্ত্র চলেছিল। এটা কিন্তু সম্পূর্ণই বোঝার ভুল। বলগুলো যখন নিচের দিকে পড়ে শুধু ততক্ষণই চাকাটার পক্ষে ঘোরা সম্ভব। ঠিক যেমনটা ঘটে ওজন লাগালে পেণ্ডুলাম ঘড়ির বেলায়—উত্তোলনের জন্য সঞ্চিত স্থিতি শক্তি ব্যয় করে চাকাটা ঘোরে। যাইহোক, চাকাটার পক্ষে বেশিক্ষণ ঘোরা সম্ভব ছিল না। চামচগুলোকে আঘাত করতে করতে সব কটা বল নিচে নেমে আসার পর চাকাটাকে থামতেই হত। অবশ্য, চাকাটার যতগুলো বলকে ঠেলে তোলার কথা, তাদের বিপরীত ক্রিয়ার জন্য চাকাটার পক্ষে তারও আগেই থেমে যাওয়াটা অসম্ভব কিছু নয়।

পরবর্তীকালে ইয়েকাতেরিনবুর্গের এক প্রদর্শনীতে কলকারখানার সত্যিকার যন্ত্র দেখে গোল্ডিরেভ তাঁর উদ্ভাবন সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। এখানে তিনি তাঁর যন্ত্রটিকেও দেখাতে এসেছিলেন। তাঁর 'অবিরাম গতি' যন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তিনি হতাশ হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন, "গোল্লায় যাক! ওটাকে জ্বালানী কাঠ হিসাবে কেটে নিয়ে যেতে বলুন।'

উফিমৎসেভের সঞ্চয়কারী

খুব খেয়াল করে না দেখলে 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের দর্শক কি রকম ফাঁদে পড়তে পারেন তার ভাল উদাহরণ উফিমৎসেভের এই তথাকথিত গতিশক্তির সঞ্চয়কারী। কুর্স্ক (Kursk)-এর বাসিন্দা, উদ্ভাবক উফিমৎসেভ একটি নতুন ধরনের বায়ুচালিত শক্তিউৎপাদন কেন্দ্রের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই যন্ত্রটি ছিল ফ্লাইহুইল ধরনের একরকমের সাধারণ 'জাড্য সঞ্চয়কারী' ব্যবস্থা। 1920 সালে তিনি এই যন্ত্রের একটি ছোট নমুনা তৈরি করেন। বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠের মধ্যে এই চাকার মতো জিনিসটি বল-বিয়ারিং-এ বসানো একটা খাড়া অক্ষের উপর চারদিকে ঘুরত। মিনিটে 20,000 পাক ঘুরিয়ে ছেড়ে দিলে চাকাটা একটানা

15 দিন ঘুরত। চিন্তা না করলে দর্শকের পক্ষে বিশ্বাস করে ফেলা অসম্ভব নয় যে, সত্যি বুঝি সে 'অবিরাম গতি' যন্ত্র দেখছে।

'অলৌকিক, তবু অলৌকিক নয়'

'অবিরাম গতি' যন্ত্রের জন্য নিষ্ফল অনুসন্ধান অনেকের জীবনকেই বিপর্যস্ত করেছে। আমি একজন কারখানার শ্রমিককে চিনতাম যে 'অবিরাম গতি' যন্ত্র তৈরি করতে পারবে এই মরীচিকায় ভুলে তার সমস্ত সঞ্চয় খরচ করে সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছিল। ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকে, সর্বদা ক্ষুধার্ত, মানুষটি যাকেই দেখত, তার কাছেই কিছু পয়সা ভিক্ষা চাইত যাতে সে তার আসল যন্ত্রটা তৈরি করতে পারে। এ যন্ত্রটা নাকি 'নিশ্চয় চলবে'। শুধু পদার্থবিদ্যার গোড়ার কথা না জানার জন্য মানুষটিকে এরকম দুর্দশায় পড়তে দেখে খুবই খারাপ লাগত।

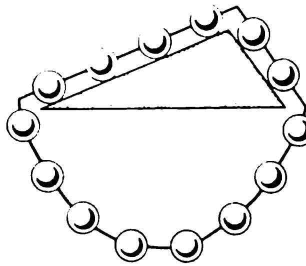
ভাবলে খুব আশ্চর্য লাগে যে, একদিকে যেমন 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের অনুসন্ধান চিরকালই ছিল নিষ্ফল, তেমনই অপর দিকে এই নিষ্ফলতার বদ্ধমূল ধারণা থেকেও কিন্তু অনেক মূল্যবান আবিষ্কারের রাস্তা খুলে গেছে।

খুব প্রাসঙ্গিক একটি সুন্দর উদাহরণ হিসাবে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ওলন্দাজ বিজ্ঞানী স্টেভিনের কথা বলা যায়—যিনি আনত ভূমিতে বলের সাম্যতার সূত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আজকালের প্রায়ই উল্লেখ করা এমন সব বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য স্টেভিন যা পেয়েছেন তার থেকেও ঢের বেশি খ্যাতি তার লাভ করা উচিত ছিল। তার আবিষ্কারের মধ্যে আছে দশমিক ভগ্নাংশ, বীজগণিতে হরের প্রচলন এবং উদস্থিতিক সূত্র (hydrostatic law), যা পরবর্তীকালে পাস্কাল পুনরাবিষ্কার করেন।

বলের সামান্তরিক সূত্রের সাহায্য না নিয়েই স্টেভিন আনত ভূমিতে বলের সাম্যতার সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি একটি ছবি এঁকে সূত্রটি প্রমাণ করেন। 47 নং চিত্রে সেইটাই দেখা যাচ্ছে। 14টি সমান গোলাভের (spheroids) একটি শিকল পরানো হয়েছে তিন বাহু বিশিষ্ট একটি প্রিজমকে। চেনটার এখন কি হবে? মালার মতো ঝুলে পড়া তলার দিকটা, দেখতেই পাচ্ছ, সুষম অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু অন্য দুটো অংশ কি পরস্পরকে সুস্থিতিতে রাখবে? অন্যভাবে বললে, ডানদিকের দুটি গোলাভ কি বাঁদিকের চারটিকে ধরে রাখতে পারবে? উত্তর হল, হ্যাঁ। না হলে, শিকলটা আপনা হতেই ডানদিক থেকে বাঁদিকে গড়াতে থাকবে এবং ইতিমধ্যে সরে-যাওয়া গোলাভগুলির জায়গা দখল করবে অন্যেরা। ফলে কখনোই সাম্যাবস্থা ফিরে আসবে না। কিন্তু আমরা জানি, এইভাবে রাখা একটা শিকল কখনো আপনা হতে চলতে পারে না। বোঝাই যাচ্ছে ডানদিকের দুটি গোলাভ সত্যিই বাঁদিকের চারটিকে ধরে রাখবে।

ব্যাপারটাকে একটা ছোটখাট অলৌকিক কাণ্ড বলে মনে হচ্ছে, তাই না? দুটো গোলাভ কি চারটেকে সমান বলে আকর্ষণ করছে! এর থেকে স্টেভিন

চিত্র 47



''অলৌকিক হলেও অলৌকিক নয়।

বলবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র স্থাপন করতে সমর্থ হন। তিনি এইভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। বড় এবং ছোট দিক দুটোর ওজন সমান নয়. একটা অন্যটার থেকে যতটা ভারী, প্রিজমের বড় কিনারাটাও ছোট কিনারাটার চেয়ে ঠিক ততটাই লম্বা। ফলে আনত তলের উপর দুটি সংযুক্ত ভার পরস্পরকে সুষম অবস্থায় রাখতে পারে যদি এই ভারদুটির প্রত্যেকে তাদের নিজেদের অবস্থিতি তলের দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক হয়।

ছোট তলটি ভূমির সমকোণে খাড়া হয়ে থাকা বলবিদ্যার একটি সুপরিচিত সূত্র লাভ করা যায়। সূত্রটি হল ঃ আনত তলের উপর একটি বস্তুকে একই স্থানে ধরে রাখতে হলে আমাদের এই তল বরাবর বস্তুটির উপর এমন একটি বল প্রয়োগ করতে হবে যা পরিমাণে বস্তুটির ভার অপেক্ষা ততটাই কম হবে, যা কিনা তলটার দৈর্ঘ্য তার উচ্চতার চেয়ে যত গুণ বেশি। সুতরাং 'অবিরাম গতি' যন্ত্র অসম্ভব এই ধারণা থেকে বলবিদ্যার জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পথ তৈরী হয়েছিল।

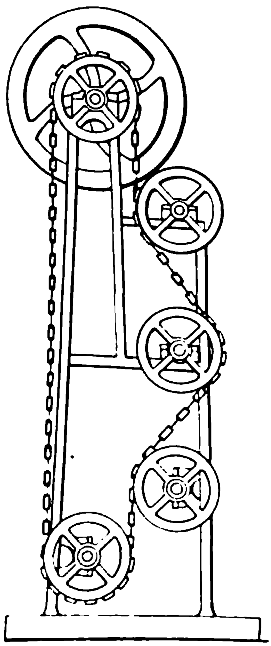
আরও 'অবিরাম গতি' যন্ত্র

48 নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে একটি ভারী শিকল কতকগুলো চাকার উপর দিয়ে এমনভাবে জড়ানো আছে যে, যে কোনো অবস্থানে ডানদিকের অংশের দৈর্ঘ্য বাঁ-দিকের তুলনায় সবসময়েই বেশি। উদ্ভাবক ভেবেছিলেন ডানদিকের অংশটা যেহেতু বাঁদিকের থেকে সবসময়েই বেশি, তাই এটা পুরো যন্ত্রটাকে সচল রাখবে। কিন্তু সত্যিই কি তা ঘটে? অবশ্যই নয়। তুমি আগেই জেনেছ যে, একটা শিকলের হালকা অংশ তখনই শুধু ভারী অংশকে ধরে রাখতে পারে, যখন তাদের আকর্ষণ-

কারী বল দুটি ভিন্ন ভিন্ন কোণে অবস্থান করে। এই বিশেষ ব্যবস্থার মধ্যে শিকলের বাঁদিকের অংশ সরাসরি নিচের দিকে ঝুলে রয়েছে, আর ডানদিকের অংশটা আছে আনত অবস্থায়। কাজেই ডানদিকটা ভারী হলেও বাঁদিকের অংশটাকে টেনে তুলতে পারবে না আর আমরাও প্রত্যাশিত 'অবিরাম গতি' অর্জন করব না।

এ অবধি যত 'অবিরাম গতি' যন্ত্র প্রদর্শিত হয়েছে তার মধ্যে ধূর্ততায় আমার মতে সেরাটি দেখানো হয়েছিল 1860 সাল নাগাদ 'প্যারিস এক্সপোজিসান-এ। এটা ছিল একটা বড় চাকা যার খোপগুলোর মধ্যে কিছু বল নড়াচড়া করত। উদ্ভাবক দাবি করেছিল, কেউই চাকাটিকে কখনো থামাতে পারবে না। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই যন্ত্রটাকে থামাবার চেষ্টা করতেন, কিন্তু হাত সরিয়ে নেওয়া মাত্র সেটা আবার ঘুরতে শুরু করত। কেউই উপলব্ধি করেন নি যে, চাকাটাকে থামাবার জন্য যে বল প্রয়োগ করা হত, ঠিক সেটাই কিন্তু ছিল ওটার ঘোরার কারণ। লোকে পিছন দিকে যে ঠেলা দিত তারই ফলে সুচতুরভাবে লুকানো একটি যন্ত্রাংশের স্প্রীং-এ দম দেওয়া হয়ে যেত।

চিত্র 48



এটা কি "অবিরাম গতি" যন্ত্র ?

পিটার দা গ্রেট যে 'অবিরাম গতি' যন্ত্র কিনতে চেয়েছিলেন

জার্মানীতে কাউন্সিলার অরফাইরয়েস (Orffyreus) নামে একজনের তৈরী একটা 'অবিরাম গতি' যন্ত্র কেনার জন্য 1715 থেকে 1722-এর মধ্যে রাশিয়ার পিটার দা গ্রেট যে পত্রালাপ চালিয়েছেন তার একটা বিরাট গোছা সংরক্ষিত আছে মহাফেজখানায়। 'স্বয়ংচালিত যন্ত্র' তৈরি করে দেশজোড়া খ্যাতির অধিকারী এই লোকটি রাজকীয় মূল্যের বিনিময়েই শুধু এটি বেচতে রাজী হয়েছিল। পিটার দা গ্রেটের গ্রন্থাগারিক শুমাখারকে (Schumacher) জার পশ্চিম ইউরোপে পাঠিয়েছিলেন দুষ্প্রাপ্য

অদ্ভুত জিনিসপত্র সংগ্রহ করতে। যন্ত্রটির দাম নিয়ে রফা করতে বলা হলে তিনি এই রিপোর্টটি পাঠান।

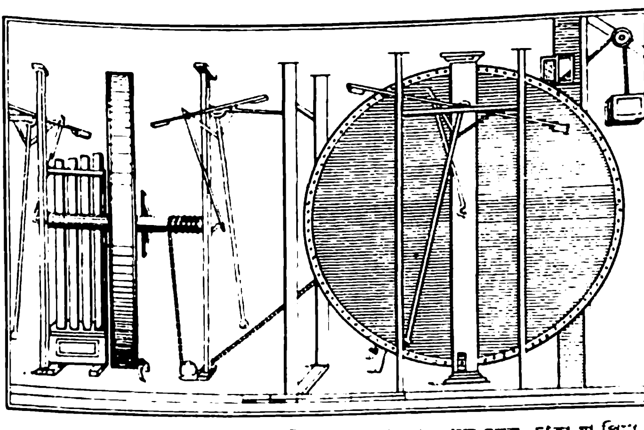
"উদ্ভাবকের শেষ কথা হল: এক লক্ষ থেলার্স দিন, যন্ত্র নিয়ে যান।"

আর স্বয়ং যন্ত্রটি সম্বন্ধে, শুমাখার জানিয়েছেন, উদ্ভাবক দাবি করেছিলেন যে, এটা কোনো ধাপ্পা নয় এবং লোকে এর দুর্নাম "একমাত্র বিদ্বেষবশতই রটাতে পারে। সারা পৃথিবী এমন হিংসুটে লোকে ভরে গেছে যাদের কথা কেউ বিশ্বাস করে না।"

1725-র জানুয়ারিতে পিটার দা গ্রেট স্থির করেছিলেন জার্মানীতে গিয়ে নিজে এই কুখ্যাত 'অবিরাম গতি' যন্ত্রটাকে দেখবেন। কিন্তু বাসনা সফল হবার আগেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

এই রহস্যময় কাউন্সিলার অরফাইরয়েস কে ছিলেন এবং তাঁর বিখ্যাত যন্ত্রটি ঠিক কি রকম ছিল? স্বয়ং কাউন্সিলার ও তাঁর যন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছুটা জানতে পেরেছি।

49 নং ছবি



অরফাইরয়েসের আপনা থেকে চলন্ত চাকা যা পিটার দা গ্রেট কিনতে চেয়েছিলেন। (পুরনো চিত্র থেকে)।

অরফাইরয়েসের আসল নাম বেস্লার। 1680 খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে তাঁর জন্ম। 'অবিরাম গতি' যন্ত্র নিয়ে মাথা ঘামানো শুরু করার আগে তিনি ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসাবিদ্যা ও চিত্রবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এমন একটা যন্ত্র উদ্ভাবন করার জন্য যে হাজার হাজার লোক চেষ্টা করেছেন, তাদের মধ্যে

ইনিই হয়তো সবচেয়ে বিখ্যাত এবং আর কিছু না হোক সবচেয়ে ভাগ্যবান তো নিশ্চয়ই। এই বিচিত্র যন্ত্র প্রদর্শন করে যা আয় করেছিলেন তাতে তিনি 1745-এ মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে কাটিয়েছেন।

49 নং চিত্রটা একটা পুরনো বই থেকে নেওয়া। 1714 সালে দেখান অরফাইরয়েসের এই যন্ত্রে একটা বিরাট চাকা দেখা যাচ্ছে। আপাত দৃষ্টিতে চাকাটা শুধু যে আপনা হতে ঘুরত তা-ই নয়, ভারী জিনিসকে বেশ কিছুটা উঁচুতেও টেনে তুলতে পারত বলেই মনে হয়।

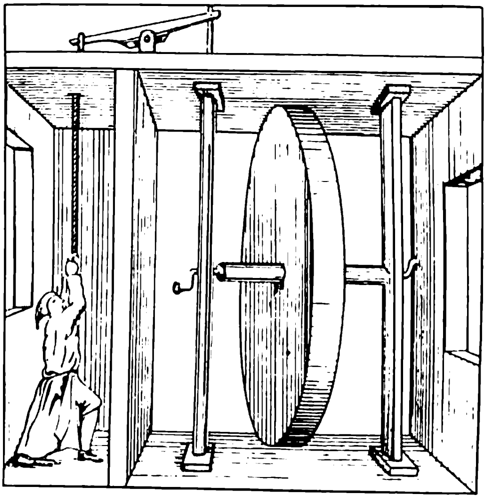
জ্ঞানী কাউন্সিলার এই 'অলৌকিক' যন্ত্রটিকে প্রথম দিকে বিভিন্ন বাজারের মেলায় দেখান। তারপর খুব দ্রুত তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে সারা জার্মানীতে। কিছুদিনের মধ্যেই অরফাইরয়েস কিছু শক্তিমান পৃষ্ঠপোষক লাভ করেন। পোল্যাণ্ডের রাজা উৎসাহ দেখান এবং তারপরে হেস্সে-ক্যাসেলের লাণ্ডগ্রেভ উদ্ভাবককে উৎসাহিত করেন, নিজের প্রাসাদটি তাঁকে ব্যবহার করতে দেন ও যন্ত্রটিকে নিয়ে যত ভাবে সম্ভব পরীক্ষা চালানো শুরু হয়ে যায়।

1717-এর 12 নভেম্বর যন্ত্রটিকে একটি আলাদা ঘরে রেখে চালিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ঘরটিতে তালা বন্ধ করে সীল মেরে দরজার সামনে দু'জন পাহারাদার মোতায়েন করা হয়। পুরো দু' সপ্তাহ, 26 নভেম্বর সীল ভাঙার আগে অবধি কেউ ধারে-কাছেও ঘেষার সাহস পায়নি। তারপর দরজা খুলে লার্ডগ্রেভ ও তাঁর অনুচররা প্রবেশ করলেন। চাকাটা তখনও ঘুরছে এবং "তার গতি কমেনি"। চাকাটাকে থামিয়ে, সতর্কভাবে পরীক্ষা করে আবার চালিয়ে দেওয়া হল। এবার ঘরটায় তালা ঝুলিয়ে সীল মেরে একটানা চল্লিশ দিন বন্ধ রাখা হয়। আগের মতোই দরজায় মোতায়েন ছিল পাহারাদার। 1718-র 4 জানুয়ারি সীল ভাঙা হয়। এক দল বিশেষজ্ঞ ঘরে ঢুকে দেখলেন চাকাটা তখনো ঘুরছে। তবু সন্তুষ্ট হন নি লাণ্ডগ্রেভ। তৃতীয়বার পরীক্ষার ব্যবস্থা করে এবার যন্ত্রটাকে নাগাড়ে দু' মাস বন্ধ করে রাখা হল। তারপরেও যন্ত্রটা চলছে দেখে অত্যন্ত খুশী হন। তিনি উদ্ভাবককে এই মর্মে একটি প্রশংসাপত্র দিলেন যে, যন্ত্রটি প্রতি মিনিটে 50 পাক খায়, 16 কেজি ভারকে 1·5 মিটার উচ্চতায় তুলতে এবং একটি পেষকযন্ত্র (grinder) ও হাপরও চালাতে পারে। এই সার্টিফিকেট পকেটস্থ করে অরফাইরয়েস ইউরোপের এ-প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চষে বেড়ান। পিটার দা গ্রেটকে তিনি 100,000 রুবলের কমে যন্ত্রটিকে বেচতে রাজী হন নি, কাজেই বোঝাই যাচ্ছে রোজগার তাঁর রাজকীয় ধরনেরই হয়েছিল।

কাউন্সিলারের এই অলৌকিক জিনিসটির খ্যাতি খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত পিটার দা গ্রেটের কানেও পৌঁছয়। অদ্ভুত ও মন ভোলানো যে কোনো সামগ্রীর প্রতি জারের একটা দুর্বলতা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তিনি

তাই এটির প্রতি আকৃষ্ট হন। 1715-য় বিদেশ ভ্রমণের সময়ে আবার এটার কথা তাঁর খেয়াল পড়ে, এবং সেই সময়েই তিনি বিখ্যাত কূটনীতিক এ. আই. অস্টার-মান্‌কে এটি পরীক্ষা করার জন্য নিযুক্ত করেন। নিজের চোখে দেখার সুযোগ না পেলেও ভদ্রলোক অবিলম্বে যন্ত্রটি সম্বন্ধে এক বিস্তারিত বিবরণ পেশ করেন। জার একথাও ভেবেছিলেন যে, প্রখ্যাত উদ্ভাবক হিসাবে অরফাইরয়েসকে আমন্ত্রণ

চিত্র 50



অরফাইরয়েসের যন্ত্রের রহস্য। (পুরনো চিত্র থেকে)

জানাবেন তাঁর দরবারে কাজ নেবার জন্য এবং তিনি এ বিষয়ে সুপরিচিত দার্শনিক ক্রিশ্চিয়ান উল্‌ফের মতামতও চেয়েছিলেন।

বৃষ্টির মতো প্রস্তাব ঝরতে শুরু করে অরফাইরয়েসের উপর। প্রত্যেকটা আগেরটার চেয়েও ভাল। রাজা রাজড়ারা দরাজ হাতে পুরস্কার দেন। তাঁর আশ্চর্য চাকার খাতিরে কবিরা কবিতা রচনা করেন। কিন্তু কিছু লোক ছিল যারা তাঁকে প্রতারক বলে মনে করতেন। অতি সাহসী সরাসরি তাঁকে অভিযুক্ত করেছিল। এমন কি কাউন্সিলারের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পারলেই 1,000 মার্কের একটা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিলেন তাঁরা। তাঁকে বিদ্রূপ করে লেখা এক কেচ্ছা-কবিতার সঙ্গের একটা ড্রয়িং তুলে দেওয়া হয়েছে 50 নং চিত্রে। চিত্রটি থেকে এই রহস্যের বেশ সহজ একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। চাকাটির স্থাপনের জন্য যে থামগুলো ছিল তারই আড়ালে রাখা চাকার অক্ষের একাংশের

উপর দড়ি জড়ানো রয়েছে আর সুনিপুণভাবে লুকিয়ে রাখা একটি লোক এই দড়ি টেনে চাকাটাকে ঘোরাচ্ছে।

ঘটনাচক্রে কাউন্সিলারের সঙ্গে স্ত্রী ও ভৃত্যের সামান্য মনোমালিন্য ঘটায় কৌশলটি প্রকাশ হয়ে যায়। এই দু'জন রহস্যটা জানত। না হলে আজও হয়তো আমাদের আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তে হত। এই ঘটনার পর জানা গেল কুখ্যাত যন্ত্রটি সত্যিই একজন গুপ্ত মানুষকে দিয়ে চালান হত। অরফাইরয়েসের ভাই বা ভৃত্যা সরু দড়িটা ধরে টান দিত। তবু চুনকালি পড়েনি কাউন্সিলারের মুখে। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও তিনি নাগাড়ে সবাইকে আশ্বাস দিয়ে জানিয়েছেন যে, বিদ্বেষবশত তাঁর স্ত্রী ও ভৃত্যা এই কুৎসা রটিয়েছে। যাই বলুন, তাঁর প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই জন্যই তিনি জারের প্রতিনিধি শুমাখারের মাথায় কথাটা গেঁথে দেবার চেষ্টা করেছিলেন যে. মানুষ বড় হিংসুটে।

একই সময়ে জার্মানীতে আরো একজন সুপরিচিত 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের উদ্ভাবক ছিলেন। হার্টনার নামে একজন। শুমাখার তাঁর যন্ত্রটা সম্বন্ধে লিখেছেন : "ড্রেসডেনে হেয়ার হার্টনারের যে 'পারপিচুয়াম মোবাইল' দেখেছি, সেটা একটা বালি ভর্তি ত্রিপল এবং পেষণ-যন্ত্রের মত একটা যন্ত্র। এটা আপনা হতেই সামনে পিছনে চলাচল করে। যাই হোক, উদ্ভাবক বলেছেন এটাকে এর চেয়ে বড় করে তৈরি করা যাবে না।" নিঃসন্দেহে এই যন্ত্রও কখনও 'অবিরাম গতি' দিত না। বড় জোর খুব চতুরভাবে তৈরী একটা ব্যবস্থা, যার মধ্যে এই রকমই কায়দা করে লুকোনো থাকত জ্যান্ত মানুষ—'অবিরাম গতি' লাভের কোনো যন্ত্র নয়। পিটার দা গ্রেট-কে লেখবার সময় শুমাখার ঠিকই উল্লেখ করেছিলেন যে, ফরাসী ও ইংরাজ পণ্ডিতরা "গণিতের নীতির পরিপন্থী বলে এই সব 'অবিরাম গতি' যন্ত্রকে উপহাস করেন।"

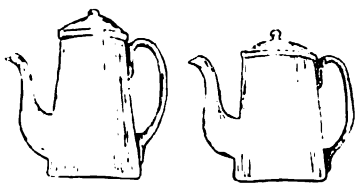
পরিচ্ছেদ ৫

তরল ও গ্যাসের ধর্ম

দুটো কফি-পট

51 নং চিত্রে সমান বেড়ের দুটো কফি-পট দেখা যাচ্ছে। একটা অবশ্য অন্যটার চেয়ে লম্বা। দুটোর মধ্যে কোনটায় বেশী তরল ধরে? না ভেবে একজন হয়ত লম্বাটাকে দেখিয়ে দিতে পারে। আমরা কিন্তু এগুলোকে শুধু নলের মুখের তল অবধি ভরতে পারব। তার চেয়ে বেশি ভেতরে ঢাললে, সেটা মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। এখন এখানে দুটো কফি-পটেরই নলের মুখ রয়েছে সমান তলে, তাই ছোটটাও লম্বাটার সমান তরল গ্রহণ করবে। কেন সেটা সহজেই বুঝতে পারবে। কফি-পট আর তার নল পরস্পর সংযুক্ত দুটি পাত্র। ফলে,

চিত্র 51



কোন পাত্রে বেশি কফি ধরবে?

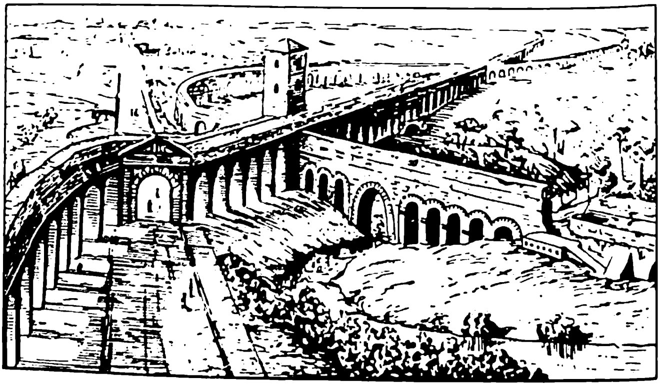
আসল কফি-পটের চেয়ে নলের মধ্যে তরলের পরিমাণ ঢের কম হলেও, দুইয়ের মধ্যেই তরল সমান তলে থাকবে। নলের মুখটা যথেষ্ট উঁচু না হলে কিছুতেই কফি-পটটাকে পুরো ভর্তি করতে পারবে না, নলটা গড়িয়ে পড়তেই থাকবে। সাধারণত কফি-পটের মাথার চেয়েও নলের মুখটা একটু উঁচুতে থাকে যাতে কাত করবার সময় কিছু চলকে না পড়ে।

প্রাচীন মানুষের অজ্ঞতা

রোমানরা বহুকাল আগে তাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি করা অ্যাকোয়াডাক্ট-গুলোর যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা আজও ব্যবহার করেন। প্রাচীনকালের রোমান ক্রীতদাসদের প্রশংসা করতে হয়—কিন্তু তাঁদের তত্ত্বাবধায়ক রোমান ইঞ্জিনীয়ারদের তা করা যায় না। পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁদের প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানটুকুও ছিল না। ম্যুনিখের জার্মান মিউজিয়ামে সংরক্ষিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি

চিত্র 52। দেখতেই পাচ্ছ জার্মানরা তাদের জল সরবরাহের ব্যবস্থাকে মাটির নিচে না বসিয়ে উঁচু উঁচু পাথরের থামের উপর দিয়ে নিয়ে গেছে। কেন? আজকাল

চিত্র 52



প্রাচীন রোমের অ্যাকোয়াডাক্ট (জলবাহিকা)।

আমরা মাটিতে পোঁতা যেরকম পাইপ ব্যবহার করি সেটাই কি সুবিধাজনক নয়? পরস্পর সংযুক্ত পাত্রে জলের আকার সম্বন্ধে কিন্তু সেকালের রোমান ইঞ্জিনীয়ারদের ধারণা ছিল খুব অস্পষ্ট। তাঁদের ভয় ছিল, খুব লম্বা একটা পাইপ দিয়ে দুটি জলাধারকে সংযুক্ত করা হলে জল বুঝি একই তল অবধি উঠবে না। তাছাড়া মাটির মধ্য দিয়ে পাতা পাইপ যদি জমির স্বাভাবিক অসমান চরিত্র অনুসরণ করে তাহলে কিছু কিছু জায়গায় জলকে উপরের দিকে বইতে হবে এবং এটা এমনই একটা ব্যাপার যেটা ঘটবে না বলেই রোমানরা ভয় পেত। সেই জন্যই সাধারণত তাদের অ্যাকোয়াডাক্টগুলোয় আগাগোড়া একটা ঢাল রাখা হত। প্রায়ই তাদের ঘুর পথে পাইপ নিয়ে যেতে হত, বা উঁচু উঁচু তোরণ নির্মাণ করতে হত। অ্যাকোয়া মার্সিয়া নামে পরিচিত একটি রোমান অ্যাকোয়াডাক্ট 100 কিমি লম্বা যদিও সংক্ষিপ্ততম পথে এর প্রান্ত বিন্দু দুটির মধ্যকার দূরত্ব মাত্র এর অর্ধেক। দেখতেই পাচ্ছ, পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র সম্বন্ধে রোমানদের অজ্ঞতার জন্য বাড়তি 50 কিমি পাথর গাঁথতে হয়েছিল।

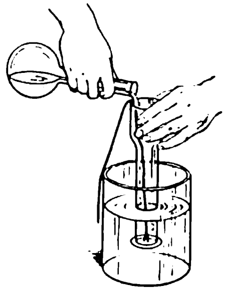
তরল পদার্থ চাপ দেয়…উপরে

যারা কখনো পদার্থবিদ্যা পড়েনি তারাও জানে, যে পাত্রে তরলকে রাখা হয় তরল নিচের দিকে সেই পাত্রের তলদেশের উপর এবং পাশের দিকে তার

দেওয়ালের উপর চাপ দেয়। অনেকেই অবশ্য কখনো সন্দেহ করেন নি যে, তরল আবার উপর দিকেও চাপ দেয়। সাধারণ একটা কাচের চিমনীর সাহায্যেই এটা বোঝা সম্ভব। চিমনীর মাথাটাকে ঢাকা দিতে পারে এই রকম আকারের একটা পুরু কার্ডবোর্ডের চাকতি কেটে নাও। চিত্র 53 অনুযায়ী কাচের চিমনীর মাথায় এটা ঢাকা দিয়ে চিমনীটাকে জলের পাত্রের মধ্যে ডুবিয়ে ধরো। চিমনীটাকে ডোবাবার সময় চাকতিটা যাতে সরে না যায় তার জন্য একটুকরো সুতো বেঁধে ধরো চিত্রের মতো করে বা স্রেফ আঙুল দিয়ে টিপে রাখো। চিমনীটাকে বেশ খানিকটা নিচে ডোবানোর পর তুমি সুতোটা ছেড়ে দিতে বা আঙুলটা সরিয়ে নিতে পারো। চাকতিটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, জলই উপর দিকে চাপ দিয়ে ঠিক জায়গায় রেখে দেবে।

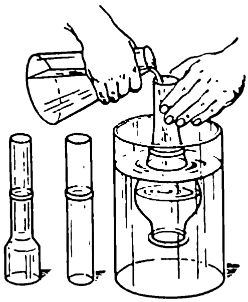
ইচ্ছে করলে তুমি এই উপরমুখী চাপের মান বার করতেও পারো। সাবধানে চিমনীর মধ্যে কিছুটা জল ঢাল। চিমনীর মধ্যে জলের তল যেই পাত্রের জলের

চিত্র 53



তরল ওপরের দিকে চাপ দেয়া দেখাবার সহজ পদ্ধতি।

চিত্র 54



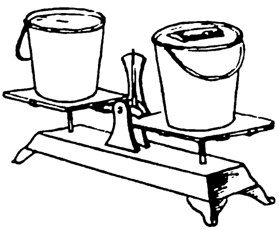
পাত্রের তলদেশে তরল যে-চাপ দেয় তা নির্ভর করে শুধু ভূমির ক্ষেত্রফল এবং তরলের উচ্চতার ওপরে। ছবিতে দেখান হয়েছে তুমি তা কিভাবে পরখ করতে পারো।

তলের সমান হবে অমনই চাকতিটা খসে পড়বে, কারণ জল তলার দিক থেকে চাকতির উপর যে-চাপ দিচ্ছে সেটাকে বাতিল করার সমান চাপ আসছে এটার উপর থেকে, চিমনীর ভেতরকার জলের কাছ থেকে, যার উচ্চতা এই চিমনীটা যত-দূর অবধি ডোবানো হয়েছে ঠিক ততটাই। তরলে নিমজ্জিত যে কোনো বস্তুর উপর তরল যে চাপ দেয় সেই সংক্রান্ত সূত্রটাই এই। প্রসঙ্গত এই চাপ থেকেই

তরলের মধ্যে সেই ওজন 'কমা'র ব্যাপারটা ঘটে—যার বর্ণনা রয়েছে আর্কিমিডিসের বিখ্যাত নীতিতে।

বিভিন্ন আকৃতির কিন্তু প্রত্যেকটারই মাথার দিকটা একই মাপের, এই ধরনের কয়েকটা চিমনী নিয়ে তুমি তরল সংক্রান্ত আরেকটা সূত্র পরীক্ষা করে দেখতে পার। সূত্রটা হল: তরল পাত্রের ভূমির উপর যে চাপ দেয় সেটা শুধু পাত্রের ভূমি ও জল 'স্তম্ভের' উচ্চতার উপর নির্ভর করে, কখনও পাত্রের আকৃতির উপর নির্ভর করে না। সূত্রটা তোমাকে এইভাবে পরীক্ষা করতে হবে। বিভিন্ন চিমনী নিয়ে সবগুলোকেই সমান গভীরতা অবধি ডুবিয়ে ধরো। যাতে ভুল না হয় সেই জন্য তলার দিক থেকে সমান উচ্চতায় প্রত্যেকটা চিমনীর গায়ে আঠা দিয়ে এক ফালি করে কাগজ আটকে দাও। যেই না সমান তল অবধি জল ঢালবে অমনই প্রথম পরীক্ষায় ব্যবহৃত কার্ডবোর্ডের চাকতিটা খসে পড়বে (চিত্র 54)। ফলে বিভিন্ন আকৃতির জলের স্তম্ভ প্রদত্ত চাপ একই থাকে, যতক্ষণ ভূমি আর উচ্চতা সমান থাকে। খেয়াল রাখো যে দৈর্ঘ্য নয়, উচ্চতাই এখানে গুরুত্বপূর্ণ,

চিত্র 55



দু'টি বালতিই কানায় কানায় ভর্তি। একটির মধ্যে কাঠের একটা টুকরো আছে। কোনটা বেশি ভারী ?

কারণ একটি দীর্ঘ কিন্তু আনত স্তম্ভ যা চাপ দেয় তারই সমান চাপ দেয় এর চেয়ে বেঁটে কিন্তু আনত স্তম্ভটার সমান উচ্চতার একটি স্তম্ভ। বলাই বাহুল্য যে, ধরে নিচ্ছি দুটি স্তম্ভেরই ভূমি সমান।

কোনটা বেশি ভারী ?

তুলার এক পাল্লার উপরে কানায়-কানায় ভর্তি একটা বালতি বসিয়ে দাও। তারপর, অন্য পাল্লাটার উপরেও আরেকটা বালতি বসাও। এটাও কানায়-কানায় ভর্তি, তবে তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ ভাসছে (চিত্র 55)। দুটোর মধ্যে কোনটা ভারী? বিভিন্ন লোককে এই প্রশ্ন করে পরস্পর বিরোধী উত্তর পেয়েছি। কেউ বলেছে কাঠের টুকরো সমেত বালতিটা বেশি ভারী হবে, কারণ জল ছাড়াও এর মধ্যে একটুকরো কাঠ রয়েছে। অন্যেরা বলেছে, কাঠ ছাড়া বালতিটা বেশি ভারী হবে কারণ, কাঠের চেয়ে জলের ওজন সাধারণত বেশি হয়। কোনো উত্তরটাই

ঠিক নয়। দুটো বালতিরই সমান ওজন। এটা সত্যি যে দ্বিতীয় বালতিতে প্রথমটার চেয়ে কম জল আছে, কারণ কাঠ কিছু পরিমাণ জলকে অপসারিত করেছে। কিন্তু এই সংক্রান্ত সূত্র অনুযায়ী ভাসমান প্রতিটি বস্তু তার নিমজ্জিত অংশের দ্বারা যে পরিমাণ তরল অপসারিত করে তার ওজন ঐ ভাসমান বস্তুর ওজনের সমান। এই জন্যই তুলা থাকবে সুষম অবস্থায়।

এবার আরেকটি সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করো। এক গ্লাস জল নিয়ে তুলার একটি পাল্লায় বসিয়ে তার পাশে একটা ওজন রাখো। এবার পাল্লাদুটোকে সুষম অবস্থায় আনো। তারপরে গ্লাসের পাশে রাখা ওজনটাকে গ্লাসের মধ্যে ফেলে দাও। এবার পাল্লাদুটোর অবস্থা কি হবে? আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে পাল্লার উপর থাকার সময় যা ওজন ছিল, জলের ভিতরে তার ওজন কম হবে।

ফলে এই পাল্লাটার কি উপরে ওঠা উচিত নয়? পাল্লাটা কিন্তু সুষম অবস্থাই বজায় রাখে। কেন? গেলাসে ফেলার পর ওজনটা কিছু পরিমাণ জলকে অপসারিত করবে এবং সেই অপসারিত জল আগের চেয়ে বেশি উচ্চতায় ঠেলে উঠবে। এর ফলে পাত্রের ভূমিতে অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয় বলেই জলে ডোবানো বস্তুর হারানো ওজনের সমান অতিরিক্ত বল ফিরে আসে।

তরলের স্বাভাবিক আকৃতি

তরলের নিজস্ব কোনো আকৃতি নেই বলেই ভাবতে অভ্যস্ত আমরা। এটা সত্যি নয়।

যে কোনো তরলের স্বাভাবিক আকৃতি গোলকের মতো। তবে অভিকর্ষের জন্যই তারা এই আকার গ্রহণ করতে পারে না। পাত্র থেকে উপচে পড়ার পর তরল একটি পাতলা স্তরের মতো ছড়িয়ে পড়ে অথবা পাত্রের আকার গ্রহণ করে। কিন্তু কোনো তরল যদি সমান আপেক্ষিক গুরুত্বের দ্বিতীয় তরল দ্বারা আবৃত হয়, তাহলে আর্কিমিডিসের সূত্রানুসারে ক্রমে তরলটি ওজন 'হারায়', আপাতভাবে তার কোনো ওজন থাকে না। তখন আর তার উপর অভিকর্ষের কোনো প্রভাব না থাকায় সেটা তার স্বাভাবিক গোলকের আকৃতি গ্রহণ করে।

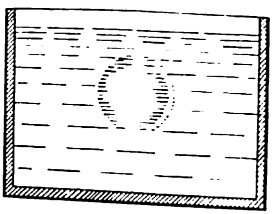
অলিভ অয়েল জলে ভাসে কিন্তু অ্যালকোহলে ডুবে যায়, তাই এই দুটিকে আমরা এমন অনুপাতে মেশাতে পারি যাতে এই মিশ্রণে তেলটা ডুববেও না, ভাসবেও না। চোখে ওষুধ দেবার ড্রপার থেকে তেলের ফোঁটা ফেললে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে। এমন একটা বড় গোলাকার ফোঁটা হিসাবে তেলটা একত্রিত হয় যা ডোবেও না, ভাসেও না, কিন্তু নির্লম্বিত হয়ে (suspended) ঝুলে থাকে (চিত্র 56)। গোলকের সত্যিকার চেহারা পেতে হলে পরীক্ষাটা একটা খাড়া দেওয়াল যুক্ত পাত্রে করতে হবে—কিংবা যে কোনো আকারের পাত্রেই

করা যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এটাকে বসাতে হবে জল-ভরা খাড়া-দেয়ালযুক্ত পাত্রের মধ্যে।

পরীক্ষাটা সতর্কভাবে ও ধৈর্য ধরে করতে হবে, না হলে একটা বড় ফোঁটার পরিবর্তে কয়েকটা ছোট ফোঁটা পাবে।

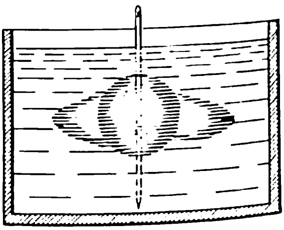
ব্যাপারটা না ঘটলেও হতাশ হয়ো না, এমনিতেই ব্যাপারটা যথেষ্ট শিক্ষাদায়ক।

চিত্র 56



লঘুকৃত অ্যালকহলের মধ্যে তেল একটা বিন্দু হিসাবে জমা হয় এবং সেটা ডোবেও না, ভেসেও ওঠে না। (প্লেটোর পরীক্ষা)

চিত্র 57



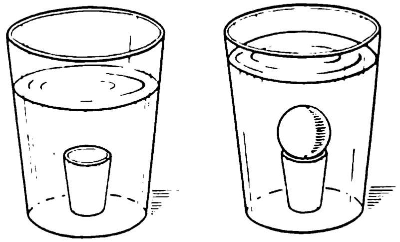
একটা রড দিয়ে অ্যালকহলের মধ্যে বিন্দুটাকে ঘোরানো হলে একটা বলয় সৃষ্টি হয়।

পরীক্ষাটা আরো কিছু দূর চালানো যাক। তেলের ফোঁটাটার মধ্যে একটা লম্বা কাঠি বা এক টুকরো তার গেঁথে দিয়ে সেটাকে ঘোরাও। আরও ভাল ফল পাবে যদি একটা ছোট কার্ডবোর্ডের চাকতিকে তেলে ভিজিয়ে নিয়ে কাঠি বা তারটার সঙ্গে জুড়ে নাও, তারপর সেটাকে তেলের ফোঁটাটার মধ্যে পুরে ঘোরানো শুরু করো। এই ঘূর্ণনের ফোঁটাটাকে সংনমিত হতে (compress) বাধ্য করবে এবং কয়েক সেকেণ্ড পরে সেটা আংটির আকার ধারণ করবে (চিত্র 57)। আংটিটা টুকরো হয়ে যাবার পরে নতুন ফোঁটা তৈরী হবে, যেগুলো কেন্দ্রের ফোঁটাটাকে ঘিরে ঘুরতে থাকবে।

বেলজিয়ান পদার্থবিদ প্লেটো প্রথম এই শিক্ষামূলক পরীক্ষাটা করেছিলেন। তার যথাযথ বর্ণনা তো আমি তোমাদের দিয়েইছি। আরো সহজে আরেকভাবে এই পরীক্ষাটা করা যায়, তাতেও একই শিক্ষা লাভ হয়। একটা ছোট গ্লাস নিয়ে ভালভাবে ধুয়ে তাতে অলিভ অয়েল ঢেলে ভর্তি করো। এটাকে একটা বড় গ্লাসের নিচে বসিয়ে দাও। তারপর ছোট গেলাসটা চাপা না পড়া পর্যন্ত সতর্কভাবে অ্যালকোহল ঢালতে থাকো। একটা চামচে করে অল্প অল্প জল ঢালো। খুব সাবধানে এই কাজটা করতে হবে, জলটা যাতে বড় গ্লাসের গা দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নামে। ছোট গ্লাসের মধ্যকার তেলের উপরিভাগ ফুলে

উঠতে শুরু করবে এবং যথেষ্ট জল ঢালা হয়ে গেলে, ছোট গেলাস থেকে বেশ বড়সড় একটা ফোঁটা ভেসে উঠে অ্যালকোহল আর জলের মিশ্রণে নিলম্বিত হয়ে ঝুলে থাকবে (চিত্র 58)।

চিত্র 58



সহজভাবে প্লেটোর পরীক্ষা।

অ্যালকোহল না পেলে পরিবর্তে অ্যানিলিন ব্যবহার করতে পারো। অ্যানিলিন এমন একটা তরল যা ঘরের উষ্ণতায় জলের থেকে ভারী কিন্তু 75-85° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় জলের থেকে হাল্কা। জলকে উত্তপ্ত করে আমরা ওই অ্যানিলিনকে তার মধ্যে সাঁতার কাটাতে এবং একটা বড় ফোঁটার আকার দিতে পারি। ঘরের উষ্ণতায় তুমি নুন গোলা জলে একটি অ্যানিলিন ফোঁটাকে নিলম্বিত রাখতে পারো। গাঢ় লাল রঙা তরল অর্থোটলুইডিন (orthotoluidine) দিয়েও কাজ হতে পারে। 24° সেণ্টিগ্রেডে এই তরলটির ঘনত্ব নুনজলের সমান এবং এই নুনজলের মধ্যেই তরলটিকে ঢালা হয়।

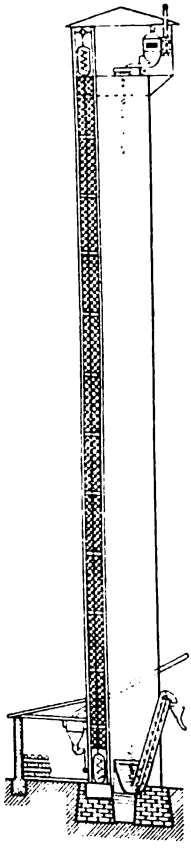
ছড়্‌রা কেন গোল হয় ?

আগেই বলেছি যে, অভিকর্ষ কাজ না করলে যে কোনো তরল তার স্বাভাবিক গোলকের আকার গ্রহণ করবে। পতনশীল বস্তু সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করেছি এরকম আরেকটা কথা এবার স্মরণ করলেই হবে। পতনশীল বস্তুর কোনো ওজন থাকে না বলেছিলাম। এবার বস্তুটির পতন শুরু হবার সময়ে যে সামান্য পরিমাণ বায়ুর প্রতিরোধ কাজ করে, সেটা যদি না ধরো তাহলে পতনশীল তরলেরও গোলকের আকার গ্রহণ করার কথা। (পতন শুরু হবার সময়েই শুধু বৃষ্টির ফোঁটার ত্বরণ ঘটে। প্রথম সেকেণ্ডের দ্বিতীয়ার্ধেই পতনের বেগ সুষম হয়ে আসে এবং ফোঁটাটির ওজনের পাল্টা বল দিতে শুরু করে বায়ুর প্রতিরোধ, যা পতনশীল ফোঁটার বেগের সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধি পায়)।

সত্যিই তাই ঘটে। পড়ন্ত বৃষ্টির ফোঁটা গোলাকারই হয়। ছড়্‌রা আসলে গলিত সীসার জমাট-বাঁধা ফোঁটা মাত্র, যা তৈরি করার সময় অনেক উঁচু থেকে

ঠাণ্ডা জলের উপর ফেলে দেওয়া হয় এবং সেখানে প্রকৃত নির্ভুল গোলকের আকারে জমাট বাঁধে। ছড়্রাকে 'টাওয়ার' গ্নলিও বলা হয়, কারণ তৈরি করার সময় তাদের একটা লম্বা 'গ্নলি তৈয়ারীর টাওয়ার'-এর মাথা থেকে ফেলা হয় (চিত্র 59)। এই ধাতু নির্মিত টাওয়ারগ্নলো 45 মিটার উঁচু হয়। মাথার উপরে সীসে গলানোর জন্য বয়লার সমেত গ্নলি-ঢালাইয়ের একটা ব্যবস্থা থাকে, আর নিচের দিকে থাকে জলের আধার। তৈরী গ্নলিগ্নলোকে তারপর বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা এবং মেশিনে সাফাই করা হয়। পতনের সময়েই গলিত সীসার ফোঁটা ছড়্রা গ্নলি হিসেবে জমাট বেঁধে যায়। শ্নধ্ন পতনের ধাক্কাটা নরম করার ও গ্নলিটা যাতে তার গোলকাকার না হারায়, তার জন্যেই শ্নধ্ন জল রাখা হয়। (6 মিমি-র বেশি ব্যাসয্নক্ত, তথাকথিত ক্যানিস্টার গ্নলিগ্নলো ভিন্নভাবে তৈরী। টুকরো টুকরো করে তার কেটে নিয়ে সেগ্নলোকে তারপর বলের আকারে আবর্তিত করা (rolled) হয়।

চিত্র 59



সীসের গুলির টাওয়ার।

'ভূমিহীন' ওয়াইনগ্লাস

জল ঢেলে একটা ওয়াইনগ্লাসকে কানায় কানায় ভর্তি করো। কয়েকটা পিন নাও। এই গ্লাসের মধ্যে এদের জায়গা হতে পারে বলে কি মনে করো? চেষ্টা করেই দ্যাখো।

একে একে পিনগ্নলো ফেল আর সেই সঙ্গে গ্ননে যাও। খ্নব সাবধানে কিন্তু। মাথাটা ধরে পিনটাকে তুলে তার সর্ন দিকটা জলে ডোবাও। তারপর সতর্কভাবে কোনো ঠেলা বা চাপ না দিয়ে ছেড়ে দাও, যাতে জল উপচে না পড়ে। একে একে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পিনগ্নলো তলায় গিয়ে জমছে, কিন্তু জলের তল সেই একই জায়গায় আছে। প্রথমে দশটা ফেললে, তারপর আরও দশটা, তারপর আরও দশটা। জল উপচে পড়ছে না। গ্লাসের তলায় শ'খানেক পিন জমা না হওয়া পর্যন্ত তুমি চালিয়ে যেতে পারো। তব্ন জল উপচে পড়বে না (চিত্র 60)। তাছাড়া জল যে কিনারার উপরে লক্ষণীয়ভাবে কিছ্নটা উঠেছে তাও নয়।

আরও কিছু পিন ফ্যালো। এবার শ'য়ের হিসাবে গুনতে পারো। তুমি 400-র মতো পিন ফেললেও দেখবে তবু জল উপচে পড়ছে না। যাইহোক, এবার দেখতে পাবে জলের তলটা কিনারার উপরে ফুলে উঠেছে। এরই মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এতক্ষণকার এই দুর্বোধ্য ঘটনার উত্তর। কাচে যতক্ষণ সামান্য তৈলাক্ত পদার্থ লেগে থাকে ততক্ষণ জল সহজে কাচকে ভেজাতে পারে না, এবং

চিত্র 60



ওয়াইন-গ্লাসে পিন।

ওয়াইনগ্লাসের কিনারায় একটু-আধটু সেটা থাকেই। শুধু ওয়াইনগ্লাসেই বা বলি কেন, যে কোনো চিনেমাটি বা কাচের পাত্রই ব্যবহার করার সময় আমরা আঙুল ছোঁয়াই, আর তখন থেকেই তৈলাক্ত স্পর্শ লেগে থাকে। কিনারায় জল লাগে না বলেই পিনের দ্বারা অপসারিত জল ফুলে ওঠে। ব্যাপারটা প্রায় তোমার চোখেই পড়ে না, কিন্তু তুমি যদি একটা পিনের আয়তনের মাপ নিতে ও তার সঙ্গে ওয়াইনগ্লাসের কিনারার উপর দিয়ে ফুলে ওঠা অংশের আয়তনের তুলনা করতে তো বুঝতে যে, পূর্ববর্তী আয়তন পরবর্তীটির কয়েক শো গুণ কম। এর থেকেই বোঝা যায় কেন একটি পরিপূর্ণ ওয়াইনগ্লাসের মধ্যে তারপরেও কয়েকশো পিনের জায়গা হচ্ছে।

ওয়াইনগ্লাসের মুখটা যত প্রশস্ত হবে ততই তা আরও বেশি পিন গ্রহণ করতে পারবে, কারণ সেক্ষেত্রে ফুলে-ওঠা অংশটা হবে আরও বেশি আয়তনের। একটা মোটামুটি হিসেব থেকে বক্তব্যটা স্পষ্ট হবে। একটা পিন মোটামুটিভাবে 25 মিমি লম্বা এবং আধ মিলিমিটার পুরু হয়। সেই সুপরিচিত জ্যামিতিক ফর্মুলা $\left(\frac{\pi d^2 h}{4}\right)$-এর সাহায্যে তুমি অতি সহজেই এই সিলিন্ডারের মত পিনটির আয়তন বার করতে পার। আয়তন 5 ঘন মিমি-র সমান। মাথা সমেত পিনটার আয়তন 5·5 ঘন মিমি-র বেশি হবে না। এবার ফুলে-ওঠা অংশের জলের আয়তনের মাপ নেওয়া যাক। ওয়াইনগ্লাসের মুখের ব্যাস

9 সেমি, বা 90 মিমি। এইরকম একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল প্রায় 6,400 বর্গ মিমি। স্ফীতির উচ্চতা 1 মিমি-র বেশি নয় ধরে আমরা 6,400 ঘন মিমি আয়তন পাচ্ছি, যেটা পিনের আয়তনের 1,200 গুণ বেশি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, জল 'পূর্ণ' একটা ওয়াইনগ্লাসে হাজারেরও বেশি পিনের জায়গা হতে পারে। এবং একটু সতর্ক হলে সত্যিই আমরা একটা ওয়াইনগ্লাসে হাজারটা পিন রাখতে পারি। চোখে দেখে মনে হয় পিনগুলো যেন পুরো ওয়াইনগ্লাসটাই দখল করে নিয়েছে, এবং এমন কি তার থেকে বেরিয়েও আছে। তবু কিন্তু একটুও জল উপচে পড়ে না।

অপ্রীতিকর ধর্ম

যে কেউ একবার যদি কেরোসিন ল্যাম্প নাড়াচাড়া করে থাকে তো জানে, বাতিটা কখন যে কি অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে বসে তার ঠিক নেই। ট্যাংকে কেরোসিন ভরে তারপর ট্যাংকের বাইরেটা শুকনো করে মুছে দাও। এক ঘণ্টা পরে সেটা আবার ভিজে উঠবে। দোষটা তোমার নিজের। সম্ভবত তুমি সলতে সমেত প্যাঁচটা ভাল করে আঁটোনি এবং কাচ বেয়ে ছড়িয়ে পড়ার সময় কেরোসিন চুঁইয়ে বেরিয়ে এসেছে। এই ধরনের 'অদ্ভুত কাণ্ড' এড়াতে হলে যত পার এঁটে সলতে সমেত প্যাঁচটা লাগিও। কিন্তু এটা করার সময়ে নজর রেখ ট্যাংকটা যাতে কানায় কানায় ভর্তি না থাকে। গরম হবার সময়ে কেরোসিন আয়তনে বেশ বৃদ্ধি পায়—প্রতি 100° ডিগ্রির জন্য তার আয়তনের এক-দশমাংশ বেড়ে যায়। কাজেই ট্যাংক যাতে ফেটে না যায় তার জন্য কেরোসিনের বৃদ্ধির জন্য কিছুটা জায়গা ফাঁকা রাখা দরকার।

অনেক জাহাজের ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসেবে কেরোসিন বা তেল ব্যবহার করা হয়। কেরোসিনের এই চুঁইয়ে পড়ার ধর্ম সেসব জাহাজে অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে। যথাযথ সতর্কতা গ্রহণ না করলে, এসব জাহাজে করে কেরোসিন বা তেল ছাড়া অন্য কোনো সামগ্রী বহন করা সম্ভব নয়, কারণ দৃষ্টির অগোচরে ট্যাংকের ফাঁকফোকর থেকে যে তেল বা কেরোসিন চোঁয়ায় তা যে শুধু ট্যাংকগুলোর ধাতব আবরণের গায়েই ছড়িয়ে পড়ে তা নয়, ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র, এমন কি যাত্রীদের পোশাকেও। পোশাক থেকে এমন গন্ধ ছাড়তে থাকে যে কিছুতেই আর তা চাপা দেওয়া যায় না।

অনেক সময়েই এই অপকর্ম নিবারণের চেষ্টা করেও কোনোই ফল পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গাত্মক ব্রিটিশ কাহিনী লেখক জেরোমি কে. জেরোমি তাঁর 'থ্রি মেন ইন্ এ বোট' বইটিতে প্যারাফিন তেলের কাণ্ডকারখানার কথা লেখার সময় খুব যে একটা বাড়িয়ে কিছু বলেছেন তা নয়। প্যারাফিন তেলের সঙ্গে কেরোসিনের খুবই মিল আছে।

"চুঁইয়ে পড়ার ব্যাপারে প্যারাফিন তেলের মতো আর কিছু কখনো দেখিনি। তেলটা আমরা নৌকার সামনের মুখে রেখেছিলাম। সেখান থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে নেমে এল নৌকোর হাল অবধি, আসার পথে ভিজিয়ে দিল পুরো নৌকাটা এবং তার মধ্যকার আর যা কিছু ছিল, তারপর চুঁইয়ে নামল নদীতে, সিক্ত করল দৃশ্যাবলী, বিষিয়ে দিল আবহাওয়া। কখনও বইত পশ্চিমা তেল-গন্ধ বায়ু এবং অন্যান্য সময়ে পুব থেকে আসত সেই তেল-গন্ধ বায়ু, আবার কখনও বা উত্তুরে তেল-গন্ধ বায়ু বইত, তাছাড়া দক্ষিণ থেকেও সে তেল-গন্ধ বায়ু বইত না তা নয়। কিন্তু যেদিক থেকেই বায়ু বয়ুক, যে উত্তর মেরু অঞ্চল থেকেই আসুক, কি মরুভূমির বালুকা প্রান্তর থেকেই তার উৎপত্তি ঘটুক, আমরা কোনো তফাত্‌ই বুঝতে পেতাম না। সর্বদাই সেই প্যারাফিন তেলের সুগন্ধ।

"সেই তেল চোঁয়াতে চোঁয়াতে উপরে উঠল, সূর্যাস্তের দফারফা করল। আর যদি চন্দ্রকিরণের কথা বলা যায়, তো তাদের গা থেকেও নিশ্চিতভাবেই প্যারা-ফিনের গন্ধ ছাড়ছিল……

"মার্লোয় পেঁছে আমরা এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করলাম। ব্রিজের কাছে নৌকোটাকে ফেলে শহরের মধ্য দিয়ে হাঁটছি রেহাই পাবার আশায়। গন্ধ কিন্তু আমাদের পিছু ছাড়েনি। পুরো শহরটাই তেলে ভিজে জবজব করছে।" (প্রকৃতপক্ষে যাত্রীদের পোশাক থেকেই প্যারাফিনের গন্ধ ছাড়ছিল।)

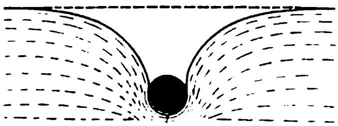
ট্যাঙ্কের বাইরের দিকটা ভিজিয়ে দেবার কেরোসিনের এই যে ধর্ম তার জন্যই লোকে ভুল করে মনে করত যে, কেরোসিন বুঝি ধাতু এবং কাচের মধ্য দিয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

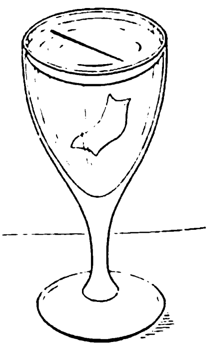
যে মুদ্রা ডোবে না

শুধু রূপকথার গল্পেই যে এমন কাণ্ড ঘটে তা নয়। কয়েকটা সহজ পরীক্ষা থেকেই জানতে পারবে যে, সত্যিই এরকম হয়। একটা ছোট জিনিস নিয়ে শুরু করো—যেমন ধরো, একটা সুচ। ইস্পাতের সুচকে জলে ভাসানো একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হয়, তাই না? কাজটা কিন্তু সত্যিই ততটা শক্ত নয়। গ্লাসে জল নিয়ে তার উপর একটা সিগারেটের কাগজ রাখ। তারপর কাগজের উপরে রাখ পুরোপুরি শুকনো একটা সুচ। এবার এইভাবে কাগজটাকে সরিয়ে নিতে হবে; আরেকটা সুচ বা পিন নাও এবং মাঝ বরাবর জায়গায় আলতো করে চাপ দিয়ে কাগজটাকে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও। কাগজের টুকরোটা জল শুষে পুরোপুরি ভিজে যাবার পর ডুবে যাবে, কিন্তু সুচটা ভাসতেই থাকবে (চিত্র 61)। গ্লাসের বাইরে থেকে জলের তলে একটা চুম্বককে নাড়িয়ে তুমি ভাসমান সুচটাকে পাক খাওয়াতেও পার।

কিছুটা অভিজ্ঞতা হলে, সিগারেটের কাগজটা আর কোনো দরকার নাও হতে পারে। এখন তোমার একমাত্র করণীয় সূচটাকে মাঝখানে ধরে তুলে নিয়ে, জলের সমান্তরাল করে সামান্য উপর থেকে ছেড়ে দেওয়া। একইভাবে, সূচের মতোই 2 মিমি-র বেশি মোটা নয় এমন কোনো পিন, হাল্কা বোতাম, বা যে কোনো ছোট ধাতব বস্তুকে তুমি জলে ভাসাতে পারো। হাত পাকার পর একটা মুদ্রা নিয়ে চেষ্টা করো।

চিত্র 61





ভাসমান সূঁচ। বাঁ দিকে: একটি সূঁচের (২ মিমি মোটা) প্রস্থচ্ছেদ এবং সেটা যে অবনমন সৃষ্টি করে (দু' গুণ বিবর্ধিত)। ডান দিকে: এক টুকরো কাগজের সাহায্যে কিভাবে সূঁচ ভাসানো যায়।

এই সব ধাতব বস্তুগুলি যে ভাসে তার কারণ হল, আমাদের হাত থেকে এদের গায়ে খুব পাতলা একটা তৈলাক্ত পদার্থের স্তরের প্রলেপ পড়ে—যার জন্য জল এই ধাতুকে ভেজাতে পারে না। এমন কি ভাসমান সূচ জলের তলের উপর যে অবনমন সৃষ্টি করে সেটা তুমি দেখতেও পাবে। প্রাথমিক অবিকৃত অবস্থাটা ফিরে পাবার তাগিদেই জলের উপরিতলটি ভাসিয়ে তোলে সূচটিকে। উপরন্তু সূচ দ্বারা অপসারিত জলের ভারের সমান একটি বলও সূচটিকে ভাসিয়ে রাখে। অবশ্য, একটা সূচকে ভাসিয়ে রাখার সহজতম উপায় হল তার গায়ে তৈলাক্ত পদার্থ মাখানো। তাহলে সেটা কিছুতেই ডুববে না।

ছাঁকনি করে জল বয়ে নিয়ে যাওয়া

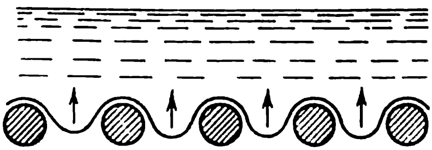
এটাও যে শুধু রূপকথার গল্পেই সম্ভব তা নয়। পদার্থবিদ্যা আমাদের এই আপাতভাবে অসম্ভবকে সম্ভব করতে সাহায্য করে। 15 সেমি চওড়া একটা তারের ছাঁকনি নাও যার ফুটোগুলোর ব্যাস 1 মিমি-র কম নয়। ছাঁকনিটাকে গলিত প্যারাফিনে ডুবিয়ে নাও, যাতে এর উপর পাতলা, প্রায় চোখেই পড়ে না এমন একটা আবরণ পড়ে।

তোমার ছাঁকনিটা এখনও ছাঁকনিই আছে। এখনও এর মধ্যে গর্ত আছে যার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে একটা পিন গলে যায়। কিন্তু এখন তুমি এটায় করে জল—এমন কি পরিমাণে বেশ কিছুটাও বইতে পারো। শুধু জল ঢালার সময় সতর্ক থেকো এবং লক্ষ্য রেখো যাতে জল ঢালার সময় ছাঁকনিটা নড়ে না যায়।

জল গলে পড়ছে না কেন? প্যারাফিনকে ভেজাতে না পারার জন্য জল একটা পাতলা স্তর তৈরি করে যেটা ছাঁকনির গর্ত দিয়ে স্ফীত হয়ে ওঠে। এই স্তরটাই জলকে পড়তে দেয় না (চিত্র 62)।

এই ছাঁকনিটাকে জলে ভাসানো অবধি যায়, তার মানে তুমি যে শুধু ছাঁকনি

চিত্র 62



ছাঁকনি কেন জল বয়।

করে জল বয়ে নিয়ে যেতে পারো তাই নয়, এটাকে নৌকা হিসাবেই ব্যবহার করতে পারো।

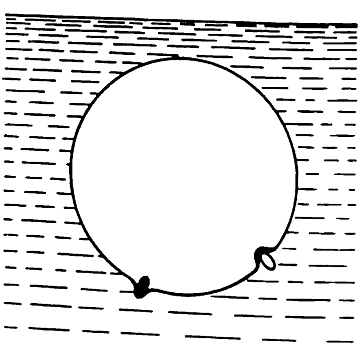
আপাতভাবে এই কূট পরীক্ষা বেশ কিছু সাধারণ ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে, যেগুলোর সঙ্গে আমরা অত্যন্ত পরিচিত বলেই কেন এমনটা হয় তা ভাবি না। পিপে ও নৌকায় আলকাতরা লাগানো, কর্ক ও স্টপারে (কাচের ছিপিতে) চর্বি মাখিয়ে তৈলাক্ত করা, ছাতের উপর তেল রঙ মাখানো, এবং সাধারণভাবে সমস্ত কিছুই যার গায়ে আমরা জল লাগতে দিতে চাই না, তার উপর তৈলাক্ত পদার্থের প্রলেপ কিংবা কাপড়ের উপর রবারের আস্তরণ দেওয়া অবধি সবই এই সদ্য বিবৃত ছাঁকনি তৈরি করারই সামিল। শুধু তফাত এইটাই যে, ছাঁকনির ব্যাপারটাকে রীতিমতো অস্বাভাবিক মনে হয়।

ইঞ্জিনীয়ারদের সাহায্য করে ফেনা

খনিবিদ্যায় আকরিককে 'সমৃদ্ধতর' করার জন্য ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে ইস্পাতের সুচ বা তামার মুদ্রা ভাসানোর কিছু সাদৃশ্য আছে। 'সমৃদ্ধতর' করা মানে আকরিকের অন্তর্বর্তী ধাতুর পরিমাণ বৃদ্ধি করা। ইঞ্জিনীয়াররা আকরিক থেকে অবাঞ্ছিত বস্তু দূর করার অনেক রকম পদ্ধতি জানেন, কিন্তু তার মধ্যে আমরা যেটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি, যাকে 'ভাসিয়ে তোলা' (ফ্লোটেশন) বলা হয়, সেইটাই সেরা পদ্ধতি। অন্য সব পদ্ধতি ব্যর্থ হলেও এটা কাজে লাগে।

'ভাসিয়ে তোলা'র ব্যাপারটা এই রকম। সূক্ষ্মভাবে গুঁড়ো করা আকরিককে জল ও তৈলাক্ত পদার্থ ভরা পাত্রে ঢালা হয়। তৈলাক্ত পদার্থ পাতলা স্তরের মতো ঘিরে ধরে ধাতব কণাগুলোকে। জল এই স্তরকে ভেজাতে পারে না। তারপর ঐ তরলে চাপ দিয়ে বাতাস ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যাতে অজস্র ক্ষুদ্র বুদবুদের সম্মিলনে ফেনা সৃষ্টি হয়। তৈলাক্ত ধাতব কণাগুলো হাওয়ার বুদবুদের সঙ্গে নিজেদের চিটিয়ে ফেলে এবং বুদবুদের সঙ্গে উপরে উঠে আসে। আকাশে ওড়ার বেলুনও ঠিক এইভাবেই তার সঙ্গে বাঁধা ঝুড়িখানাকে টেনে তোলে (চিত্র 63)। খনিজের যেসব অপ্রয়োজনীয় কণায় তৈলাক্ত পদার্থের আস্তরণ নেই সেগুলো নিজেদের বাতাসের বুদবুদের সঙ্গে চিটাতে না পারার ফলে ডুবে যায়। লক্ষ্য করো, ফেনার মধ্যকার বাতাসের বুদবুদের আকার তারা যে কণাগুলোকে বহন করছে তার চেয়ে অনেক বড় এবং কঠিন কণাগুলোকে তারা উপরে টেনে তুলতে সক্ষম হয়। ফলত, ধাতুর প্রায় সব কণাগুলোই উপর দিকে ফেনার মধ্যে ভেসে ওঠে। এই ফেনাটাকে তখন আরও পরিশ্রুত করার জন্য ছেঁকে নেওয়া হয়। সেই সময়ে এই তথাকথিত সমৃদ্ধতর খনিজকে পৃথক করা হয়।

চিত্র 63



"ভাসিয়ে তোলার" মূল কথা।

এই সমৃদ্ধতর খনিজে খনিজের প্রাথমিক অবস্থার চেয়ে ধাতুর পরিমাণ বেশ কয়েক ডজন গুণ বেশি হয়। 'ভাসিয়ে তোলা' প্রযুক্তির এত উন্নতি ঘটেছে যে, বিচারকের নির্বাচনে সুবিচারের পরিচয় দিতে পারলে যে কোনো ক্ষেত্রেই আকর-মল থেকে ধাতুটিকে পৃথক করা সম্ভব।

প্রসঙ্গত, এই 'ভাসিয়ে তোলা' পদ্ধতির আবিষ্কারের জন্য ধন্যবাদ দিতে হবে হঠাৎ ঘটে যাওয়া একটা দুর্ঘটনাকে, কোনো তত্ত্বকে নয়। গত শতাব্দীর শেষের দিকে কেরী এভারসন নামে একজন আমেরিকান স্কুল-শিক্ষিকা কপার পাইরাইট রাখা হয়েছিল এরকম একটা তৈলাক্ত থলে ধুচ্ছিলেন। তাঁর চোখে পড়ে যায় যে,

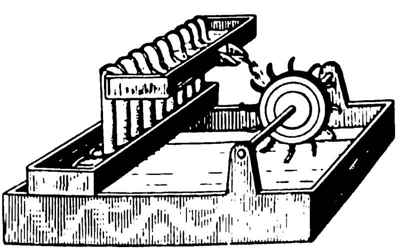
থলের মধ্যে পড়ে থাকা পাইরাইটের গুঁড়োগুলো সাবানের ফেনার সঙ্গে ভাসছে। এর থেকেই 'ভাসিয়ে তোলা' পদ্ধতির সূত্রপাত।

লোক ঠকানো 'অবিরাম গতি' যন্ত্র

কখনো কখনো দেখবে নিম্নোক্ত অদ্ভুত যন্ত্রটিকে (চিত্র 64) সত্যিকার 'অবিরাম গতি' যন্ত্র বলে চালানো হচ্ছে। এখানে তেল (অথবা জল) ঢালা হয় একটা পাত্রে। প্রথমে কতকগুলো সলতে সেই তেলকে শোষণ করে নিয়ে যায় উপরের আরেকটা পাত্রে এবং তারপর আরো কিছু সলতে তেলকে আরো উঁচুতে রাখা একটা পাত্রের মধ্যে নিয়ে যায়। একেবারে উপরের পাত্রটার একটা খাঁজকাটা নির্গমপথ আছে, যার মধ্য দিয়ে তেল বেরিয়ে এসে প্যাডেল লাগানো চাকার উপর এসে পড়ে ও সেটাকে ঘোরাতে থাকে। সলতেগুলো আবার নিচের পাত্র থেকে তেল শুষে উপরের পাত্রে তুলে নিয়ে যায়। সুতরাং মনে হবার কথা যে, প্যাডেল লাগানো চাকার উপর তেল পড়া চলতেই থাকবে, আর চাকাটাও ঘুরেই চলবে।

যারা এই যন্ত্রটার বিবরণ দিয়েছিল, নিজেরা যদি কষ্ট করে এটা তৈরি করত তো বুঝতে পারত যে, এক বিন্দু তেলও কখনও উপরের পাত্রে পেঁছিত না, চাকা ঘোরা তো দূরের কথা। অবশ্য এ-কথা বোঝার জন্য আমাদের যে এই

চিত্র 64



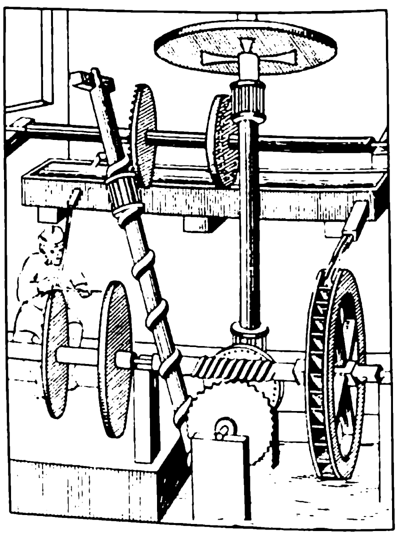
অস্তিত্বহীন "অবিরাম গতি" যন্ত্র।

যন্ত্রটা তৈরি করতেই হবে তেমন কোনো প্রয়োজন নেই। সত্যি বলতে উদ্ভাবক এ কথা ভাবলেনই বা কি করে যে, সলতের ওই উপর দিকের বাঁকা অংশটার মধ্য দিয়ে তেল প্রবাহিত হবে? এটা সত্যি বটে যে, অভিকর্ষকে অতিক্রম করে কৈশিক বল (capillary forces) তেলকে সলতে দিয়ে উপরের দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু এই একই বল আবার বাধা দেয় যাতে ভিজে সলতের ক্ষুদ্র ছিদ্র থেকে তেল চুঁইয়ে না পড়ে। এখনকার মতো না হয় ধরে নিচ্ছি যে, কৈশিক

বলের দরুন তেল এই লোক-ঠকানো 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের উপরকার পাত্রে উঠবে। তবু আমাদের একথা কিন্তু মানতেই হবে, যে সলতেগুলো তেলকে উপরে তুলছে বলে দাবি করা হচ্ছে, সেই সলতেগুলোই আবার তেলকে নামিয়ে আনবে তলার পাত্রে।

এই মাত্র যে যন্ত্রটার কথা উল্লেখ করলাম, সেটার সঙ্গে আরেকটা জল-চালিত যন্ত্রের মিল আছে, যেটা বহুকাল আগে 1575 সালে উদ্ভাবন করেছিলেন ইতালীয়ান যন্ত্রবিদ স্ট্রাডা (জ্যেষ্ঠ)। 65 নং চিত্রে এই মজার কলটা দেখতে

চিত্র 65



জাঁতার পাথর ঘোরাবার জন্য জল-চালিত "অবিরাম গতি" যন্ত্রের একটি প্রাচীন নক্সা।

পাচ্ছ। যন্ত্রটা ঘুরতে শুরু করলে একটা আর্কিমিডিসের স্ক্রু উপরকার ট্যাংকে জল তোলে। সেখান থেকে একটা ছিদ্রমুখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসে একটা প্যাডেলের উপরে এসে আঘাত করে। প্যাডেলগুলো যে জল তোলা চাকাটার সঙ্গে যুক্ত সেটাকে চিত্রের নিচে ডানদিকের কোণে দেখা যাচ্ছে। এই চাকাটা একটা শান-দেওয়ার চাকা ও সেই সঙ্গে কয়েকটা গীয়ার মারফত আর্কিমিডিসের ওই স্ক্রুটাকেও ঘোরায়, যেটা উপরের ট্যাংকে জল তোলে। এরকম যন্ত্র যদি সম্ভব হত, তাহলে সবচেয়ে সহজ হত একটা কপিকলের উপর দিয়ে একটা দড়ি ঝুলিয়ে তার দুই প্রান্তে দুটো সমান ওজন ঝুলিয়ে দেওয়া। একটা ওজন নেমে আসার

সময়ে অন্যটাকে টেনে তুলবে, আবার সেটা যখন তার পালা আসবে টেনে তুলবে প্রথমটাকে। সেটা কি একটা ভারী সুন্দর 'অবিরাম গতি' যন্ত্র হবে না?

সাবানের বুদবুদ ফুঁকা

কি করে সাবানের বুদবুদ ফুঁকতে হয় জানো? যতটা সোজা মনে হয় তা নয় কিন্তু। আমিও ভাবতাম এর মধ্যে তেমন বিশেষ কিছু নেই। তারপর দেখলাম ফুঁ দিয়ে বড় বড় সুন্দর বুদবুদ বানানোর ব্যাপারটাও এক ধরনের শিল্প, যার জন্য কিছু অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু সাবানের বুদবুদ বানানোর মতো আপাত দৃষ্টিতে অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কোনো মানে হয়? সাধারণ মানুষের আবার এ ব্যাপারে মত কিন্তু ভাল নয়। পদার্থবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কিন্তু ভিন্ন। বিখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ কেলভিন বলেছিলেন, "একটা বুদবুদ বানাও এবং সেটাকে পর্যবেক্ষণ করো। সারা জীবন ধরেও তুমি এটাকে নিয়ে গবেষণা করতে এবং পদার্থবিদ্যার একের পর এক নানা বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো।"

সত্যিই এই ক্ষুদ্রতম সাবানের বুদবুদের গায়ে রঙ বদলের ইন্দ্রজাল থেকে পদার্থবিদ আলোক তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের হদিশ লাভ করেন। ওদিকে এই সূক্ষ্মতম ঝিল্লীর টান পর্যবেক্ষণ তাঁকে বিভিন্ন কণার মধ্যকার বলের পারস্পরিক ক্রিয়া নির্দেশক সূত্র নির্ধারণে সাহায্য করে। এগুলো হল সেই সংসক্তির (cohesion) স্বসম বল, যার অনুপস্থিতিতে পৃথিবীটা শুধু সূক্ষ্মতম ধুলোর মেঘে পরিণত হত।

অবশ্য অতটা উচ্চাশা নিয়ে নিম্ন বর্ণিত পরীক্ষাগুলোর বিবরণ দেওয়া হয়নি। এগুলো শুধু শিক্ষামূলক আনন্দ দিতে ও কিভাবে সাবানের বুদবুদ ফোলাতে হয় তা শেখাবার জন্য। এই সব বুদবুদ নিয়ে অনেক রকম পরীক্ষা করার কথা বিশদে বর্ণনা করেছেন ব্রিটিশ পদার্থবিদ চার্লস বয়েস্ তাঁর 'সাবানের বুদবুদ ও যেসব বল তাদের গঠন করে' নামে বইটিতে। এ ব্যাপারে তোমরা যদি উৎসাহী হও তো এই চমৎকার বইটি দেখতে পার।

তার মধ্য থেকে সব চেয়ে সহজ কয়েকটি পরীক্ষার কথা জানতে পারবে এখানে। সাধারণ কাপড় কাচার সাবান হলেই চলবে—এ কাজে গায়ে মাখার সাবানের উপযোগিতা কম। কিন্তু বিশুদ্ধ অলিভ তেল বা আলমণ্ড তেলের সাবানও ব্যবহার করতে পার। বড় বড় সুন্দর বুদবুদ পাবার জন্য এই দুটি সাবান সবচেয়ে ভাল। সাবধানে সাবানের একটা টুকরো পরিষ্কার ঠাণ্ডা জলে গুলে নাও। সাবান জল বেশ ঘন হওয়া দরকার। বৃষ্টির পরিষ্কার জল বা বরফ গলা জল সবচেয়ে ভাল, কিন্তু তার বদলে ফোটানো জলকে ঠাণ্ডা করে নিয়েও ব্যবহার করতে পার। বুদবুদের আয়ু বাড়ানোর জন্য প্লেটোর পরামর্শ

হচ্ছে, প্রতি তিন ভাগ সাবান জলের সঙ্গে এক ভাগ গ্লিসারিন মেশানো। সাবান জলের উপর থেকে ফেনা ও ছোট ছোট বুদবুদগুলো চামচ দিয়ে টেনে সরিয়ে দাও। তারপর জলটার মধ্যে একটা সরু মাটির নল ডুবিয়ে দাও। নলটার মুখের ভেতরে ও বাইরে আগে থেকেই সাবান মাখিয়ে রাখতে হবে। 10 সেমি লম্বা খড়ের কাঠি বা স্ট্র ব্যবহার করলেও ভাল ফল পাওয়া যাবে। ক্রস চিহ্নের মতো করে তাদের নিচের দিকটা ছিঁড়ে রাখতে হবে।

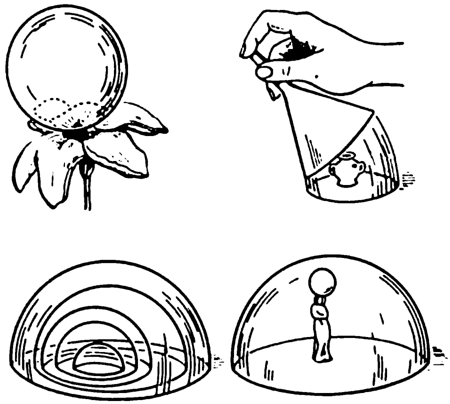
এইভাবে বুদবুদ ফুঁকতে হবে। নলটাকে খাড়াভাবে জলের মধ্যে ডুবিয়ে দাও যাতে তার গায়ে সাবান জলের সর লাগে। এবার অন্য প্রান্তে আস্তে করে ফুঁ দাও। আমাদের ফুসফুস থেকে উষ্ণ বাতাস এসে বুদবুদকে ভরিয়ে তুলবে। এই বাতাস ঘরের বাতাসের চেয়ে হালকা, তাই মোটামুটি 10 সেমি চওড়া একটা বুদবুদ ফোলাতে পারলেই সেটা উপরে ভেসে উঠবে। না হলে যতক্ষণ না তুমি এই মাপের বুদবুদ ফোলাতে পারছ তোমাকে আরও সাবান যোগ করতে হবে। শুধু এইটুকুই যথেষ্ট নয়, তোমাকে আরেকটা পরীক্ষা করতে হবে। বুদবুদটা ফোলাবার পর সাবান জলে তোমার আঙুলটাকে ভিজিয়ে নিয়ে চেপে ধরে বুদবুদটাকে ভেতরে ঢোকাবার চেষ্টা করো। বুদবুদটা যদি ফেটে না যায় তাহলে পরীক্ষা শুরু করতে পারো। যদি ফেটে যায়—আরেকটু সাবান গুলে নাও। আস্তে আস্তে, সাবধানে পরীক্ষা করতে হবে, তাড়াহুড়া করা চলবে না। ঘরে ভাল মতো আলো থাকা দরকার, না হলে বুদবুদের গায়ে যথাযথ রঙের খেলা দেখা যাবে না। এবার কয়েকটা মজার পরীক্ষার কথা বলি।

(1) বুদবুদের মধ্যে ফুল। একটা প্লেট বা থালার উপরে তিন মিলিমিটার পুরু করে সাবানের জল ঢাল। এবার মাঝখানে একটা ফুল বা ফুলদানি রেখে তার উপর একটা কাচের ফানেল চাপা দাও। আস্তে আস্তে ফানেলটাকে তুলতে তুলতে তার সরু মুখটা দিয়ে ফুঁ দাও যাতে সাবানের বুদবুদ তৈরী হয়। বুদবুদটা বেশ বড় হলে চিত্র 66-র মতো করে ফানেলটাকে কাত করে বুদবুদটাকে আলাদা করে দাও। তোমার ফুল বা ফুলদানিটা থাকবে একটা স্বচ্ছ, অর্ধবৃত্তাকার রামধনুর মতো রঙীন সাবানের বুদবুদের ভিতরে। ফুলের বদলে তুমি একটা ছোট মূর্তি নিতে পার এবং তার উপরে চিত্র 66-র মতো বুদবুদ বসিয়ে দিতে পার। ছোট বুদবুদটা পাবার জন্য মূর্তিটার মাথার উপর একটু সাবান জল ছড়িয়ে নাও বড় বুদবুদটা ফোলাবার আগেই। তারপর একটা নল দিয়ে তৈরী হয়ে যাওয়া বড় বুদবুদটাকে ফুটো করে ভেতরের ছোট বুদবুদটাকে ফুলিয়ে দাও।

(2) বুদবুদের ঘরবাড়ি (চিত্র 66)। আগের পরীক্ষায় ব্যবহৃত ফানেলটা দিয়ে আগের বারের মতোই একটা বড় বুদবুদ ফোলাও। এবার একটা

স্ট্র নাও। শুধু তার ফুঁ দেবার প্রান্তটুকু বাদে সমস্তটাকে ডুবিয়ে দাও সাবান জলে। এবার আলতোভাবে প্রথম বুদবুদের দেওয়াল ছেঁদা করে স্ট্র-টাকে

চিত্র 66



সাবানের বুদবুদ

মাঝখান অবধি ঢুকিয়ে দাও। তারপর আস্তে আস্তে পিছন দিকে টানতে থাকো স্ট্র-টা, কিন্তু বাইরে বার করে না এনেই প্রথম বুদবুদের মধ্যে দ্বিতীয় বুদবুদটা ফোলাও। এরই পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দ্বিতীয় বুদবুদের মধ্যে তৃতীয়, তৃতীয়ের মধ্যে চতুর্থ ইত্যাদি পেতে পারো।

(3) বেলনাকার বুদবুদ (চিত্র 67)। এর জন্য তোমার দুটো তারের বলয় দরকার। এর একটার মধ্যে সাধারণ একটা গোল বুদবুদ ফোলাও। এটা হচ্ছে নিচেরটা। এবার দ্বিতীয় বলয়টাকে সাবান জলে ভিজিয়ে বুদবুদটার উপরে সেটে ধরো। এবার বলয়টাকে উঁচু করতে থাকো যতক্ষণ না বুদবুদটা বেলনাকার চেহারা নিচ্ছে। লক্ষ্য করো যে, উপরের বলয়টাকে তুমি যদি বলয়ের পরিধির চেয়ে বেশি উঁচুতে তোলো তাহলে বেলনের অর্ধেকটা সংকুচিত হয়ে যাবে এবং অপর অর্ধেক অংশ ফুলতে ফুলতে শেষে দু ভাগ হয়ে যাবে।

সাবানের বুদবুদের সরটা সর্বদাই টানা অবস্থায় থাকে এবং ভেতরের বাতাসের উপর চাপ দেয়। ফানেলের সরু মুখটাকে মোমবাতির শিখার দিকে ধরলে দেখতে পাবে এই অত্যন্ত পাতলা সরটার ক্ষমতা যত কম মনে হয় তা কিন্তু নয়—শিখাটা বেশ নজরে পড়ার মতোই কেঁপে ওঠে (চিত্র 68)।

গরম ঘর থেকে একটা ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে বুদবুদের ভেসে যাওয়া দেখতে বেশ আকর্ষণীয় লাগে। আকারে বেশ সংকুচিতও হয়ে যায়। বিপরীতটা ঘটে ঠাণ্ডা ঘর থেকে গরম ঘরে নিয়ে আসার সময়। স্বাভাবিকভাবেই এটা নির্ভর করে

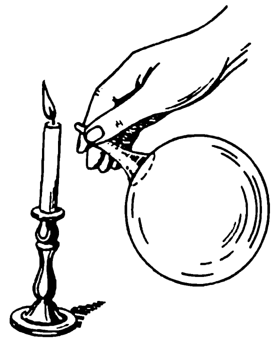
ভেতরকার বাতাসের সংকোচন ও প্রসারণের উপর। তুমি যদি শূন্যের 15° সেণ্টিগ্রেড নিচে 1,000 ঘন সেমি আয়তনের একটা বুদবুদ ফুলিয়ে সেটাকে শূন্যের 15° সেণ্টিগ্রেড উপরকার উষ্ণতা বিশিষ্ট একটা ঘরে নিয়ে আস তাহলে সেটা মোটামুটিভাবে আয়তনে 110 ঘন সেমি $(1,000 \times 30 \times \frac{1}{273})$ বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র 67



কিভাবে বেলনাকার সাবানে বুদবুদ তৈরী করতে হয়।

চিত্র 68



সাবানের বুদবুদের গায়ের চাপে নির্গত হওয়ায় মোমবাতির শিখা কাঁপে।

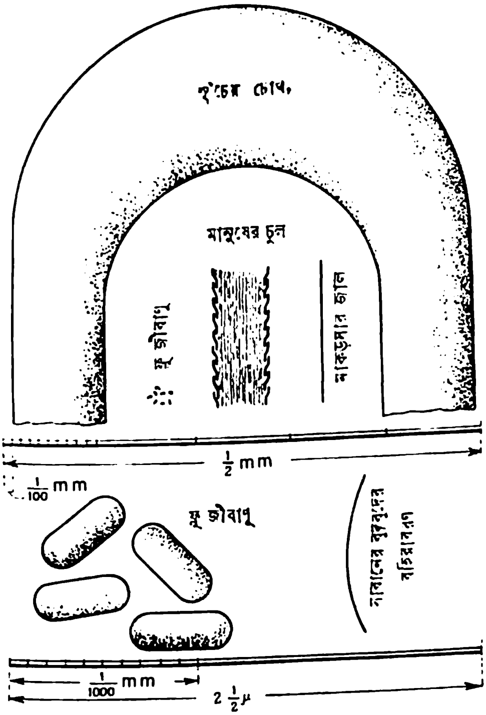
একথা বলা দরকার যে, সাবানের বুদবুদের আয়ু যতটা কম বলে ভাবা হয় সবসময়ে তা নয়। ঠিক মতো যত্ন নিয়ে নাড়াচাড়া করা হলে সেটাকে দশ দিনের মতো রাখা যায়, তার বেশীও অসম্ভব নয়। বাতাসের তরলীকরণ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য যিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন সেই ব্রিটিশ পদার্থবিদ ডিওয়ার বিশেষভাবে তৈরী বোতলের মধ্যে সাবানের বুদবুদকে পুরে রাখতেন যাতে ধুলো, শুষ্কতা ও আঘাত থেকে তাদের রক্ষা করা যায়। এইভাবে কিছু বুদবুদকে তিনি একমাস বা তারও বেশি সময় ধরে টিকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। আমেরিকার লরেন্স বেলজারের তলায় বছরের পর বছর ধরে বুদবুদ চাপা দিয়ে রেখেছিলেন।

সব চেয়ে পাতলা

খুব কম লোকেই বোধহয় জানে যে, খালি চোখে দেখা যায় এরকম সবচেয়ে পাতলা জিনিসগুলোর মধ্যে একটা হল সাবানের বুদবুদের সর। সাধারণত একটা জিনিস কতখানি পাতলা বোঝাবার জন্য আমরা যেসব উপমা দিই, সেগুলো সাবানের বুদবুদের সরের তুলনায় অতি নগণ্য। 'চুলের মতো পাতলা' বা

'সিগারেটের কাগজের মতো পাতলা' একটা জিনিস কিন্তু সাবানের বুদবুদের দেওয়ালের তুলনায় খুবই মোটা। সাবানের বুদবুদের দেওয়াল চুল বা সিগারেটের কাগজের চেয়ে 5,000 গুণ পাতলা। মানুষের চুলকে 200 গুণ বিবর্ধিত করলে

চিত্র 69



ওপরে: ছুঁচের চোখ, মানুষের চুল, জীবাণু এবং মাকড়সার জালের দু'শ গুণ বিবর্ধিত রূপ। নীচে: 40,000 গুণ বিবর্ধিত সাবানের বুদবুদের দেওয়াল এবং জীবাণু।

এক সেন্টিমিটারের মতো মোটা হয়। আর আমরা যদি সাবানের বুদবুদের দেওয়ালের প্রস্থচ্ছেদকে সম পরিমাণ বিবর্ধিত করি, তবুও সেটাকে চোখে দেখতে পাব না। এটাকে আরও 200 গুণ বিবর্ধিত করলে তবে একটি সরু রেখা হয়ত চোখে পড়বে। ততক্ষণে, 40,000 গুণ বিবর্ধিত একটা চুল দু' মিটারের চেয়েও মোটা হবে। চিত্র 69 থেকে এটা খুব ভালভাবে বোঝা যাবে।

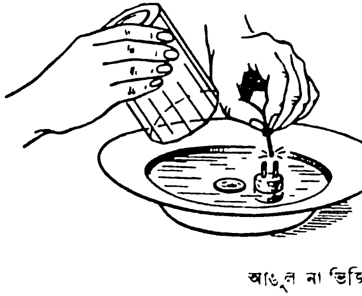
আঙুল না ভিজিয়েই

একটা বড় প্লেট নিয়ে তার উপরে একটা পয়সা রাখো। তারপর এমনভাবে জল ঢালো যাতে পয়সাটি ঢাকা পড়ে। তোমার অতিথিদের বলো, জলে আঙুল না ঠেকিয়েই পয়সাটা তুলতে হবে। অসম্ভব মনে হচ্ছে, তাই নয় ?

একটা গেলাস এবং কিছুটা কাগজের সাহায্য নিয়ে সমস্যাটার কিন্তু খুব সহজেই সমাধান করা যায়। এক ফালি কাগজ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নাও। তারপর জ্বলন্ত অবস্থাতেই সেটাকে গেলাসের মধ্যে ভরে দাও। এবার গেলাসটার তলার দিকটা উপরে করে তাড়াতাড়ি প্লেটের উপর পয়সাটার পাশে উপুড় করে রাখো। কাগজের আগুন নিবে যাবে, গেলাসের ভেতরটা সাদা ধোঁয়ার রাশিতে ভরে উঠবে আর প্লেটের সব জলটাই গেলাসের ভেতরে এসে ঢুকবে। জানা কথা পয়সাটা যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থাকবে। দু' এক মিনিট বাদে পয়সার গা থেকে জল শুকিয়ে গেলে আঙুল না ভিজিয়েই তুমি ওটাকে তুলে নিতে পারো।

জলটাকে কে গেলাসের মধ্যে শুষে নিল এবং একটা বিশেষ উচ্চতায় আটকে রাখল ? বায়ুমণ্ডলের চাপ। জ্বলন্ত কাগজটা গেলাসের ভেতরকার হাওয়াকে গরম করে তার চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল, তাই তার কিছুটা অংশ ঠেলে বেরিয়ে যায়। কাগজটা নিভে যাওয়ার পর হাওয়া আবার ঠাণ্ডা হয়, তার চাপ কমে আসে। গেলাসের বাইরে বাতাসের চাপ প্লেটের জলকে ঠেলে দিয়ে গেলাসের মধ্যে পাঠায়। কাগজের বদলে চিত্র 70-এর মতো তুমি ছিপির মধ্যে গোঁজা দেশলাই কাঠিও ব্যবহার করতে পার।

চিত্র 70



আঙুল না ভিজিয়ে কিভাবে পয়সাটা তুলতে হবে।

খুব পুরনো এই পরীক্ষাটার একটা ভুল ব্যাখ্যা চালু আছে (আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বাসিন্দা বাইজান্টিয়ামের পদার্থবিদ ফিলো প্রথম এই পরীক্ষার বিবরণ ও প্রকৃত ব্যাখ্যা পেশ করেছিলেন)। অনেকে বলে, "অক্সিজেন পুড়ে শেষ হয়ে যায়" বলেই গেলাসের মধ্যে জল ঢোকে এবং সেই জন্যই গেলাসের

মধ্যে গ্যাসটির পরিমাণ কমে যায়। এটা সম্পূর্ণ ভুল। গেলাসের মধ্যে জল ঢোকার কারণটি হল বাতাসের উত্তপ্ত হয়ে ওঠা। জ্বলন্ত কাগজ অক্সিজেনকে শুষে নিয়েছে—এটা কোনো কারণই নয়। এই বিবৃতিকে তুমি নিম্নোক্ত পরীক্ষা মারফত যাচাইও করে নিতে পারো। গরম জল ঢেলে গেলাসটাকে গরম করে নাও, তাহলে আর জ্বলন্ত কাগজের দরকার হবে হবে না। এবার কাগজের বদলে তুমি যদি অ্যালকোহলে ভেজানো এক টুকরো তুলো নাও, সেটা অনেকক্ষণ বেশি জ্বলবে এবং বাতাসকে আরও ভালভাবে উত্তপ্ত করবে। তাই জল গেলাসের প্রায় মাঝ অবধি উঠে আসবে। মনে রেখো, অক্সিজেন আয়তনে বাতাসের পাঁচ ভাগের এক ভাগ মাত্র দখল করে আছে। সবার শেষে, এটাও মনে রেখো যে, তথাকথিত অক্সিজেনের পরিবর্তে এখানে কার্বনডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পেই ঘটনাটির সঙ্গে জড়িত। প্রথমোক্তটি জলে দ্রবীভূত হলেও, বাষ্প কিন্তু থেকেই যাচ্ছে অক্সিজেনের কিছু অংশ সরিয়ে দিয়ে।

আমরা কিভাবে পান করি

এটাও কি একটা সমস্যা হতে পারে? তাও পারে। পান করার সময় ওটাকে আমরা একটা গেলাস বা চামচে করে ঠোঁটের সামনে তুলে ধরে তার থেকে তরলটাকে শুষে নিই। আমাদের এই অত্যন্ত পরিচিত সহজ ব্যাপারটাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে। সত্যিই তো, তরল আমাদের মুখের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় কেন? কে তাকে এটা করতে বাধ্য করায়? পান করার সময়ে আমাদের বুকের ছাতি প্রসারিত হয়, ফলে মুখের মধ্যে বাতাসের লঘুভবন ঘটে। বাইরের বাতাসের চাপ তরলটাকে ঠেলে দেয় সেই জায়গায় যেখানে চাপ কম। এইভাবেই সেটা আমাদের মুখে প্রবেশ করে। পরস্পর সংযুক্ত পাত্রের মধ্যেও তরল ঠিক একই রকম আচরণ করবে যদি পাত্রগুলির কোনো একটির তরলের উপরের বাতাসের চাপকে আমরা কমিয়ে দিতে পারি। বায়ুমণ্ডলের চাপ তখন এই বিশেষ পাত্রের তরলকে উপরে ঠেলে উঠতে বাধ্য করাবে। তুমি যদি তোমার ঠোঁট দিয়ে একটা জলের বোতলের মুখকে পুরোপুরি ঘিরে ধরো তাহলে আর জল শুষে নিতে পারবে না, কারণ তোমার মুখে বাতাসের আর জলের উপরে বাতাসের চাপ সমান থাকবে। কাজেই নির্ভুলভাবে বলতে গেলে আমরা শুধু মুখ দিয়েই নয়, ছাতি দিয়েও পান করি—কেন না, এই ছাতির প্রসারণই তরলকে আমাদের মুখের মধ্যে ঠেলে পাঠায়।

আরো ভাল ধরনের ফানেল

ফানেলের মধ্য দিয়ে যারা বোতলের মধ্যে তরল পদার্থ ঢেলেছে, তারা জানে থেকে থেকে ফানেলটাকে একটু উঁচু করে ধরতে হয়, না হলে তরল পড়তে চায় না।

এটা ঘটার কারণ হল, বোতলের ভেতরকার বাতাস বেরোবার পথ পায় না বলে ফানেলের মধ্যে তরলকে আটকে রাখে। তখন তরলের দু' চার ফোঁটা চুঁইয়ে পড়ে মাত্র, আর তার ফলে তরলের চাপে বোতলের হাওয়া সামান্য সংকুচিত হয়। অবশ্য এই আটকে পড়া বাতাসই নিজস্ব চাপে ফানেলের মধ্যকার তরলের ভারকে ঠেকাবার পক্ষে যথেষ্ট। ফানেলটাকে উঁচু করে ধরে আমরা বেশি চাপ-ওয়ালা সংকুচিত বাতাসকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিই। তখন আবার তরলের প্রবাহ শুরু হয়। কাজেই আরও ভাল ধরনের ফানেল তৈরি করতে হলে তার সরু হয়ে আসা অংশটাকে বাইরের দিকে কিছু খাঁজ রাখা দরকার যাতে ফানেলটা বোতলের মুখে এঁটে বসতে না পারে।

এক টন কাঠ আর এক টন লোহা

কোনটা বেশি ভারী—এক টন কাঠ, না এক টন লোহা? খেয়াল না করেই কেউ কেউ বলে ফেলে—এক টন লোহা বেশি ভারী। সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে ওঠে। কেউ যদি বলত যে, এক টন কাঠ বেশি ভারী, তাহলে প্রশ্নকারী হয়তো আরও জোরে হেসে উঠত। এটা একেবারেই অসম্ভব মনে হলেও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে সত্যিই কিন্তু তাই।

কথাটা হল, আর্কিমিডিসের সূত্র শুধু তরলে নয়, গ্যাসের ক্ষেত্রেও খাটে। বাতাসের মধ্যে প্রত্যেকটি বস্তু অপসারিত বায়ুর সমান ওজনের ওজন 'হারায়'। কাঠ ও লোহাও তাদের ওজনের কিছুটা হারায়। তাদের প্রকৃত ওজন পেতে হলে তাই এই ঘাটতিটুকু যোগ করতে হবে। ফলত, আমাদের এখানে কাঠের প্রকৃত ওজন হচ্ছে এক টন আর কাঠ দ্বারা অপসারিত বায়ুর ওজনের সমষ্টি। লোহারও প্রকৃত ওজন হল এক টন ও লোহা দ্বারা অপসারিত বায়ুর ওজনের সমষ্টি। এক টন কাঠ কিন্তু অনেক বেশি জায়গা জুড়ে থাকে—এক টন লোহার চেয়ে প্রায় 15 গুণ বেশি। কাজেই বায়ুতে ওজন করা এক টন কাঠের প্রকৃত ওজন এক টন লোহার চেয়ে বেশি। কিংবা বলা ভাল, বাতাসে উভয়েরই এক টন ওজন হয় এমন পরিমাণ কাঠ ও লোহার মধ্যে, প্রকৃতপক্ষে কাঠের ওজনই বেশি।

এক টন লোহা $\frac{1}{8}$ ঘন মিটার ও এক টন কাঠ 2 ঘন মিটার আয়তন দখল করে, তাই এদের দ্বারা অপসারিত বায়ুর ওজনের পার্থক্য হওয়া উচিত প্রায় 2·5 কেজি। প্রকৃত পক্ষে এক টন কাঠ ওজনে এক টন লোহার চেয়ে ঠিক এই পরিমাণই ভারী হয়।

যে লোকটার কোনো ওজন ছিল না

শুধু বাচ্চারাই নয়, বড়রাও অনেকেই পালকের মতো হালকা হওয়ার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখে বাতাসের চেয়েও হালকা হয়ে গেছে, অভিকর্ষের শিকল ভেঙে

আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, জনপ্রিয় ধারণা যাই হোক, পালক আসলে কিন্তু বাতাসের চেয়ে কয়েক শত গুণ বেশি ভারী। পালক যে বাতাসে ভেসে বেড়ায় তার কারণ হল, এদের 'ডানার বিস্তৃতি' বেশ বড়সড়—ওজনের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে বায়ুমণ্ডলের প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে পারে। স্বপ্ন দেখার সময়ে সকলেই ভুলে যায় যে, বাতাসের চেয়ে ভারী বলেই মানুষ স্বচ্ছন্দে হেঁটে-চলে বেড়াতে পারে।

টরিসেলি একবার বলেছিলেন, "আমরা একটা বাতাসের সমুদ্রের অতলে বাস করি।" হঠাৎ যদি আমরা হাজার গুণ হালকা হয়ে যেতাম, বাতাসের চেয়েও হালকা, তাহলে নিঃসন্দেহে এই বাতাসের সমুদ্রের মাথায় ভেসে উঠতাম। মাইলের পর মাইল উপরে উঠে শেষ পর্যন্ত এমন এক অঞ্চলে পৌঁছতাম যেখানে হালকা বাতাসের ঘনত্ব আমাদের দেহের ঘনত্বের সমান হত। পাহাড় এবং উপত্যকার উপর অবাধে ভেসে বেড়ানোর স্বপ্ন তাহলে ভেঙে যেত। অভিকর্ষের থেকে রেহাই পেয়েও আমরা অন্যান্য শক্তির, বায়ুপ্রবাহের মত শক্তির কবলে পড়তাম।

এইচ. জি. ওয়েলস্ একটা গল্পে একজন মোটা লোকের কথা বলেছেন, যে তার ওজন কমাতে চেয়েছিল। যার মুখ দিয়ে গল্পটা বলা হয়েছে, তাঁর সন্ধানে ছিল অদ্ভুত একটা ওষুধের অনুপান। এটা খেয়ে মানুষ তার অতিরিক্ত ওজন কমাতে পারত। অনুপান অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করে মোটা লোকটা সেটা খেয়ে নিল। তারপরে যা ঘটল, সে কথাই বলছি।

" অনেকক্ষণ কেটে গেল, দরজা আর খোলে না।

" চাবি ঘোরার শব্দ পেলাম। তারপর পাইক্র্যাফ্টের গলা, 'ভেতরে এসো।'

" হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললাম। স্বাভাবিকভাবেই পাইক্র্যাফ্টকে দেখতে পাব আশা করেছিলাম।

" কিন্তু, ব্যাপারটা হচ্ছে, সে ওখানে ছিল না!

" জীবনে কখনও এমন চমক খাইনি। তার বসার ঘরের এ কী নোংরা, বিশৃঙ্খল অবস্থা—বই ও লেখার জিনিসপত্রের মধ্যে প্লেট ডিশ। কয়েকটা চেয়ার উল্টে পড়ে আছে, কিন্তু পাইক্র্যাফ্ট—

" 'ঠিক আছে হে, দরজাটা আগে বন্ধ করো', বলতেই এতক্ষণে আমি তাকে আবিষ্কার করলাম।

" দরজার পাশের কোণে ঠিক কার্নিশের কাছ থেকে ও ঝুলছে, কেউ যেন তাকে ছাতের সঙ্গে আঠা দিয়ে আটকে রেখেছে। মুখের চেহারায় রাগ ও অশান্তি প্রকাশ পাচ্ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাত নেড়ে বলল, 'দরজাটা বন্ধ করো! ওই মহিলা যদি ঢুকে পড়ে—'

" দরজা বন্ধ করে, ওর কাছ থেকে কিছুটা সরে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম।

" 'কোনো একটা কিছু খুলে গিয়ে যদি খসে পড়ো তাহলে পাইক্র্যাফ্‌ট, তোমার ঘাড়টি কিন্তু ভাঙবে—', আমি বললাম।

" 'সেটা হলে তো বাঁচতাম।' ঝাঁঝিয়ে উঠল পাইক্র্যাফ্‌ট।

" 'তোমার এই বয়সে এবং ওই ওজন নিয়ে এই রকম ছেলেমানুষি খেলা জোড়া—'

চিত্র 71



"দেখলাম তিনি একেবারে ওপরে কর্নিশের কাছে"।

" 'থাক থাক।' সে বলল, যন্ত্রণাকাতর চেহারা নিয়ে।

" 'সব বলব তোমায়।' অঙ্গ-ভঙ্গি করে বলল পাইক্র্যাফ্‌ট।

" 'শয়তানের দোহাই, তুমি ওখানে আটকে রয়েছ কি করে?' আমি বললাম।

" বলার পরেই আচমকা বুঝতে পারলাম, সে মোটেই আটকে নেই। স্রেফ ওই উপর দিকে ভাসছে—একটা গ্যাস-ভরা বেলুন হলেও ঠিক ওইখানে একই

ভাবেই ভাসত। পাইক্র্যাফ্‌ট নিজেকে ছাদ থেকে ঠেলে সরিয়ে এনে দেওয়াল থামছে আমার কাছে নেমে আসার চেষ্টা শুরু করল। '—বুঝলে তোমার সেই চোদ্দ-গুষ্টির দাওয়াইটা—বলে হাঁপিয়ে উঠল।'

"কথা বলতে বলতেই অসতর্কভাবে সে একটা বাঁধানো ছবিকে আকড়ে ধরেছিল। ছবিটা দাঁড় ছিঁড়ে সোফার উপরে আছড়ে পড়ল আর পাইক্র্যাফ্‌ট আবারও উঠে গেল ছাতের কাছে। দমাস করে ধাক্কা খেল। এখন বুঝতে পারছি কেন ওর শরীরের ঠেলে বেড়োনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কিনারা আর খাঁজ-ভাজ-গুলোতে সাদা দাগ লেগে রয়েছে। সে আবার আরও সতর্কভাবে নামার চেষ্টা শুরু করল এবং ফায়ার প্লেসের উপরের খাঁজগুলো বেয়ে নেমে এল।

"সত্যিই এ দৃশ্য ভারী অস্বাভাবিক—বিরাট মোটা তড়কা রোগীর মতো চেহারার একটা লোক মাথা নিচের দিকে করে ঝুলতে ঝুলতে ছাত থেকে মেঝের উপর নামার চেষ্টা করছে। সে বলল, 'সেই যে দাওয়াইটা—বড্ড বেশি ফল দিয়েছে।'

" 'কি রকম ?'

" 'ওজন কমেছে—প্রায় সবটাই।'

" এবার আর আমার বুঝতে কিছু বাকী নেই।

" 'হায় ভগবান, পাইক্র্যাফ্‌ট, এখন বুঝতে পারছি—তুমি চর্বিমুক্ত হতে চেয়েছিল। কিন্তু সেকথা তো বলনি—তুমি সবসময়েই ওজনের কথা বলতে।'

'সে যে জন্যই হোক এতে আমি খুব খুশীই হয়েছিলাম। এখনকার মতো পাইক্র্যাফ্‌টকে আমার ভালই লাগছে। 'তোমায় বরং সাহায্য করি !' বলে তাকে হাত ধরে টেনে নিচে নামালাম। কোনো একটা জিনিসের উপর ভর রাখার জন্য এলোমেলো পা ছুঁড়ছে। ব্যাপারটা অনেকটা জোরালো হাওয়ার মধ্যে একটা পতাকা ধরে রাখার মতো।

" 'ওই যে টেবিলটা—', সে আঙুল তুলে দেখাল, 'ওটা একেবারে নিরেট মেহগনীর এবং খুব ভারীও বটে, তুমি যদি আমায় ওটার তলায় ঢুকিয়ে দাও।'

"তাই রাখলাম ওকে। টেবিলের নিচে বন্দী বেলুনের মতো দুলছিল পাইক্র্যাফ্‌ট আর আমি তার কার্পেটের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম।

" 'খুব বুঝতে পারছি একটা কাজ তোমার কখনই করা উচিত নয়।' আমি বললাম, 'তুমি যদি ঘরের বাইরে পা দাও তো ক্রমেই উপরে, আরও উপরে উঠতে শুরু করবে···,

"আমি তাকে এই নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেবার পরামর্শ দিলাম। তারপর উঠল সেই কথাটা, পুরো ব্যাপারটার মধ্যে যেটা সবচেয়ে

বিচক্ষণীয়। আমি অভিমত দিলাম, হাত দিয়ে ছাতের উপর দিয়ে হাঁটতে শেখার জন্য তার তেমন কোনো অসুবিধাই হবে না—

" 'আমি ঘুমোতে পারছি না।' পাইক্র্যাফট বলল।

" তাতেও তেমন কোনো ঝঞ্ঝাট নেই, সেটাও সম্ভব—আমি বুঝিয়ে বললাম। একটা কম্বল, চাদর আর ওয়্যারকে ফিতেয় ঝুলিয়ে তারের গদির তলায় আটকে একটা ব্যবস্থা করে নিলেই হল। এর জন্য ওকে ওর পরিচারিকার উপর আস্থা রাখতেই হবে। এটুকু গাইগুঁই করে সে রাজী হয়ে গেল। (পরে দেখে ভারী আনন্দ হয়েছিল যে, এইসব অদ্ভুত উল্টোপাল্টা কাণ্ডগুলোকে ভদ্রমহিলা অত্যন্ত সাদামাটাভাবেই গ্রহণ করেছিলেন)। ঘরের মধ্যে তাকে একটা লাইব্রেরীর মইও রাখতে হবে। খাবারদাবার সবই বইয়ের তাকের উপরেই রেখে দেওয়া হবে। আমরা একটা অভিনব পন্থাও বার করলাম, যার সাহায্যে যখনই দরকার সে মেঝের উপর নেমে আসতে পারে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, ব্রিটিশ এনসাইক্লোপিডিয়ার (দশম সংস্করণ) খণ্ডগুলো বইয়ের তাকের উপরের খোলা জায়গাটায় রেখে দেওয়া। এর কয়েকটা বই হাতে তুলে নিলেই সে সোজা নেমে আসবে। আমরা আরও স্থির করলাম যে, কিছু লোহার আংটা লাগিয়ে রাখতে হবে ঘরের মেঝের কাছে দেওয়ালের গায়ে, যাতে নিচের দিকে কিছু দরকার হলে সে এগুলো ধরে ধরে এগোতে পারে..... (তারপরে, বুঝলেন কিনা, আমার মারাত্মক বুদ্ধি আমাকেই হার মানাল।) আমি তখন ওর ঘরের ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে ওরই হুইস্কি খাচ্ছি এবং পাইক্র্যাফট রয়েছে ছাতে কার্নিশের কাছে তার প্রিয় জায়গাটিতে। ছাদের সঙ্গে একটা টার্কিশ কার্পেট আঁটতে ব্যস্ত। এমন সময় বুদ্ধিটা এল। 'হায় ভগবান, পাইক্র্যাফট শুনছ, এসব কিছুরই কোনো দরকার নেই।'

"আমার ভাবনাটার সম্পূর্ণ ফলাফল সম্বন্ধে হিসেবনিকেশ না করেই দুম করে বলে বসলাম, 'সীসের অন্তর্বাস'। অমনই যা ক্ষতি হবার হয়ে গেল।

"বুদ্ধিটা পাইক্র্যাফট প্রায় সজল চক্ষে গ্রহণ করল। 'আবার আগের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ানো—' সে বলল।

"আমার অবস্থা কি হবে না বুঝেই আমি তার কাছে রহস্যভেদ করে দিলাম।' 'সীসের পাত কেনো।' 'সেগুলো পিটিয়ে চাকতির মতো করে নাও। তার মধ্য থেকে যতগুলো দরকার অন্তর্বাসের সঙ্গে সেলাই করে নাও। সীসের শুকতলা দেওয়া জুতো পরো. নিরেট সীসে ভর্তি একটা ব্যাগ বয়ে বেড়াও—ব্যাস্‌ তাহলেই তো হবে! এখানে আর বন্দী হয়ে বাস করতে হবে না, আবার বাইরে বেরোতে পারবে তুমি, বেড়াতে ইচ্ছে হলে—'

"আরও মধুর একটা চিন্তা মাথায় এল। তোমার আর কখনও জাহাজ-ডুবির ভয় থাকবে না। তখন তুমি শুধু তোমার পোশাকের অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ পোশাক ছেড়ে ফেলে প্রয়োজন মতো মালপত্র হাতে তুলে নেবে, তারপরেই ভেসে যাবে আকাশে—"

প্রথম নজরে মনে হয় গল্পের এইসব কথা বুঝি পদার্থবিদ্যার সূত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু আপত্তির কারণও আছে।

প্রথমত, পাইক্র্যাফ্‌ট যদি তার ওজন হারিয়েও ফেলত তবু সে আদৌ উপরে উঠত না। আর্কিমিডিসের সূত্র মনে করো। পাইক্র্যাফ্‌টের পোশাক ও তার পকেটের যাবতীয় জিনিসের ওজন যদি তার মোটা শরীর দ্বারা অপসারিত বাতাসের ওজনের থেকে কম হত, তবেই সে পারত ছাদের কাছে 'ভেসে' যেতে।

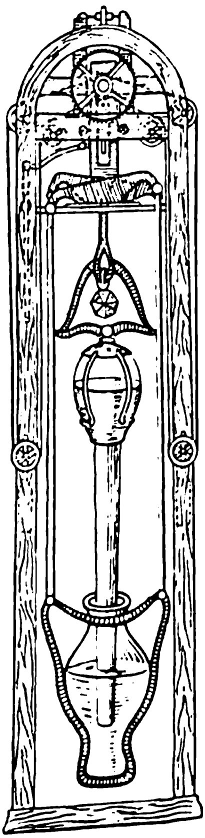
আমরা সহজেই এই পরিমাণ বাতাসের ওজন বার করতে পারি। আমাদের ওজন প্রায় সম পরিমাণ জলের ওজনের সমান—মোটামুটি 60 কেজি। বাতাসের সাধারণ ঘনত্ব জলের চেয়ে 770 ভাগ কম। কাজেই আমাদের দ্বারা অপসারিত বাতাসের ওজন হবে মাত্র 80 গ্রাম। পাইক্র্যাফ্‌ট যতই মোটা হোক 100 কেজির খুব বেশি ওজন হতে পারে না, ফলে, সে 130 গ্রামের বেশি বাতাস অপসারণ করতে পারেনি। কোনো সন্দেহ নেই যে, পাইক্র্যাফ্‌টের সুট, জুতো, ঘড়ি, মানিব্যাগ এবং অন্যান্য জিনিসের ওজন এর চেয়ে বেশি ছিল। সেক্ষেত্রে মোটা লোকটার মেঝের উপরেই থাকার কথা। এটা সত্যি যে, সে কিঞ্চিৎ হালকা বোধ করত, কিন্তু তা বলে কখনই বেলুনের মতো ছাদে উড়ে যেত না। সেটা সম্ভব হত যদি সে একেবারে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় থাকত। পরনে পোশাক থাকলে তার অবস্থা হত বেলুনের সঙ্গে বাঁধা মানুষের মতো। একটু চেষ্টা করলে, ছোট্ট একটা লাফ মারলেই উপরে ভেসে উঠবে এবং আবার ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসবে, অবশ্য যদি হাওয়া না থাকে তবেই।

'অবিরাম' ঘড়ি

তোমরা ইতিমধ্যেই 'অবিরাম গতি' যন্ত্র ও তাদের আবিষ্কার করার চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থতা সম্বন্ধে কিছু কিছু কথা জানতে পেরেছ। এবার তোমাদের এমন একটা যন্ত্রের কথা বলব আমি যার নাম দিয়েছি, 'শক্তি-উপহার' যন্ত্র, কারণ মানুষের হস্তক্ষেপ বিনাই প্রকৃতিতে বিরাজমান শক্তির অফুরন্ত উৎস থেকে এটি তার চালিকা শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে অবিরাম চলতে থাকে। সম্ভবত প্রত্যেকেই হয় পারদ বা অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটার দেখেছ। প্রথমটিতে বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারদ ওঠানামা করে। অ্যানিরয়েড ব্যারোমিটারেরও কাঁটা নড়ার কারণ ওই বায়ুমণ্ডলের চাপ।

এই ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক উদ্ভাবক একটি আপনা হতে দম-দেওয়া ঘড়ি তৈরি করেছিলেন যা কখনই থামবে না। প্রখ্যাত ব্রিটিশ যন্ত্রবিদ ও জ্যোতির্বিদ জেমস ফার্গুসন 1774 সালে এটি দেখেছিলেন। তিনি এইভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। "আমি এই ঘড়িটি দেখেছি." "এটা চলতে শুরু করলে আর থামে না। অদ্ভুতভাবে বসানো একটা ব্যারোমিটারের পারদের অবিরাম ওঠানামা থেকেই ঘড়িটাকে চালানো হয়। এ কথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, ঘড়িটা কখনও না কখনও বন্ধ হবেই, কারণ ব্যারোমিটারটাকে যদি সরিয়েও ফেলা হয়, তবু সঞ্চিত চালিকা শক্তি পুরো এক বছর ধরে এটাকে চালাতে পারবে। আমার বলা উচিত, এই ঘড়িটাকে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করেছি এবং যেমন পরিকল্পনায়, তেমনই নির্মাণে, উভয় দিক থেকেই এর মত চতুর যন্ত্রাংশ আমি আর দেখিনি।"

চিত্র 72



অষ্টাদশ শতাব্দীর একটি "শক্তি-উপহার" যন্ত্র।

দুর্ভাগ্যের কথা, ঘড়িটি চুরি হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সেটার কি যে হল কেউ জানে না। ভাগ্যিস ফার্গুসন কয়েকটা ছবি এঁকেছিলেন, তাই ঘড়িটার একটা ছবি ছাপা সম্ভব হল।

ঘড়িটির যন্ত্রাংশের মধ্যে ছিল একটা বড় পারদ ব্যারোমিটার। এর মধ্যে দুটো কাচের পাত্রে প্রায় 150 কেজি পারদ থাকত। একটি পাত্রের মুখ অন্যটার মধ্যে ঢোকানো এবং দুটোকেই ঝোলানো ছিল একটা ফ্রেম থেকে। দুটো পাত্রই স্বতন্ত্রভাবে ওঠা-নামা করত। বায়ুমণ্ডলের চাপ বাড়লে অভিনব কিছু লিভারের সমন্বয় উপরকার পাত্রটিকে নামিয়ে এবং নিচেরটিকে তুলে দিত। বায়ুমণ্ডলের চাপ কমলে এর বিপরীত ঘটত। এর দ্বারা গীয়ারের একটি ছোট চাকা সবসময়েই একই দিকে ঘুরতে বাধ্য হত। শুধু বায়ুমণ্ডলের চাপ স্থির থাকত যখন চাকাটা ঘুরত না। কিন্তু এই সব বিরামের কালেও সঞ্চিত স্থিতিশক্তি ঘড়ির কল চালাত। যদিও দুটো ওজনকে একসঙ্গে উপরে তোলা এবং সেগুলো নামার সময় তাদের দিয়ে দম দেওয়ানোর কাজটা সহজ নয়, প্রাচীন কালের ঘড়ি-নির্মাতারা খুবই কুশলী ছিলেন। এমন কি বায়ুমণ্ডলের চাপের

পরিবর্তন থেকে সৃষ্ট শক্তি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি হত, ফলে ওজন-গুলোকে পুরোপুরি নামতে দেবার আগেই আবার টেনে তুলে নিত। তাই একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যাতে পুরোপুরি উপরে উঠে যাবার পরে নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে ওজনগুলোকে বিযুক্ত করে রাখা যায়।

এই ধরনের 'শক্তি-উপহার' যন্ত্র ও 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের মৌলিক পার্থক্য খুবই স্পষ্ট। শূন্য থেকে শক্তি সৃষ্টি করা যায় না—অথচ সেটাই করার চেষ্টা করেছিলেন 'অবিরাম গতি' যন্ত্রের উদ্ভাবকরা। এই ঘড়ির ক্ষেত্রে শক্তি সরবরাহ করা হচ্ছে একটি বাইরের উৎস অর্থাৎ আশপাশের বায়ুমণ্ডল থেকে, যেখানে সূর্য এই শক্তিকে সঞ্চিত করে। সত্যি যদি কোনো 'অবিরাম গতি' যন্ত্র উদ্ভাবিত হত, তাহলে তার থেকে যে সুবিধা পাওয়া যেত ব্যবহারিক বিচারে তার সমান সুবিধা দেওয়ার কথা এই 'শক্তি-উপহার' যন্ত্রের। তবে কিনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যন্ত্রটার দাম বড্ড বেশি হয়।

পরে আমি অন্য ধরনের 'শক্তি-উপহার' যন্ত্র নিয়ে লিখব এবং ব্যবসায়িক দিক থেকে কেন এগুলো মোটেই লাভজনক নয়, সেকথা বুঝিয়ে বলব।

পরিচ্ছেদ ৬

তাপ

ওক্‌তিয়াব্রাস্কায়া রেলপথ কখন বেশি লম্বা হয়?

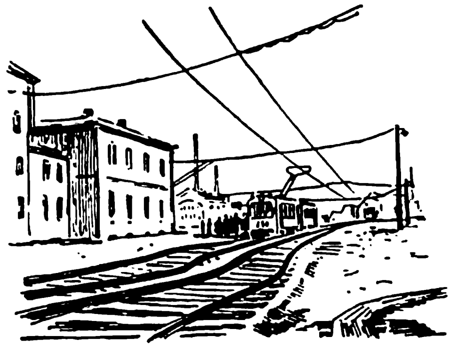
ওক্‌তিয়াব্রাস্কায়া (Oktyabrskaya) রেলপথ কত লম্বা জানতে চাইলে লোকে বলে : 'গড়ে 640 কিমি লম্বা। কিন্তু শীতের চেয়ে গ্রীষ্মে এটি 300 মিটার বেশি লম্বা।'

ব্যাপারটাকে যতটা অবাস্তব মনে হচ্ছে তা নয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য বলতে যদি আমরা তার রেলের দৈর্ঘ্য বোঝাই তাহলে সেটা সত্যিই শীতের চেয়ে গ্রীষ্মে বেশি লম্বা হবে। ভুলে যেও না যে, তাপ ইস্পাতের রেলকে প্রসারিত করে— প্রতি এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের জন্য তাদের দৈর্ঘ্যের 100,000 ভাগের চেয়েও বেশি বৃদ্ধি পায়। প্রখর গ্রীষ্মের দিনে রেলের উষ্ণতা 30-40° সেণ্টিগ্রেড বা আরও বেশি উঠতে পারে। কখনও কখনও রেলগুলো এত তেতে ওঠে যে হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। শীতকালের রেল ঠাণ্ডা হয়ে শূন্যের নিচে 25° সেণ্টিগ্রেডে বা আরো নিচে নেমে যেতে পারে। গ্রীষ্ম ও শীতের মধ্যে উষ্ণতার পার্থক্য 55° ধরে নিয়ে, রেলপথের পূর্ণ দৈর্ঘ্যকে (640 কিমি) প্রথমে 0·00001 ও তার পরে 55 দিয়ে গুণ করে আমরা পাই এক কিলোমিটারের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। কাজেই গ্রীষ্মকালে মস্কো-লেনিনগ্রাদ রেলপথ শীতকালের তুলনায় সত্যিই এক কিলোমিটারের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে 300 মিটার বেশি লম্বা।

এটা আসলে রেলপথের দৈর্ঘ্যের নয়, পরিবর্তন ঘটে শুধু রেলগুলির দৈর্ঘ্যের সমষ্টিতে। ব্যাপার দুটো এক নয় কারণ, রেলপথের রেলগুলো পরস্পরের মুখে মুখে জোড়া থাকে না। গরম হয়ে গেলে রেলগুলো যাতে অবাধে বাড়তে পারে তার জন্য রেলের সংযোগ মুখে সামান্য ফাঁক রেখে দেওয়া হয়। (শূন্য ডিগ্রিতে 8 মিটার রেলের ক্ষেত্রে এই ফাঁক হওয়া উচিত 6 মিমি। এই ফাঁক পুরোপুরি ভরার জন্য রেলের উষ্ণতা 65° সেণ্টিগ্রেড বাড়া উচিত। কিছু প্রায়োগিক কারণে ট্রাম পথের রেলের মধ্যে ফাঁক রাখা যায় না। সাধারণতঃ এই রেলগুলো বেঁকে যায় না কারণ, সেগুলো মাটির মধ্যে বসানো থাকে, সেই জন্য উষ্ণতার তেমন হেরফের ঘটে না। এ ছাড়া রেলগুলো আটকাবার জন্য

অনুসৃত পদ্ধতিও তাদের বাঁকতে দেয় না। অবশ্য খুব গরমের দিনে ট্রামের রেল সত্যিই বেঁকে যায়, যেমন দেখা যাচ্ছে 73 নং চিত্রে। এটি একটি সত্যিকার আলোকচিত্র থেকে মুদ্রিত। কোনো কোনো সময়ে রেলপথের রেলের বেলায়ও এরকম ঘটে। ঢালু জায়গায় নিচে নামার সময় ট্রেন রেলের উপর হেঁচকা টান লাগায়, কখনও কখনও স্লিপার সমেতই টান দেয়। তার ফলে, এই রকম অংশে

চিত্র 73



খুব গরমের দিনে ট্রাম লাইন বেঁকে যায়।

ফাঁকগুলো আর থাকে না, রেলগুলো পরস্পরের মুখে মুখে জুড়ে যায়।) আমাদের হিসেব মতো দেখা যাচ্ছে, সমস্ত রেলগুলির মোট দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায় তাদের মোট ফাঁকগুলোর বিনিময়ে। এক্ষেত্রে বরফ ঝরা শীতকালের চেয়ে প্রখর গ্রীষ্মের দিনে এই দৈর্ঘ্য 300 মিটার বেশি হয়। কাজেই মোটের উপর, ওক্‌তিয়াব্রাস্কায়া রেলপথের দৈর্ঘ্য সত্যিই শীতের চেয়ে গ্রীষ্মকালে 300 মিটার বেশি।

চুরি করেও শাস্তি পেতে হয় না

প্রত্যেক বছর শীতকালে মস্কো-লেনিনগ্রাদ লাইনের কয়েক শত মিটার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ তার একেবারে উধাও হয়ে যায়। এই নিয়ে কেউ কখনও দুশ্চিন্তা করে না, সবাই জানে কে দোষী। মনে হচ্ছে তুমিও এর মধ্যে তার আভাস পেয়ে গেছ। চোরটা হল তুষার। রেলের বেলায় যা সত্যি তারের বেলায়ও তাই। তফাতের মধ্যে টেলিফোনের তামার তার গরম হলে ইস্পাতের চেয়ে 1·5 গুণ বেশি প্রসারিত হয়। এবং এক্ষেত্রে যখন কোনো ফাঁক রাখার ব্যাপার নেই, একথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, গ্রীষ্মের তুলনায় শীতকালে মস্কো-লেনিনগ্রাদ টেলিফোন লাইন সত্যিই 500 মিটার কমে যায়। প্রত্যেক শীতে তুষার প্রায় আধ কিলোমিটার তার চুরি করে নিয়ে পালায় এবং ধরা পড়ে না।

কিন্তু তার জন্য টেলিফোন বা টেলিগ্রাফ সংযোগ ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায় না। যা চুরি করে তার সবই নিষ্ঠাবানের মতো ফিরিয়ে দেয় গরমকাল পড়লেই।

কিন্তু তুষারপাতের জন্য তারের বদলে যখন সেতু সংকুচিত হয়, তার ফল হয় অতি সাংঘাতিক। 1927-এর ডিসেম্বরে খবরের কাগজে এই প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল : 'কিছুকাল যাবত ফ্রান্সে অস্বাভাবিক তুষারপাতের দরুন প্যারিসের কেন্দ্রে সাইনে নদীর উপরকার সেতুটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তুষার-পাতের জন্য সেতুর ইস্পাতের কাঠামোটি সংকুচিত হয়েছে, ফলে সেতুপথের অংশ বিশেষকে চেপে উঁচু করে দিয়েছে। সাময়িকভাবে সেতু দিয়ে চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।'

আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা কত :

আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করতাম, আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা কত, তাহলে 3000 মিটার বলার আগে তুমি সম্ভবত জানতে চাইতে, শীতকালে না গ্রীষ্মকালে? সত্যিই তো অমন বিশাল ইস্পাতের কাঠামোর উচ্চতা সব উষ্ণতায় সমান থাকতে পারে না। আমরা জানি 300 মিটার লম্বা ইস্পাতের ডাণ্ডার উষ্ণতা 1° সেণ্টিগ্রেড বৃদ্ধিতে তার দৈর্ঘ্য 3 মিমি বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতা 1° বাড়লে আইফেল টাওয়ারের উচ্চতাও মোটামুটি একই পরিমাণে বাড়বে। রোদ ঝলমলে উষ্ণ আবহাওয়ায় প্যারিসে এই স্তম্ভটির উষ্ণতা শূন্যের চেয়ে 40° সেণ্টিগ্রেড অবধি উঠতে পারে। ওদিকে ঠাণ্ডা বর্ষার দিনে এর উষ্ণতা 10° সেণ্টিগ্রেডে নেমে আসতে পারে এবং শীতকালে শূন্যে এমন কি শূন্যের 10° নিচেও নেমে আসতে পারে (প্রবল তুষারপাত প্যারিসে বিরল)। উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি 40° বা তারও বেশি হয়। তার মানে, আইফেল টাওয়ারের উচ্চতা $3 \times 40 = 120$ মিমি $= 12$ সেমি পর্যন্ত বাড়তে বা কমতে পারে।

হাতেনোতে মাপ নিয়ে দেখা গেছে উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে আইফেল টাওয়ার বাতাসের চেয়েও বেশি সংবেদী। তুলনায় এটা এত তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে বা ঠাণ্ডা হয় যে মেঘলা দিনে হঠাৎ সূর্য উঠলে বাতাসের চেয়ে আগে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আইফেল টাওয়ারের উচ্চতার পরিবর্তনের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল বিশেষ ধরনের নিকেল ইস্পাতের তৈরী একটা তার ব্যবহার করে। এই তারের উপর উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধির কোনো প্রভাব পড়ে না বললেই চলে। ইংরাজী শব্দ 'ইন্‌ভেরিয়েব্‌ল্‌' থেকে এই আশ্চর্য সংকর ধাতুটির নামকরণ করেছে 'ইনভার্‌'।

কাজেই, শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে লোহার তৈরী আইফেল টাওয়ার লম্বায় 12 সেমি বেড়ে যায়। অবশ্য এই বৃদ্ধির জন্য এক পয়সাও খরচ করতে হয় না।

চায়ের গ্লাস থেকে জলের গেজ

গ্লাসে চা ঢালার সময় অভিজ্ঞ গৃহিণীরা তার মধ্যে একটা চামচ, বিশেষত রুপোর, রেখে দেন যাতে গ্লাসটি ফেটে না যায়। অভিজ্ঞতাই এই উপযুক্ত পথটি বাতলে দিয়েছে।

কিন্তু এটার মূল নীতি কি? গরম জলে চায়ের গ্লাস ফেটে যায় কেন?

কাচের অসম প্রসারণের জন্য। তুমি যখন কাচের গ্লাসের মধ্যে গরম জল ঢাল, তার দেওয়ালগুলো সবটাই এক সঙ্গে তেতে ওঠে না। প্রথমে ভেতরকার স্তরটা তেতে ওঠে, বাইরেরটা থাকে ঠাণ্ডা। ভিতরের তপ্ত স্তরটি সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাইরের স্তরটি প্রসারিত না হওয়ার জন্য ভেতর থেকে জোরালো চাপ অনুভব করে এবং পট্ করে ফেটে যায়।

পুরু কাচের গ্লাস ব্যবহার করলে এর হাত থেকে রেহাই পাবে ভেবো না। উল্টে, পাতলা কাচের গ্লাসের চেয়ে এগুলো আরও তাড়াতাড়ি ফাটার সম্ভাবনা। পাতলা দেওয়াল তাড়াতাড়ি তেতে ওঠে এবং তার উষ্ণতা ও প্রসারণের মধ্যে দ্রুত সমতা আসে বলেই এটা ঘটে। অপর পক্ষে, একটা মোটা দেওয়ালওলা গ্লাস ধীরে ধীরে তাততে থাকে।

পাতলা কাচের পাত্র কেনার সময় একটা কথা কখনো ভুলে যেও না—দেখে নেবে, পাত্রের তলার দিকটাও যেন পাতলা হয়, কারণ এই তলাটাই প্রধানত তেতে ওঠে। মোটা তলাযুক্ত গ্লাসের দেওয়াল যতই পাতলা হোক, সেটা ফাটবেই। যেসব গ্লাস ও চিনেমাটির কাপের তলার দিকে মোটা কানা তোলা থাকে, সেগুলোও ফেটে যায়।

যে কাচের পাত্রের দেওয়াল যত পাতলা, গরম করার পক্ষে সেটা ততই নিরাপদ। রসায়নবিদ্‌রা অত্যন্ত পাতলা কাচের পাত্র সরাসরি বার্নারের উপরে রেখে জল ফোটান।

পাত্র হিসাবে সেটাই আদর্শ যেটাকে গরম করলেও একটুও প্রসারিত হবে না। কোয়ার্ৎজ-এর ধর্ম প্রায় এই রকম—কাচের চেয়ে এটা 15-20 ভাগ কম প্রসারিত হয়। স্বচ্ছ কোয়ার্ৎজের মোটা দেওয়ালের পাত্র গরম করা হলে কখনও ফাটে না, এমন কি লোহিত-তপ্ত অবস্থায় বরফ-জলে ডোবালেও নয় (পরীক্ষাগারের কাজের পক্ষে কোয়ার্ৎজ পাত্র উপযোগী কারণ 1,700 সেণ্টিগ্রেডের কমে এটা গলে না)। এমনটা হবার আরেকটা কারণ হল, কাচের চেয়ে কোয়ার্ৎজ অনেক ভাল তাপ পরিবহণ করে।

শুধু যে তাড়াতাড়ি গরম করা হলেই চায়ের গ্লাস ফেটে যায় তা নয়, তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করা হলেও তাই হয়। এক্ষেত্রে অসম সংকোচনই তার জন্য দায়ী। ঠাণ্ডা হওয়ার সময়ে বাইরের স্তরটা সংকুচিত হয় এবং ভেতরের স্তরটার

উপর জোরালো চাপ দেয়। ভেতরের স্তরটা তখনও ঠাণ্ডা এবং সংকুচিত হয়নি। বুদ্ধিমতী গৃহিণী কখনও গরম আচারের বোতল ঠাণ্ডায় বা ঠাণ্ডা জলের মধ্যে রাখেন না।

আবার চামচের কথায় ফিরে আসা যাক। এটা কি করে গ্লাসের ফেটে যাওয়া নিবারণ করে? খুব গরম জল একবারে অনেকটা গ্লাসে ঢেলে দিলে তবেই ভেতরের ও বাইরের স্তরের প্রসারণের মধ্যে পার্থক্যটা খুব বেশি হয়ে যায়। উষ্ণ জল কিন্তু গ্লাস ফাটায় না। এর মধ্যে একটা চামচ রাখলে কি ঘটে? গরম জল ঢালা মাত্র চামচের সংস্পর্শে এসে তার তাপ কিছুটা হারায়। চামচটা গ্লাসের মতো নয়, এটা তাপের সুপরিবাহী। এর ফলে জলের উষ্ণতা নেমে আসে, আর তখন ওর কোনো ক্ষতি করার ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। ইতিমধ্যে গ্লাসটাও গরম হয়ে ওঠে এবং আরও গরম জল ঢাললেও তা ফাটে না।

এক কথায়, ধাতব চামচ, বিশেষ করে সেটা যদি ভারী হয় তবে গ্লাসের অসম তাপগ্রহণ নিবারণ করে এবং তাকে ফাটার হাত থেকে বাঁচায়।

কিন্তু চামচটা রুপোর হলে আরও ভাল হয় কেন? কারণ রুপো তাপের সুপরিবাহী। তামার চামচের চেয়েও সেটা জল থেকে আরও তাড়াতাড়ি তাপ টেনে নিতে পারে। গরম চা ভর্তি গ্লাসে রাখা রুপোর চামচ আঙুলে ছেঁকা দেয়। তামার চামচ তা করে না। ফলে এর থেকেই তুমি বলে দিতে পার চামচটা কোন ধাতু দিয়ে তৈরী।

কাচের দেওয়ালের অসম প্রসারণ শুধু চায়ের গ্লাসের পক্ষেই নয়, বয়লারের খুব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ—জলের গেজের পক্ষেও ক্ষতিকর। জলের গেজ বয়লারের মধ্যে জলের উচ্চতা নির্দেশ করে। উষ্ণ বাষ্প ও জল জলের গেজের কাচের নলকে তাতিয়ে তুললে, তাদের ভেতরের স্তর বাইরের স্তরের চেয়ে বেশি প্রসারিত হয়। আবার এর সঙ্গে যুক্ত হয় নলের মধ্যে বাষ্প ও জলের দারুণ চাপ। এবার বুঝতে পারছ নিশ্চয়, কেন এগুলো খুব সহজেই ফেটে যেতে পারে। এটা নিবারণ করার জন্য এই নলগুলো কখনও কখনও দু'ধরনের কাচের স্তর দিয়ে তৈরি করা হয়। ভেতরের স্তরটার প্রসারণের ক্ষমতা বাইরেরটার চেয়ে কম থাকে।

কলঘরে বুটজুতো

"শীতকালে দিন ছোট হয় ও রাত বড় হয় এবং গ্রীষ্মকালে ঠিক তার উল্টোটাই বা হয় কেন? শীতকালে দিন ছোট হয় কারণ অন্য সব দৃশ্য ও দৃশ্যাতীত জিনিসের মতো এটাও ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়ে যায়। ইতিমধ্যে রাতটা প্রসারিত হয়—আলো আর বাতি জ্বালার পর রাতটা যে তেতে ওঠে।" চেকভের রচনায় অবসরপ্রাপ্ত ডন কসাক সার্জেন্টের কি হাস্যকর এই উদ্ভট ব্যাখ্যা! অবশ্য, যে

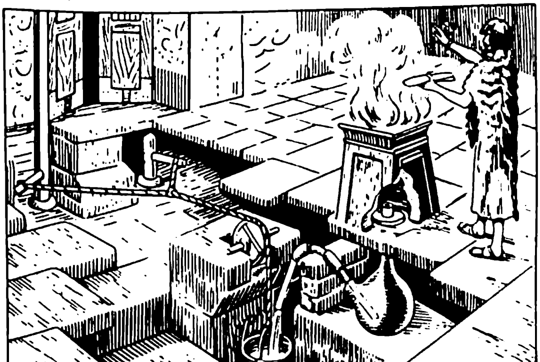
সব লোক এই 'বিদগ্ধ' যুক্তিকে পরিহাস করে তারাই আবার কখনও কখনও এমন তত্ত্ব সৃষ্টি করে যা সমান নির্বোধ। তুমি কি সেই বুট জুতোটার গল্প শুনেছ যেটা বাথরুমে কিছুতেই পরা যাচ্ছিল না, কারণ "উত্তপ্ত পা বড় হয়ে গিয়েছিল" : দুরন্ত উদাহরণ, কিন্তু ব্যাখ্যাটা পুরোপুরি ভুল।

প্রথমত বাথরুমে মানুষের উষ্ণতা বাড়ে না বললেই চলে—এক ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের বেশি তো কখনই নয়। শুধু টার্কিশ বাথ উষ্ণতা দু'ডিগ্রি বাড়িয়ে দেয়। আমাদের দেহ আশপাশের তাপকে সফলভাবে প্রতিরোধ করে এবং একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা বজায় রাখে। উপরন্তু, আমাদের শরীরের উষ্ণতার এই বেড়ে যাওয়া থেকে আমাদের দেহের আয়তনের এত নগণ্য ভগ্নাংশ বৃদ্ধি পায় যে, বুট জুতো পরার সময়ে তা কারও নজরে আসবে না। আমাদের হাড় এবং মাংসের প্রসারণের গুণাংক কখনই কয়েক দশ-সহস্রাংশের বেশি নয়।

ফলত, পায়ের গোড়ালি ও আঙুলের কাছটা যদিও বা বাড়ে তা এক সেণ্টিমিটারের শতাংশের বেশি নয়। বুট বা জুতো কখনও এত সূক্ষ্মভাবে সেলাই করা হয় না। যতই হোক এক সেণ্টিমিটারের শতাংশ তো একটা চুলের সমান।

সব সত্ত্বেও এটা কিন্তু সত্যি যে, গরম জলে স্নান করার পর বুট জুতো পরতে অসুবিধা হয়। অবশ্য তার কারণ এই নয় যে, গরমে আমাদের পা প্রসারিত হয়েছে। কারণ হল, তখন পায়ের দিকে বেশি রক্ত প্রবাহিত হয়, চামড়া ফুলে

চিত্র 74



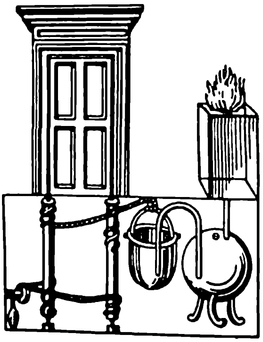
মিশরীয় মন্দিরের "অলৌকিক কাণ্ডের" ব্যাখ্যা।
বেদীর ওপরে ধূপধুনো জ্বালালেই দরজা খুলে যেত।

ওঠে, ভিজে এবং কোমল অবস্থায় থাকে—এক কথায়, কারণ আর যাই হোক তার সঙ্গে তাপ-জনিত প্রসারণের কোনো সম্পর্ক নেই।

কি করে অলৌকিক কান্ড করতে হয়

আলেকজান্দ্রিয়ার হেরন ছিলেন প্রাচীন গ্রীসের একজন গণিতজ্ঞ ও যন্ত্রবিদ। তাঁর উদ্ভাবিত ফোয়ারাটি তাঁরই নামে পরিচিত। এই হেরন দুটি সুচতুর পদ্ধতির

চিত্র 75



ছবিতে দেখা যাচ্ছে কিভাবে মন্দিরের দরজা ফাঁক হত (74 নং ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখ)।

বর্ণনা লিখে রেখে গেছেন যার সাহায্যে 'অলৌকিক' কান্ড দেখিয়ে মিশরীয় পুরোহিতরা ভক্তদের আকৃষ্ট করতেন।

চিত্র 76



প্রাচীন পুরোহিতদের আরেকটি লোক-ঠকানো অলৌকিক কাণ্ড। এইভাবেই "অবিরাম" ধূপধুনো পড়ত পবিত্র শিখার ওপরে।

74 নং চিত্রে এই রকম একটি কৌশল দেখান হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে মন্দিরের দরজার সামনে বসান একটি ফাঁপা ধাতব বেদী। আর রয়েছে, পাথরের মেঝের তলায় লুকিয়ে রাখা কারিগরি, যার সাহায্যে মন্দিরের দরজা খোলা যেত। ধূপধুনো জ্বালা হলে ফাঁপা বেদীর অভ্যন্তরে তপ্ত বায়ু মেঝের নিচে গুপ্ত পাত্রের জলের উপরে চাপ দিত। ফলে, সেই জল একটা নল দিয়ে চলে আসত একটা

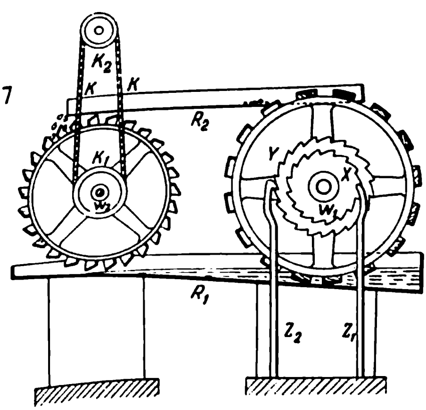
বালতির মধ্যে। বালতিটা নিচে নামার সময়ে দরজা-খোলার যন্ত্রপাতিকে চালু করে দিত (চিত্র 75)। ভক্তরা অবশ্য দেখে ভাবত অলৌকিক কাণ্ড ঘটছে। পুরোহিতরা ধূপধুনো জ্বালা আর মন্ত্রপাঠ শুরু করা মাত্র আপনা থেকে খুলে যাচ্ছে মন্দিরের দরজা। বলাই বাহুল্য, সাধারণ লোকে এই গুপ্ত ক্রিয়াবিধির কিছুই জানত না।

পুরোহিতরা আরেকটা লোক ঠেকানো 'অলৌকিক' কাণ্ড দেখাতেন। 76 নং চিত্রে সেটা দেখানো হয়েছে। পবিত্র সুগন্ধী জ্বালানো শুরু করলেই প্রসারিত বায়ু আরও বেশি তরল সুগন্ধী ঠেলে পাঠিয়ে দিত মেঝের তলাকার চৌবাচ্চা থেকে পুরোহিতদের মূর্তির মধ্যে লুকানো নল মারফত। আর ভক্তরা দেখতেন অনির্বাণ শিখার 'অলৌকিক' কাণ্ড। অবশ্য পুরোহিত যখন মনে করতেন পুজোর দক্ষিণা বড়ই কম পড়েছে, তিনি সবার অলক্ষে চৌবাচ্চার ঢাকনায় লাগানো একটা ছিপি খুলে নিতেন। এর ফলে সুগন্ধীর স্রোত বন্ধ হয়ে যেত, কারণ প্রসারিত বায়ু তখন অবাধ নির্গমদ্বার পেয়ে যেত।

আপনা হতে দম দেওয়া ঘড়ি

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদের শেষের দিকে আমি একটা ঘড়ির বিবরণ দিয়েছি যেটা আপনা থেকেই নিজেকে দম দেয়। বায়ুমণ্ডলের চাপের পরিবর্তনের উপর ছিল এই ঘড়িটার কার্যবিধি। এবার আমি তোমাদের আরেকটা এই ধরনের আপনা হতে দম-দেওয়া ঘড়ির কথা বলব যেটার কার্যবিধি তাপের প্রসারণের উপর

চিত্র 77



আপনা হতে দম-দেওয়া ঘড়ির নকশা।

নির্ভরশীল। 77 নং চিত্রে এই রকম একটার ক্রিয়াবিধি দেখানো হয়েছে। এর প্রধান অঙ্গ হল দুটি রড—Z_1, এবং Z_2। রড দুটি বিশেষ ধরনের সংকর ধাতু থেকে তৈরী, যার প্রসারণের গুণাংক খুব বেশি। প্রসারিত হবার পর Z_1-রড

X-চাকার দাঁতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকে ঘোরায়। ওদিকে সংকোচনের পর Z_2-রড Y-চাকার দাঁতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাকেও একই দিকে ঘোরায়। দুটো চাকাই W_1 শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত। এই শ্যাফ্‌টটা আবার বাটি লাগানো একটা বড় চাকাকে ঘোরায়। এই বাটিগুলো তলাকার হেলানো পাত্র R_1 থেকে পারদ তুলে এনে বিপরীত দিকে হেলে থাকা উপরকার R_2 পাত্রে এনে ফেলে। R_2 পাত্র দিয়ে পারদ গড়িয়ে যায় বাঁদিকের আরেকটি বাটি-যুক্ত চাকার দিকে। বাটিগুলো ভর্তি হলে, চাকাটা ঘোরে এবং K_1 ও K_2 চাকার উপর দিয়ে পরানো K_1 শিকলটাও সচল হয়। বড় চাকাটার মতো K_1 চাকাটাও W_2 শ্যাফ্‌টের সঙ্গে যুক্ত। K_1 ও K_2 চাকা ঘোরার ফলে ঘড়িতে দম দেওয়া হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বাঁদিকের চাকার বাটিগুলো উপুড় হয়ে হেলানো পাত্র R_1-এর মধ্যে পারদটাকে ঢেলে দেয়। এই পাত্রের ঢাল বয়ে পারদ এসে পেঁছয় ডানদিকের চাকার তলায়। আবার পুনরাবৃত্তি ঘটে এই কার্যক্রমের।

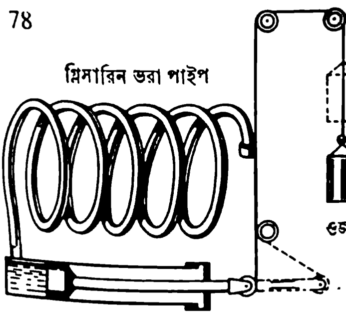
Z_1 ও Z_2 দণ্ড দুটোর প্রসারণ ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে এই ঘড়িটা চলতেই থাকবে। ঘড়িটায় দমের জন্য যা দরকার তা হলো বায়ুর উষ্ণতার পর্যায়ক্রমে বাড়া-কমার—আর এটা এমনই একটা ব্যাপার যা আমাদের বিনা হস্তক্ষেপেই ঘটে চলে। তাহলে কি এই ঘড়িটাকে আমরা 'অবিরাম গতি' যন্ত্র বলতে পারি? অবশ্যই নয়। যন্ত্রাংশ ক্ষয় না পাওয়া অবধি এই ঘড়ির টিকটিক শব্দ অনির্দিষ্ট কাল অবধি চলতেই থাকবে, কিন্তু এটাকে তো চালিত করছে পারিপার্শ্বিক বাতাসের উত্তাপ। ঘড়িটা তাপের প্রসারণজনিত কাজকে সঞ্চয় করে এবং দফায় দফায় সেটি খরচ করে কাঁটা ঘোরাবার জন্য। বাস্তবিকই এটা একটা 'শক্তি উপহার' যন্ত্র, কেননা, এর জন্য কোনো যত্ন নেওয়া বা খরচ করা দরকার হয় না। তা বলে এটি শূন্য থেকে শক্তি উৎপাদন করে না, এর প্রাথমিক উৎস হল সূর্যের তাপ যা পৃথিবীকে উত্তপ্ত করে।

চিত্র 78 ও 79-তে একই ধরনের ব্যবস্থার আরেকটি আপনা হতে দম-দেওয়া ঘড়ির উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। এর মুখ্য উপাদান গ্লিসারিন, যেটা বায়ুর উষ্ণতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হয় এবং তার ফলে একটি ছোট ওজনকে উপরে টেনে তোলে। এই ওজনটা নেমে আসার সময়ে ঘড়িটাকে চালায়। উষ্ণতা শূন্যের 30° সেণ্টিগ্রেড নিচে না পেঁছলে গ্লিসারিন ঘনীভূত হয় না আর 290° সেণ্টিগ্রেডে না পেঁছলে বাষ্পীভূত হয় না, তাই এই ক্রিয়াবিধি শহরের ঘড়ির পক্ষে উপযোগী। উষ্ণতার 2° হ্রাসবৃদ্ধিই এটাকে চালু রাখার পক্ষে যথেষ্ট। এই-রকম একটা ঘড়িকে এক বছর ধরে পরীক্ষা করে আশানুরূপ ফল পাওয়া গেছে।

এই ধরনের আরও বড় যন্ত্র তৈরি করে কি কোনো সুবিধা পাওয়া যাবে? প্রথম দৃষ্টিতে এরকম 'শক্তি-উপহার' যন্ত্রকে খুব অর্থকরী মনে হওয়ারই কথা।

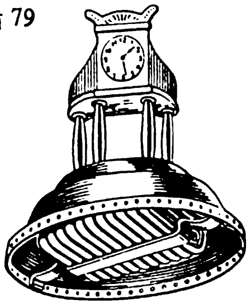
তাহলেও কথাটা সত্যি কিনা দেখা দরকার। 24 ঘণ্টা চলার জন্য একটা সাধারণ ঘড়িতে দম দিতে মাত্র $\frac{1}{7}$ কেজি-মিটার শক্তি লাগে। এটা প্রতি সেকেন্ডে এক কিলোগ্রাম মিটারের মাত্র $\frac{1}{600,000}$ ভাগ। এক অশ্বশক্তিকে 75 কেজি-মিটার/সেকেণ্ড ধরলে, ঘড়ির যন্ত্রাংশের শক্তি হয় এক অশ্বশক্তির মাত্র $\frac{1}{45,000,000}$ অংশ। ফলত, পূর্বে উল্লিখিত প্রথম ঘড়িটির রডগুলি বা দ্বিতীয় ঘড়িটির কলকব্জার জন্য যদি এক কোপেক খরচ হয়ে থাকে, তাহলে এক অশ্বশক্তি সৃষ্টি করতে

চিত্র 78



গ্লিসারিন ভরা পাইপ। আরেকটি আপনা হতে দম দেওয়া ঘড়ির নকশা।

চিত্র 79



আপনা হতে দম-দেওয়া ঘড়ি। ঘড়ির তলার দিকে গ্লিসারিন ভরা পাইপটা লকানো আছে।

45,000,000 কোপেক, বা 450,000 রুবল লাগবে। 'শক্তি-উপহার' যন্ত্রের এক অশ্বশক্তির জন্য পাঁচ লাখ রুবল খরচ বোধ হয় একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে।

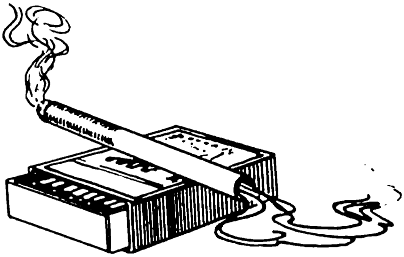
সিগারেটের শিক্ষা

চিত্র 80-তে দেশলাই বাক্সের উপর রাখা একটা ফিল্টার সিগারেট দেখা যাচ্ছে। দুই প্রান্ত দিয়েই ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরোচ্ছে। অবশ্য, এক প্রান্ত দিয়ে ধোঁয়াটা পাক খেয়ে উপরে উঠছে, অন্য প্রান্ত দিয়ে নিচে নামছে। কেন? দুই প্রান্তের ধোঁয়ার মধ্যে কোনো তফাত আছে নাকি? না, তা নেই কিন্তু যে প্রান্তটা জ্বলছে তার উপর দিকে উষ্ণ বায়ুর একটা ঊর্ধ্বগামী স্রোত রয়েছে। সেটাই ধোঁয়ার কণাগুলোকে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে উপরে। এদিকে অন্য প্রান্তে ফিল্টার দিয়ে ধোঁয়া বহনকারী বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে বেরিয়ে আসে। এই ধোঁয়ার কণাগুলো বাতাসের চেয়ে ভারী, তাই ভাসতে ভাসতে নিচে নেমে আসে।

যে বরফ ফুটন্ত জলেও গলে না

একটা টেস্টটিউব নিয়ে তাতে জল ভরো, এবং তার মধ্যে এক টুকরো বরফ ফেলে দাও। জলের চেয়ে হালকা বলে বরফটা ভেসে উঠবে তাই বরফটাকে

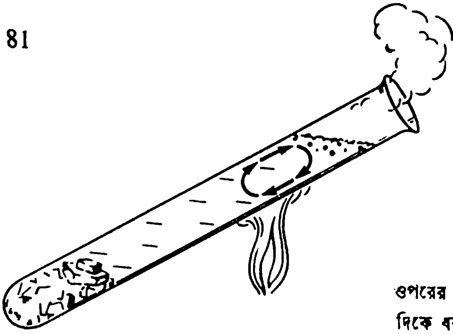
চিত্র 40



ধোঁয়া কেন এক দিক দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওপরে উঠছে এবং অন্যদিক দিয়ে নীচে নামছে?

নিচের দিকে রাখার জন্য এটার উপর যা হোক একটা ছোটখাট ওজন চড়িয়ে দাও। তবে খেয়াল রেখ যাতে বরফের টুকরোটা জলের সংস্পর্শে আসতে পারে। এবার

চিত্র 81



ওপরের দিকে জল ফুটছে, কিন্তু তলার দিকে বরফ গলছে না।

স্পিরিট ল্যাম্পের উপরে টেস্টটিউবটাকে এমনভাবে গরম করো, শিখাটা যাতে শুধু টেস্টটিউবের উপরের অংশটায় লাগে, যেমন দেখানো হয়েছে চিত্র 81-তে। জল দ্রুত ফুটে যাবে এবং বাষ্প বেরোতে থাকবে। আশ্চর্যের ব্যাপার টেস্টটিউবের তলায় বরফ কিন্তু গলবে না। মনে হতে পারে এ এক ছোটখাটো, অলৌকিক ঘটনা—ফুটন্ত জলের মধ্যেও বরফ গলছে না!

রহস্যটা কোথায় জানো, টেস্টটিউবের তলায় কিন্তু জল আদৌ ফোটে না, ঠাণ্ডাই থাকে। আসলে আমরা 'ফুটন্ত জলের মধ্যে' বরফ রাখিনি, রেখেছি

'ফুটন্ত জলের নিচে'। উত্তপ্ত জল প্রসারিত হওয়ার জন্য হালকা হয়ে যায়, তাই নিচে নেমে না এসে টেস্টটিউবের উপরের অংশেই থাকে। টেস্টটিউবের উপরের অংশে শুধু গরম জল এবং গরম ও ঠাণ্ডা জলের স্তরের মিশ্রণ থাকে। এখানে তাপকে শুধু পরিবহণের সাহায্যেই নিচের দিকে স্থানান্তরিত করা সম্ভব কিন্তু জল আবার তাপের পক্ষে খুবই খারাপ পরিবাহী।

উপরে না নিচে ?

জল গরম করতে চাইলে জল-ভরা পাত্রটাকে আমরা আগুনের শিখার ঠিক উপরে রাখি, তার পাশে রাখি না। এটাই ঠিক কাজ, কারণ উত্তপ্ত বাতাস হালকা হয়ে যায় এবং পাত্রের তলা থেকে উপরে ঠেলে ওঠার সময়ে পাত্রটাকে ঘিরে ধরে। কাজেই যে বস্তুটাকে আমরা গরম করতে চাই সেটাকে ঠিক আগুনের শিখার উপরে রাখার ফলে সবচেয়ে ভালভাবে উত্তাপের উৎসটিকে ব্যবহার করা যায়।

কিন্তু বরফ দিয়ে কোনো কিছু ঠাণ্ডা করার সময়ে আমাদের কি করা উচিত? ঠাণ্ডা করতে হবে এমন জিনিসকে—যেমন ধরা যাক দুধের পাত্রকে, অনেকে বরফের উপরে বসিয়ে দেয়। এটা করা ভুল, কারণ বরফের উপরকার বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে নেমে আসে আর সেই বাতাসের জায়গা অধিকার করে পারিপার্শ্বিক উষ্ণতর বাতাস। কাজেই যদি পানীয় বা প্লেটের খাবার ঠাণ্ডা করতে চাও, সেটা বরফের উপর রেখো না, বরং বরফটাকে তার উপরে রাখো।

ব্যাপারটাকে আরেকটু স্পষ্ট করি। বরফের উপরে আমরা যখন জলের পাত্র বসাই, তখন তার নিচেকার স্তরটি শুধু ঠাণ্ডা হয়। বাকী জলটুকুকে ঘিরে যে বাতাস থাকে সেটা ঠাণ্ডা নয়। কিন্তু আমরা যদি ঢাকনার উপর বরফ রাখি, জলটা অনেক তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হবে। শীতল উপরের স্তর নিচে নেমে আসবে, তার জায়গা দখল করবে নিচের থেকে উঠে আসা উষ্ণ স্তর। সমস্ত জল ঠাণ্ডা না হওয়া অবধি এই প্রক্রিয়াই চলতে থাকবে (জেনে রাখো, বিশুদ্ধ জলের উষ্ণতা ঠাণ্ডা হবার পর শূন্য নয় তার 4° উপরে থাকবে—এই উষ্ণতাতেই জলের ঘনত্ব সর্বাধিক)। ইতিমধ্যে বরফের চারপাশের বাতাস ঠাণ্ডা হয়ে নিচে নেমে এসে পাত্রটাকে আবৃত করবে।

বন্ধ জানলা থেকে হাওয়ার হলকা

একটা জানলা আঁটোসাটো করে বন্ধ করা আছে, তাতে কোনো ফাঁক ফোঁকর নেই, তবুও প্রায়ই আমাদের মনে হয় জানলাটা থেকে যেন হাওয়া আসছে। এটাকে অদ্ভুত মনে হলেও এর মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

ঘরের মধ্যকার বাতাস বলতে গেলে কখনই স্থির অবস্থায় থাকে না। বাতাস গরম বা ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদৃশ্য স্রোত বয়। বাতাস গরম

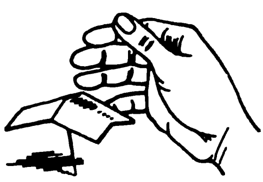
হলে তার লঘূভবন হয় ও হালকা হয়ে যায়। ঠাণ্ডা হলে বাতাস ঘন ও ভারী হয়ে যায়।

জানলা এবং বাইরের দিকের দেওয়ালের কাছের ঠাণ্ডা ভারী বাতাস মেঝের উপর নেমে আসে, আর উষ্ণ হালকা বাতাসকে ঠেলে পাঠায় ছাদের কাছে। একটা খেলনা বেলুনের সাহায্যে এই স্রোতকে বুঝতে পারা যায়। বেলুনের সঙ্গে একটা ওজন বেঁধে দাও। ওজনটা এমন হাল্কা গোছের হওয়া দরকার যাতে বেলুনটা ঘরের হাওয়ায় ভাসতে থাকে। বেলুনটাকে একটা স্টোভ বা তাপ-বিকিরকের কাছে ছেড়ে দাও। দেখবে সেটা ঘরের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘর গরম করার চুল্লী বা তাপ-বিকিরকের থেকে বেরোনো অদৃশ্য স্রোত তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছাদের কাছে এবং জানলার দিকে, এবং সেখান থেকে নামিয়ে আনছে মেঝের কাছে আর তারপর আবার ফিরে আসছে চুল্লীর কাছে। এখান থেকে আবার একই পথে ভ্রমণ শুরু করবে। এই কারণেই, শীতের দিনে জানলা ভাল করে বন্ধ থাকলেও আমাদের মনে হয় হাওয়া লাগছে, বিশেষত পায়ের আশেপাশে।

রহস্যময় ঘূর্ণন

সিগারেটের পাতলা একটা কাগজ নিয়ে আয়তক্ষেত্রের আকারে একটা টুকরো কেটে নাও। মাঝ বরাবর ভাঁজ করে তারপর আবার সোজা করে দাও। এই ভাঁজটাই তোমাকে জানিয়ে দেবে ভরকেন্দ্রের অবস্থানটা কোথায়। এবার একটা

চিত্র 82



এই কাগজের টুকরোটা পাক খায় কেন?

সূচকে খাড়া করে গেঁথে দাও টেবিলের উপর। কাগজটাকে সূচের উপরের মাথার উপর এমনভাবে রাখো যাতে ভরকেন্দ্রটা এটার উপর বসে, ওটাকে সুষম অবস্থায় রাখে। এ অবধি এর ভেতরে কোনো রহস্য নেই। চিত্র 82-র মত করে, তোমার হাতটাকে ওটার উপরে ধর। খুব আস্তে আস্তে করবে, নইলে দমকা হাওয়ার টানে কাগজের টুকরোটা উড়ে যাবে। কাগজটা ঘুরতে শুরু করবে। প্রথমে ধীরে ধীরে পাক খাবে কিন্তু তারপর গতি বাড়বে। হাত সরিয়ে নিলে ঘোরাও বন্ধ হয়ে যাবে। আবার হাতটা ওখানে আনলেই ঘোরা শুরু করবে।

1870-এর দশকে এই রহস্যময় ঘূর্ণন দেখে অনেকে বিশ্বাস করে ফেলেছিল যে, আমাদের কিংবা বলা ভাল, আমাদের দেহের কিছু অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা আছে। অতীন্দ্রিয়বাদীরা ভেবেছিলেন এর থেকে বুঝি তাঁদের মতে মানুষের দেহে কতকগুলো অদ্ভুত তরল থাকার কথার মত উদ্ভট তত্ত্বই সমর্থিত হচ্ছে। আসলে এর মধ্যে অতিপ্রাকৃতিক কিছুই নেই, সবটাই একেবারে জলবৎ তরলম্। তুমি যখন হাতটাকে ওটার উপরে রাখো, নিকটবর্তী বাতাস হাতের সান্নিধ্যে এসে গরম হয়ে উপরে উঠে গিয়ে কাগজের গায়ে চাপ দিয়ে তাকে ঘোরাতে থাকে। ঈষৎ ভাঁজ করা অবস্থার জন্যই কাগজটা ঘোরে ঠিক যেমনটি ঘটে বাতির উপরে রাখা প্যাঁচানো কাগজের বেলায়।

ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে কাগজের টুকরোটা সব সময়েই শুধু একই দিকে ঘুরছে—কব্জি থেকে আঙুলের ডগার দিকে। তার কারণ আঙুলের ডগা সর্বদাই হাতের তালুর থেকে ঠাণ্ডা থাকে, ফলে আঙুলের ডগার তুলনায় তালুর থেকে বেশি জোরালো ঊর্ধ্বগামী বায়ুস্রোত বয়। প্রসঙ্গত, জ্বরভাব বা বেশি জ্বরাক্রান্ত কারও বেলায় কাগজের টুকরোটি অনেক বেশি জোরে ঘোরে। তোমাদের হয়তো শুনে ভাল লাগতে পারে যে, এই ঘূর্ণন, যা অনেককেই এক সময়ে হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল, সেইটাই 1876 সালে মস্কো মেডিক্যাল সোসাইটির কাছে পত্রালাপের একটি বিষয় ছিল (এন্. পি. নেচায়েভ-এর 'হাতের তাপে হালকা বস্তুর ঘূর্ণন')।

শীতকালে কোট কি তোমায় গরম করে ?

যদি বলি তোমার পশমের কোটটা তোমায় এতটুকু গরম করে না, হয়তো ভাববে আমি তোমাকে বোকা বানাবার চেষ্টা করছি। কিন্তু ধরো, যদি সেটা প্রমাণ করে দিই, তখন ? এই পরীক্ষাটা তাহলে করা দরকার। একটা সাধারণ থার্মোমিটারের পাঠ নাও। তারপর থার্মোমিটারটাকে তোমার কোটের মধ্যে জড়িয়ে রাখো কয়েক ঘণ্টার জন্য। তারপর আবার পাঠ নাও। আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। তোমার পশমের কোটটা যে তোমাকে গরম করে না, সে সম্বন্ধে কি এবার তাহলে সব সন্দেহ দূর হয়েছে ? তাহলে কি কোটটা তোমায় ঠাণ্ডা করে ? বরফ ভরা দুটো ব্যাগ নিয়ে একটাকে কোট দিয়ে জড়িয়ে রাখো আর অন্যটাকে একটা থালার মধ্যে ফেলে রাখো। এই দ্বিতীয় ব্যাগের বরফ গলে যাবার পর কোটের ঢাকা সরাও। প্রথম ব্যাগের মধ্যে বরফ গলেনি বললেই চলে। দেখতেই পাচ্ছ, কোটটা এটাকে এতটুকু গরম করে নি, উল্টে যেন মনে হচ্ছে ঠাণ্ডা করেছে কারণ, বরফটা গলতে বেশি সময় নিয়েছে।

এবার বলো, শীতকালের কোট কি তোমায় গরম করে ? গরম করা বলতে যদি আমরা তাপ পরিবহণ বুঝি, তাহলে গরম করে না। বাতি গরম করে,

স্টোভও তাই করে এবং আমাদের শরীরও সেটা করে। এরা প্রত্যেকেই তাপের উৎস। তোমার পশমের কোটটা তাপের উৎস নয়। **এর কোনো নিজস্ব তাপ নেই যে, অন্যকে দেবে। এটা শুধু আমাদের দেহকে তার নিজস্ব তাপ ত্যাগ করার ব্যাপারে বাধা দেয়।** সেই জন্যই উষ্ণ শোণিতের প্রাণী, যার শরীরটা আসলে তাপের একটা উৎস, পশমের কোট পরে যতটা গরম অনুভব করে কোট না-পরলে ততটা করে না।

ওদিকে আমাদের পরীক্ষার সময়ে আমরা যে থার্মোমিটারটি নিয়েছিলাম সেটা তাপের উৎস নয়, আর সেই জন্য সেটাকে শুধু পশমের কোট দিয়ে মুড়ে রেখেছি বলেই যে তার পাঠের পরিবর্তন ঘটবে সেটাও স্বাভাবিকভাবেই সম্ভব নয়। কোটের মধ্যে বরফটা গলতে বেশি সময় নিয়েছে, তারও কারণ হল, কোটটা তাপের পক্ষে কুপরিবাহী এবং পারিপার্শ্বিক উষ্ণতাকে ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়।

আর পাঁচটা মিহিগুঁড়ো করা জিনিসের মতো মাটির উপরকার তুষারও পশমের কোটের মতোই তাপের কুপরিবাহী এবং সেই জন্যেই তলার জমিকে তার তাপ পরিত্যাগে বাধা দেয়। তুষারের স্তরের নিচে সুরক্ষিত মাটির উষ্ণতা তাই প্রায়ই দেখা যায় খোলা জায়গার চেয়ে 10° সেণ্টিগ্রেডের মতো বেশি হয়।

সুতরাং "শীতকালে কোট কি তোমায় গরম করে ?"—এই প্রশ্নের উত্তর হল : এটা শুধু আমাদের নিজেদের গরম থাকতে সাহায্য করে, উল্টে আমরাই বরং কোটটাকে গরম করি।

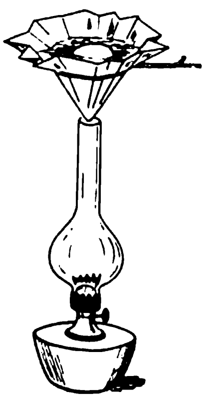
মাটির নিচে শীত-গ্রীষ্ম

মাটিতে ও তার উপরে গ্রীষ্মকাল। মাটির তিন মিটার নিচে এখন কি ঋতু ? তুমি কি ভাবছ গ্রীষ্মকাল ? ভুল করছ। এখানকার ঋতু মোটেই এক নয়, যদিও লোকে তাই ভাবতে পারে। ব্যাপারটা হল, মাটি তাপের খুব খারাপ পরিবাহী। লেনিনগ্রাদে ভয়াবহ তুষারপাতের সময়েও জল সরবরাহের পাইপ ফাটে না, কারণ সেগুলো মাটির দুই মিটার নিচে থাকে। মাটির উপরিভাগে উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি অনেক দেরীতে মাটির নিম্নবর্তী বিভিন্ন স্তরে পেঁছয়। লেনিনগ্রাদ অঞ্চলের স্লুৎস্ক নগরে প্রত্যক্ষ পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে মাটির তিন মিটার নিচে বছরের উষ্ণতম সময় 76 দিন দেরীতে পেঁছয়, অপর দিকে শীতলতম সময় 108 দিন দেরী করে ফেলে। মাটির উপরে 25শে জুলাই যদি সবচেয়ে গরম দিন হয়, তাহলে তিন মিটার নিচে সবচেয়ে গরম দিন আসবে 9ই অক্টোবর। আর 15ই জানুয়ারি যদি সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিন হয়, তাহলে পূর্বোক্ত গভীরতায় শীতলতম দিন আসবে মে মাসে। আরও নিচে আরও বেশি দেরী হয়।

আমরা যত নিচে যাই, উষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ততই কমতে থাকে। শেষপর্যন্ত একটা বিশেষ গভীরতায় উষ্ণতার আর কোনো পরিবর্তন ঘটে না, ধ্রুবক হয়ে যায়। এখানে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সারা বছর ধরেই একই উষ্ণতা বিরাজ করছে। এই উষ্ণতা আলোচ্য স্থানটির গড় বার্ষিক উষ্ণতা। প্যারিস মানমন্দিরের ভূগর্ভস্থ কুঠরীর মধ্যে, মাটির 28 মিটার নিচে ল্যাভয়সিয়ের 150 বছর আগে একটা থার্মোমিটার রেখে গেছলেন। এ অবধি তার পারদ এক চুল নড়েনি, সর্বদাই সেই একই উষ্ণতায়, শূন্যের 11·7° সেণ্টিগ্রেড উপরে দাঁড়িয়ে আছে।

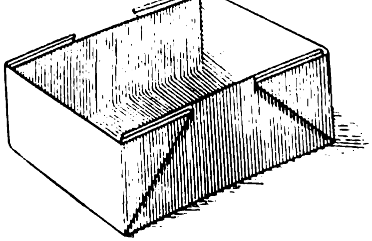
সংক্ষেপে বলা যেতে পারে: মাটির উপরকার ঋতুর সঙ্গে নিচেকার ঋতু কখনই এক হয় না। আমাদের যখন শীতকাল, মাটির তিন মিটার নিচে তখনও হেমন্তকাল। অবশ্য আমরা যেমন হেমন্তকাল পাই সেরকম নয়, কারণ উষ্ণতা সেখানে ততটা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে না। অপর দিকে আমাদের যখন গ্রীষ্মকাল, মাটির অনেক নিচে তখনও তুষারাচ্ছন্ন শীতকালের কনকনে ভাবের কিছুটা বজায় থাকে। যেমন ধরা যাক, ভূগর্ভস্থ প্রাণ, যেমন উদ্ভিদের শিকড় ও কন্দ আর গুবরে পোকার শূকদের অবস্থা নিয়ে যারা কাজ করবে, তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ কথাটা সর্বদাই মনে রাখা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ, এটা দেখে অবাক হওয়ার কোনো কারণ নেই যে, গাছের শিকড়ের কোষগুলির সংখ্যাবৃদ্ধি পায় শীতকালে এবং ক্যাম্বিয়াম নামে পরিচিত কলা বলতে গেলে প্রায় সারাটা গ্রীষ্মকালই অকেজো হয়ে থাকে। অথচ এর ঠিক উল্টোটাই ঘটে মাটির উপরে গাছের গুঁড়ির তলায়।

চিত্র 83



কাগজের পাত্রে ডিম সেদ্ধ হচ্ছে।

চিত্র 84



জল ফোটাবার একটি কাগজের পাত্র।

কাগজের পাত্র

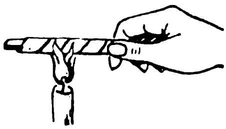
চিত্র 83-র দিকে তাকাও। কাগজের পাত্রে জলের মধ্যে একটা ডিম সিদ্ধ হচ্ছে। কাগজের তলাটা পুড়ে গিয়ে জল ছড়িয়ে পড়ে আগুন কি নিভে যাবে না? নিজে করে দ্যাখো। এক টুকরো তারের সঙ্গে লাগানো শক্ত পার্চমেণ্ট কাগজের মধ্যে ডিম ফোটাও (কিংবা আরও ভাল হয় যদি চিত্র 84-র মতো কাগজের বাক্স তৈরি করে নাও)। কাগজটার কিছুই হবে না! এর কারণ হল, উন্মুক্ত পাত্রে জলকে শুধু তার স্ফুটনাংক 100° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। তাপ গ্রহণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে জলের। জল তাই কাগজের অতিরিক্ত তাপটুকু নিজে গ্রহণ করে নেয় এবং কাগজটাকে 100° সেণ্টিগ্রেডের থেকে বেশি উত্তপ্ত হতে দেয় না। ফলে কাগজটা কখনো এমন উষ্ণতায় পেঁছয় না যে, তা জ্বলে উঠতে পারে। আগুনের শিখাও যদি লাগে তবু কাগজটা পুড়বে না।

জলের এই ধর্মই একটি চিনেমাটির কেট্‌লিকে ফেটে টুকরো টুকরো হওয়া থেকে রক্ষা করে—আমরা যদি ভুল করে জল না ভরেই কেট্‌লিটাকে উনুনের উপর ফোটাতে বসিয়ে দিই তবে কিন্তু তাই হবে। একই কারণে জল না ভরে ঝালাই-করা পাত্র কখনও আগুনের উপর বসাবে না। পুরোনো ম্যাক্সিম মেসিনগান ঠাণ্ডা করার জন্য জল ব্যবহার করা হত বলেই তাদের নলগুলো গলে যেত না।

খেলবার তাস দিয়ে তৈরী ছোট্ট একটা বাক্সের সাহায্যে তুমি সীসার টুকরো গলাতে পারো। এটা করার জন্য ঠিক শিখার উপরে বাক্সের মধ্যে সীসাটা রাখো। সীসা তাপের সুপরিবাহী বলে দ্রুত বাক্সটার তাপ শোষণ করে নেয়, ফলে বাক্সটার উষ্ণতা সীসার গলনাংক 335° সেণ্টিগ্রেডের বেশি উঠতে পারে না। এই উষ্ণতা বাক্সটায় আগুন ধরার পক্ষে মোটেই যথেষ্ট নয়।

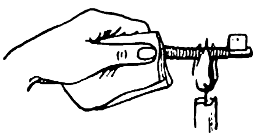
চিত্র 85-তে আরেকটা সহজ পরীক্ষা দেখানো হয়েছে। একটা মোটা পেরেক বা লোহার রড নাও—আরও ভাল হয় তামার হলে। তারপর সরু এক ফালি

চিত্র 85



যে কাগজ পোড়ে না।

চিত্র 86



যে সুতো পোড়ে না

কাগজকে টান-টান করে এটার গায়ে প্যাঁচের মতো জড়িয়ে দাও। এবার এটাকে আগুনের উপর ধরো। আগুনের শিখা কাগজটা ভেদ করে যাবে, এমন কি

কাগজ থেকে ধোঁয়াও ছাড়বে কিন্তু রঙটা তেতে লাল না হওয়া অবধি ওটা জ্বলে উঠবে না। কারণ সেই একই—ধাতুর ভাল তাপ পরিবাহিতা। কাঠের রড দিয়ে কিন্তু এ-পরীক্ষা চালানো আদৌ সম্ভব নয়। চিত্র ৪৮-তেও একই ধরনের পরীক্ষা দেখানো হয়েছে। এখানে একটা চাবির গায়ে টান্-টান্ করে প্যাঁচিয়ে নেওয়া হয়েছে এক টুকরো সুতো যেটাকে 'আগুন ধরানো যায় না।'

বরফ পিছল কেন?

ভালভাবে পালিশ করা মেঝের উপরে সহজেই পা পিছলে যায়। মেঝে পালিশ করা না হলে অতটা হয় না। তাহলে মসৃণ বরফের গা কি এবড়ো-খেবড়ো বরফের চেয়ে বেশি পিছল হবার কথা নয়? প্রত্যাশার উল্টোটাই কিন্তু ঘটে, মসৃণ বরফের চেয়ে এবড়ো-খেবড়ো বরফের উপর দিয়ে স্লেজ অনেক সহজে চলে। নিজে যদি কখনও স্লেজ টেনে থাকো তাহলে এটা নিশ্চয় তোমার নজরে পড়েছে। চকচকে বরফের চেয়ে অমসৃণ বরফ কি করে বেশি পিছল হয়। মসৃণতাই বরফের পিছল হবার কারণ নয়, চাপ বাড়ালে তার গলনাংক কমে যায় বলেই এটা ঘটে।

আমরা স্লেজ বা স্কেট করার সময় কি ঘটে দেখা যাক। স্কেটে চড়ে আমরা আমাদের শরীরের পুরো ওজনটাকে খুব ক্ষুদ্র একটা ক্ষেত্রের উপর স্থাপন করি—মাত্র কয়েক বর্গ মিলিমিটারের উপর। এই বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথা খেয়াল করলেই বুঝতে পারবে একজন লোক স্কেটে চড়লে বরফের উপর বেশ ভালরকমের চাপ পড়ে। জোরালো চাপ পড়লে বরফের গলনাংক কমে যায়। যেমন, বরফের উষ্ণতা যদি শূন্যের 5° সেন্টিগ্রেড নিচে হয় এবং স্কেট-চালকের চাপ যদি বরফের গলনাংককে 6 বা 7° কমিয়ে দিয়ে থাকে তাহলে বরফটা গলবে। তাত্ত্বিকভাবে হিসেব করে বার করা গেছে যে, যে বরফের গলনাংক এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমাবার জন্য আমাদের বেশ ভালমতো চাপ দিতে হয়—130 কেজি/সেমি^{2}। স্কেট-চালক বা স্লেজ কি এই চাপ দেবে? আমরা যদি স্কেটচালকের (বা স্লেজের) ভারকে স্কেটের ব্লেড (বা স্লেজের রানারের) তলের উপর ছড়িয়ে দিই তো দেখব চাপটা অনেক কম। এর থেকেই বোঝা যায় যে, ব্লেড বা রানারের পুরো তলটা কখনই বরফের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে না।* এর ফলে ব্লেডগুলো ও বরফের মধ্যে জলের একটা পাতলা স্তরের উদ্ভব হয়। কাজেই স্কেট-চালকের হেঁচড়ে বা পিছলে এগিয়ে যাওয়া দেখে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এবং সে এগিয়ে যাবার

---

* আমাদের তাত্ত্বিক গণনার সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যে, গলন প্রক্রিয়ার কালে বরফ এবং জল, উভয়েই সমান চাপের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যে উদাহরণের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে সেখানে বরফ-গলা জলটা কিন্তু বায়ুমণ্ডলীয় চাপের অধীনে রয়েছে। সেক্ষেত্রে বরফের গলনাংক কমাবার জন্য কম চাপের প্রয়োজন হবে।—সম্পাদক

সঙ্গে সঙ্গে আবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। স্কেটচালক ক্রমাগত জলের একটা পাতলা স্তরের উপর দিয়ে পিছলে পিছলে এগিয়ে চলে। এই ধর্ম একমাত্র বরফেরই আছে। এমন কি এক সোভিয়েত পদার্থবিদ তো এটিকে 'প্রকৃতির একমাত্র পিচ্ছিল বস্তু' আখ্যা দিয়েছিলেন। অন্য সব বস্তু মসৃণ হতে পারে কিন্তু পিছিল হয় না।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। এবড়ো-খেবড়ো বরফ মসৃণ বরফের চেয়ে বেশি পিছল কেন? আমরা আগেই জেনেছি যে, একই ভার ক্ষুদ্রতর ক্ষেত্রের উপর অবস্থান করলে বেশি চাপ দেয়। একজন লোক কখন বেশি চাপ দেয়? মসৃণ বরফের উপর? না, এবড়ো-খেবড়ো বরফের উপর? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এবড়ো-খেবড়ো বরফের উপর সে বেশি চাপ দেয়, কারণ বরফের কয়েকটা উঁচু জায়গা শুধু তার ভার বহন করে। যতই বেশি চাপ দেওয়া হয়, ততই তাড়াতাড়ি গলে বরফ এবং তার ফলে, বরফ তত বেশি পিছিল হয়ে ওঠে—অবশ্য স্লেডের রানার যদি যথেষ্ট চওড়া হয় তবেই (স্কেটের সরু ব্লেডের ক্ষেত্রে কথাটা খাটবে না. সেক্ষেত্রে গতি-শক্তি বরফের উঁচুগুলোকে ফালা ফালা করে কেটে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে)।

আমাদের আশপাশে দেখতে পাই এমন অনেক কিছুরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় গলনাংকের এই চাপ-জনিত হ্রাসপ্রাপ্তি থেকে। বরফের স্বতন্ত্র টুকরোগুলোকে একসঙ্গে সজোরে চেপে ধরলে এই জন্যই দলা পাকিয়ে এক হয়ে যায়। ছেলেরা তুষার গোলা বানিয়ে ছোঁড়ার সময়েও নিজেদের অজান্তে এই ধর্মটির সুযোগ নেয়। তুষার গোলা তৈরি করার সময়ে প্রদত্ত চাপ গলনাংক কমিয়ে দেয় বলেই তুষারের স্বতন্ত্র কণাগুলো একসঙ্গে জুড়ে যায়। তুষার-মানব তৈরি করতেও আমরা একই নীতি প্রয়োগ করি। (ধরে নিচ্ছি এ-কথা আর ব্যাখ্যা করার দরকার নেই যে, উষ্ণতা হিমাঙ্কের অনেক নিচে নেমে গেলে কেন আমরা বরফের গোলা বা বরফের মানুষ তৈরি করতে পারি না।) রাস্তার উপর অসংখ্য পথচারীর পায়ের চাপে তুষার আস্তে আস্তে কঠিন বরফের একটি অবিচ্ছিন্ন স্তর হয়ে ওঠে।

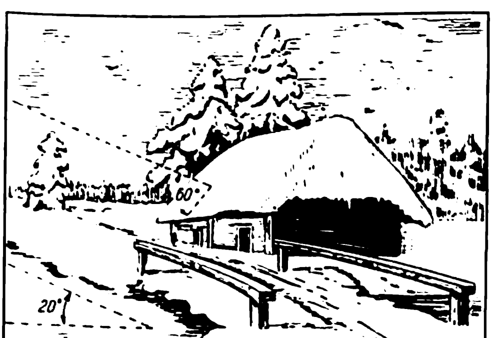
ঝুলন্ত তুষার-ঝালরের সমস্যা

ছাদের কিনারা থেকে আমরা যে তুষার-ঝালরগুলোকে ঝুলে থাকতে দেখি সেগুলো কিভাবে তৈরী হয় কখনও ভেবে দেখেছো কি? তাছাড়া কখনই বা তৈরী হয় সেগুলো? তুষারপাতের সময়ে না বরফ গলার সময়ে? বরফ গলার সময়েই যদি হয়, তাহলে শূন্যের বেশি উষ্ণতায় জল জমে কঠিন হয় কি করে? অন্যদিকে, হিমাংকের নিচেই যদি এটা ঘটে তাহলে যে ফোঁটাগুলো জমে বরফ হচ্ছে, সেই জলটা সাধারণত আসে কোত্থেকে?

দেখতেই পাচ্ছ, সমস্যাটা যতটা সহজ ভেবেছিলে, তা নয়। তুষার-ঝালর পাবার জন্য তোমার যুগপৎ দুটো উষ্ণতা প্রয়োজন—একটা শূন্যের উপরে গলনের জন্য, অন্যটা শূন্যের নিচে কঠিনীভবনের জন্য। সত্যিই ঠিক এইটাই ঘটে। ঢালু ছাদের উপরকার তুষার গলে যায় কারণ সূর্য তাকে শূন্যের অধিক উষ্ণতায় তপ্ত করে। ইতিমধ্যে ছাতের কিনারা থেকে ঝরতে থাকা ফোঁটা ফোঁটা জল জমে যায় কারণ এখানকার উষ্ণতা শূন্যের নিচে (আমরা সেইসব তুষার-ঝালরের কথা বোঝাচ্ছি না যেগুলো ছাদের নিচেকার ঘর থেকে উদ্গত উষ্ণতার কারণে সৃষ্টি হয়)।

এই ছবিটা কল্পনা করার চেষ্টা করো। রোদ ঝলমলে দিন, আকাশ পরিষ্কার। উষ্ণতা শূন্যের ঠিক এক বা দুই ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড নিচে। সবকিছুই সূর্যস্নাত হচ্ছে। সূর্যের হেলানো রশ্মি মাটির উপরের তুষার গলাবার পক্ষে যথেষ্ট জোরালো নয়। কিন্তু এই রশ্মি সূর্যের দিক্ বরাবর ঢালু ছাদের উপর এমন কোণে এসে পড়ছে যা সমকোণের নিকটতর, তাই ছাদটাকে তাতিয়ে তুলে তার উপরকার তুষার গলিয়ে দিচ্ছে। রশ্মির রেখা ও যে তলের উপর তারা আপতিত হচ্ছে, এই দুইয়ের মধ্যে কোণ যত বেশি হবে ততই সূর্যের কাছ থেকে বেশি আলো ও তাপ পাওয়া যাবে। এই কোণের সাইনের (sine) সমানুপাতে ঘটে সেটা। চিত্র 87-র ক্ষেত্রে ছাদের উপরকার তুষার মাটির উপরকার তুষারের চেয়ে 2·5 গুণ বেশি তাপ পাবে, কারণ sine 60° হল sine 20°-এর 2·5 গুণ। গলিত তুষার ফোঁটা ফোঁটা করে গলে পড়বে ছাতের কিনারা থেকে। কিন্তু কিনারার

চিত্র 87



সূর্য হেলানো ছাদটাকে মাটির চেয়ে বেশী তাতিয়ে তোলে।

নিচে উষ্ণতা শূন্যের কম বলে জলের ফোঁটাগুলো জমে যায়। ইতিমধ্যে সেগুলো কিছুটা বাষ্পায়িত হয় বলে আরও ঠাণ্ডা হয়ে থাকে। এই জমাটবাঁধা ফোঁটার উপর, তারপর আরেকটা ফোঁটা গলে পড়ে এবং সেটাও জমে যায়। তারপর আসে

তৃতীয় ফোঁটা, চতুর্থ ফোঁটা, এবং এই চলতে থাকে। ধীরে ধীরে তৈরী হয় বরফের ছোট্ট একটা লকেট। কয়েক দিন পরে, বা হয়তো সপ্তাহখানেক বাদে আবার একই ধরনের আবহাওয়া ফিরে আসে। বরফের লকেট বেড়েই চলে। ভূগর্ভস্থ গুহার মধ্যে একইভাবে চুনের স্ট্যালাকটাইটস্ ঝোলে। এইভাবেই ছাদের এবং অন্যান্য অতপ্ত বাসস্থানের কিনারায় ঝুলন্ত তুষার-ঝালর তৈরী হয়।

সূর্যরশ্মির আপতন কোণের পরিবর্তন ঘটে বলে এর থেকেও সুন্দর ঘটনা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন আবহাওয়া এবং বিভিন্ন ঋতুর সৃষ্টিরও বড় কারণ এইটাই—তবে এটাই একমাত্র কারণ নয়। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দিনের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি অথবা যে সময়টা ধরে সূর্য পৃথিবীকে উত্তপ্ত করতে থাকে। এই দুয়ের পিছনেই রয়েছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের একটাই কারণ—ক্রান্তিবৃত্তের (ecliptic) তলের সঙ্গে পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষের আনতি। ব্যবহারিক দিক থেকে গ্রীষ্মের সময়ে সূর্য আমাদের কাছ থেকে যত দূরে থাকে ঠিক ততটাই থাকে শীতকালে—দুটি মেরুর কাছ থেকে সূর্যের দূরত্ব আর বিষুবরেখা থেকে তার দূরত্ব প্রায় সমান। পার্থক্য যেটুকু তা এতই কম যে পুরোপুরি অবহেলা করা যায়। কিন্তু সে যাইহোক, মেরু অঞ্চলের চেয়ে বিষুবরেখার কাছে সূর্য-রশ্মির আপতন কোণ বড় হয় এবং গ্রীষ্মকালেও এই আপতন কোণ শীতকালের চেয়ে বেশি থাকে। এই ঘটনার জন্যই উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি প্রবল হয় এবং তার ফলেই সাধারণভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তনও ঘটে।

পরিচ্ছেদ ৭

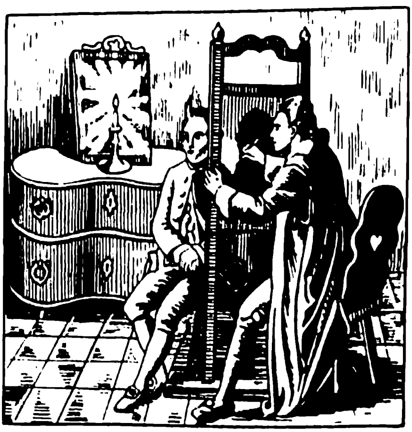
আলো

বন্দী ছায়া

আমাদের পূর্বপুরুষরা তাঁদের ছায়াকে ধরতে না পারলেও কিছু কিছু কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। তাঁরা সিল্যুয়েট বা ছায়াচিত্র তৈরি করতেন। আজকের দিনে নিজের ছবি কি বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়ের ছবি তোলাতে হলে আমরা আলোকচিত্রীর (ফটোগ্রাফারের) কাছে যাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কিন্তু কোনো আলোকচিত্রী ছিল না। প্রতিকৃতি চিত্রকররা চড়া দাম চাইতেন কাজ করার জন্য এবং কেবল বড়লোকরাই শুধু সে দাম দিতে পারতেন। সেই জন্যই সিল্যুয়েটের এত ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। আজকাল যেমন আমরা ক্যামেরার স্ন্যাপ-শট নিই, সেই প্রয়োজনের কিছুটা সেকালে এইভাবেই মিটত।

আসলে সিল্যুয়েট হল বন্দী ছায়া। যান্ত্রিক উপায়েই সেটা পাওয়া যেত এবং সেদিক থেকে বলাই যেতে পারে যে, ছায়াচিত্রের সঙ্গে ছায়াচিত্রের বিপরীত—আলোকচিত্রের একটা সাদৃশ্য রয়েছে। আলোকচিত্রী বা ফটোগ্রাফাররা আলোর

৪৪ চিত্র

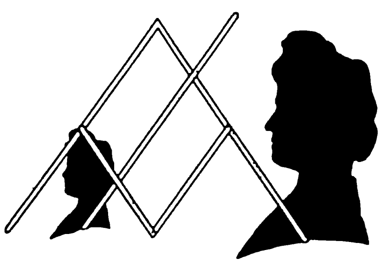


ছায়া প্রতিকৃতি তৈরি করার পুরনো পদ্ধতি।

(আলোর গ্রীক প্রতিশব্দ 'ফটোস') সাহায্য নেন ছবি তৈরি করার জন্য, আর আমাদের পূর্বপুরুষরা সেই একই কাজে লাগাতেন ছায়াকে ।

৪৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে কিভাবে সিলুয়েট তৈরি করা হত । চিত্র আঁকানোর জন্য যে বসত, মাথাটাকে এমনভাবে ঘুরিয়ে রাখত যাতে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য-গুলো একটা প্রান্তরেখা বরাবর কোনো পর্দায় নিক্ষিপ্ত হয়, এবং এই প্রান্তরেখাটির উপর পেন্সিল বুলিয়ে নেওয়া হত । তারপর পর্দার প্রান্তরেখার মধ্যবর্তী অংশ কালো দিয়ে ভরিয়ে ফেলে ছবিটাকে কেটে বার করে নিয়ে সাদা জমির উপর আঠা দিয়ে এঁটে দেওয়া হত । একেই বলা হত সিলুয়েট । যখনই প্রয়োজন পড়ত, প্যান্টোগ্রাফ নামে বিশেষ এক পদ্ধতির সাহায্যে সিলুয়েটটিকে ছোট করে নেওয়া হত (চিত্র 89) ।

চিত্র 89



এইভাবে সিলুয়েটকে ছোট করা হয় ।

চিত্র 90



শিলারের একটি সিলুয়েট (1790) ;

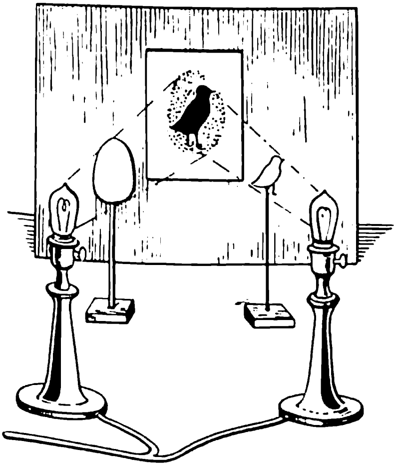
একথা ভাবার কোনো কারণ নেই যে. এই সরল কালো প্রান্তরেখা পার্শ্ব-দৃষ্টিতে একজনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যসুলভ দিকগুলো ফুটিয়ে তুলতে পারত না । ভাল সিলুয়েটের সঙ্গে কখনও কখনও মূল চরিত্রের বিস্ময়কর সাদৃশ্য থাকে ।

ব্যাপারটা কিছু শিল্পীকে আকৃষ্ট করে, তাঁরা এইভাবে ছবি আঁকা শুরু করেন, এবং একটা নতুন ধারারই পত্তন হয় তখন । শব্দটার উৎপত্তিও জানবার মতো । অষ্টাদশ শতাব্দীর ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী ইতেন্ দ্য সিলুয়েত-এর নাম থেকে শব্দটি জন্ম নেয় । তিনি অমিতব্যয়ী স্বদেশবাসীকে ব্যয়সংকোচ করতে বলতেন এবং ছবি ও প্রতিকৃতির পিছনে অর্থের অপচয় করার জন্য অভিজাত শ্রেণীর কাছে পুনর্বিবেচনার আবেদন করেছিলেন । অল্প খরচে ছায়া প্রতিকৃতি তৈরী হয় বলেই নাম দেওয়া হয়েছিল—"a la silhoutte ।"

ডিমের মধ্যে ছানা

ছায়ার ধর্মগুলো থেকে তুমি ঘরের মধ্যে মজার একটা খেলা দেখাতে পারো। এক টুকরো তৈলাক্ত কাগজ নাও এবং এক টুকরো কার্ডবোর্ডের মধ্যে বর্গাকারে কাটা গর্তের উপর এটাকে পরদার মতো সেটে দাও। পর্দার পিছনে দুটো ঢাকনা খোলা টেবিল ল্যাম্প বসিয়ে রাখো, এবার তোমার বন্ধুদের বসতে বলো

চিত্র 91



লোক-ঠকানো এক্স-রে

পর্দার সামনে। বাঁ দিকের টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দাও। এক টুকরো তারের উপর ডিম্বাকারে কাটা এক টুকরো কার্ডবোর্ড চড়িয়ে দিয়ে সেটাকে বসিয়ে দাও পর্দা আর জ্বলন্ত টেবিল ল্যাম্পের মাঝখানে। তোমার বন্ধুরা স্বাভাবিকভাবেই একটা ডিমের ছায়া দেখবে। ডানদিকের আলোটা এখনও জ্বালা হয়নি। এবার বন্ধুদের বলো, তোমার কাছে একটা এক্স-রে যন্ত্র আছে যেটা ডিমের মধ্যে ছানাটাকে দেখিয়ে দেবে। এই—লাগ ভেল্কি। বলা মাত্র তোমার বন্ধুরা দেখবে ডিমের ছায়াটা হালকা হয়ে গেছে এবং তার মাঝখানে একটা ছানার মোটামুটি স্পষ্ট প্রান্তরেখা ফুটে উঠেছে (চিত্র 91)।

পুরো ব্যাপারটাই খুব সহজ। ডানদিকের আলোটা জ্বালিয়ে দাও। এই আলো ও পর্দার মাঝখানে রাখা আছে কার্ডবোর্ডের তৈরী একটা ছানা। ছানার ছায়াটা যে ডিম্বাকৃতি ছায়ার উপরে এসে পড়েছে, তার উপর আবার ডানদিকের আলোও কিছুটা পড়েছে। এই জন্যই ডিমের প্রান্ত রেখাটা একটু হালকা হয়ে আসবে। তোমার বন্ধুরা তো তোমার এইসব কারিকুরি কিছুই দেখতে পাবে

অলঙ্করণে, কার্পেটে আর ওয়ালপেপারের নকশার হেরফের করার জন্য এবং সাধারণভাবে যে কোনো বাহারী মোটিফের ইচ্ছামতো যে কোনো দিকে সংকোচন বা প্রসারণ ঘটানোর জন্য।

সূর্যোদয়ের সমস্যা

ধরো ভোরবেলা ঠিক পাঁচটায় সূর্যোদয় দেখার জন্য তুমি সকাল সকাল উঠে পড়েছ। আলোর অগ্রগতি তাৎক্ষণিকভাবে ঘটে না, তাই উৎস থেকে আলোক এসে তোমার চোখে পৌঁছবার আগে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হবে। তাই আমার প্রশ্ন হল ঃ আলোকের অগ্রগতি তাৎক্ষণিক হলে তুমি কখন সূর্যোদয় দেখতে ?

সূর্য থেকে পৃথিবীতে পৌঁছতে আলোর আট মিনিট লাগে, তাই লোকে ভাবতে পারে যে, আলোর অগ্রগতি তাৎক্ষণিক হলে আমরা আট মিনিট আগে, অর্থাৎ সকাল 4:52-য় সূর্যোদয় দেখতাম। এ কথা যদি ভেবে থাকো তাহলে তোমাকে চমকে দিয়ে বলব—উত্তরটা পুরোপুরি ভুল। পৃথিবী যখন 'ইতিমধ্যেই আলোকিত মহাকাশের' দিকে মুখ ফেরায় তখনই সূর্যের 'উদয়' ঘটে। কাজেই আলোর অগ্রগতি যদি তাৎক্ষণিকও হত, তবু আমরা ওই সকাল 5-টাতেই সূর্যোদয় দেখতাম।

আমরা যদি 'বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ' নামে পরিচিত ব্যাপারটাকে বিবেচনার মধ্যে ধরি তাহলে আরও আশ্চর্য কিছু পাব। প্রতিসরণ আলোর পথকে বাঁকিয়ে দেয়, তার ফলে দিগন্তের উপরে সত্যিই সূর্য ওঠার আগেই আমরা সূর্যের 'উদয়' দেখতে পাই। কিন্তু আলোর অগ্রগতি যদি তাৎক্ষণিক হত তাহলে কোনো প্রতিসরণ ঘটত না। প্রতিসরণ যে ঘটে তার কারণ হল বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্য দিয়ে আলোর বিভিন্ন বেগে অগ্রসর হওয়া। এবং যদি প্রতিসরণ না ঘটে তো, আমরা সূর্যকে একটু পরে উঠতে দেখব। এই দেরী দু মিনিট থেকে বেশ কয়েকদিন এবং তারও বেশি হতে পারে (মেরু অক্ষরেখায়), কারণ সেটা নির্ভর করবে অক্ষাংশ, বায়ুর উষ্ণতা ও আরও কিছু বিষয়ের উপর। কাজেই আলোর অগ্রগতি যদি তাৎক্ষণিক হত তাহলে আমরা যখন সূর্যোদয় দেখি, তারও কিছু পরে দেখতাম। ভারী অদ্ভুত হেঁয়ালি, তাই নয় !

অবশ্যই ব্যাপারটা অন্য রকম হত যদি তুমি দূরবীক্ষণে চোখ লাগিয়ে সৌর-স্ফীতি পর্যবেক্ষণ করতে। তখন—অর্থাৎ, আলোর অগ্রগতি যদি তাৎক্ষণিক হত, তুমি সেটা আট মিনিট আগে দেখতে পেতে।

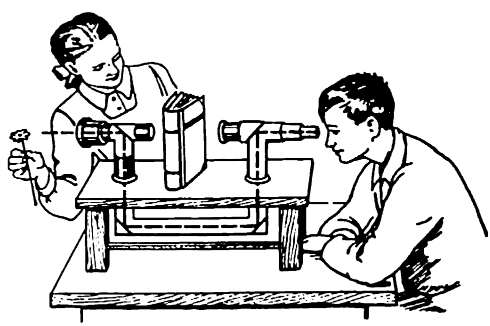
পরিচ্ছেদ ৮

প্রতিফলন ও প্রতিসরণ

দেওয়ালের মাঝ দিয়ে দেখা

1890-এর দশকে অদ্ভুত একটা জিনিস কিনতে পাওয়া যেত যার গাল-ভরা নাম ছিল 'এক্স-রে যন্ত্র'। বেশ মনে পড়ে তখন আমি স্কুলে পড়ি, সেই প্রথম

চিত্র 95



একটি লোক-ঠকানো এক্স-রে যন্ত্র।

অভিনব জিনিসটাকে দেখে আমি ভারী অবাক হয়ে গেছলাম। এর সাহায্যে অসচ্ছ (opaque) বস্তুর ভেতর দিয়েও আমি আলো দেখতে পেয়েছিলাম। শুধু যে মোটা কাগজের ভেতর দিয়ে তাই নয়—ছুরির ফলার ভেতর দিয়েও দেখেছি। সত্যিকারের এক্স-রে কিন্তু ছুরির ফলা ভেদ করতে পারে না। 95 নং চিত্রে যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে সেটা আমার বিবৃত অদ্ভুত দর্শন যন্ত্রটার নকল। দেখলেই ব্যাপারটার ছলা-কলা ধরা পড়ে যায়। এর মধ্যে যে 45° কোণে হেলানো চারটে আয়না আছে তা দিয়ে লক্ষ্যবস্তু থেকে আগত রশ্মিগুলোকে প্রতিফলিত ও পুনঃ প্রতিফলিত করে অসচ্ছ বাধা পার করে নিয়ে যাওয়া যায়।

সামরিক বাহিনীতেও এই ধরনের একটা যন্ত্রের খুব ব্যবহার হয়। পেরিস্কোপ (চিত্র 96) নামে এই যন্ত্রটার সাহায্যে সৈন্যরা শত্রুদের গতিবিধির উপর নজর রাখে অথচ নিজেদের শত্রুর গোলাগুলির মধ্যে পড়তে হয় না। পেরিস্কোপের

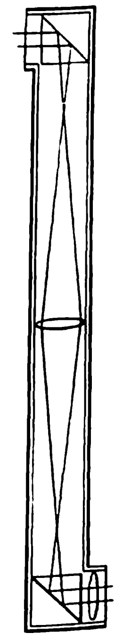
ফুটো দর্শকের চোখ থেকে যত দূরে সরে যায়, ততই সংকুচিত হয়ে ওঠে দৃশ্যের সীমানা। দৃশ্যের সীমানা প্রসারিত করার জন্য আলোক-লেন্সের এক বিশেষ ধরনের সমন্বয় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পেরিস্কোপের মধ্যে যে আলো ঢোকে তার অংশবিশেষ শোষিত হয় এই লেন্সে, ফলে প্রতিবিম্ব ঝাপসা দেখায়। এই জন্য খুব বেশি হলেও পেরিস্কোপের উচ্চতা কুড়ি মিটারের চেয়ে বাড়ানো সম্ভব হয় না। আর এতেই তো ছাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। এর চেয়ে লম্বা

চিত্র 96



পেরিস্কোপ।

চিত্র 97



সাবমেরিন পেরিস্কোপের নকশা।

টেলিস্কোপের প্রতিবিম্ব ঝাপসা হয় এবং দৃশ্যের সীমাও সংকীর্ণ হয়ে আসে। তার উপর আবহাওয়া মেঘলা হলে তো কথাই নেই।

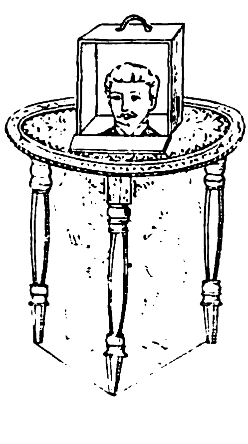
সাবমেরিনের পরিচালকরাও শত্রু জাহাজ আক্রমণ করার সময়ে পেরিস্কোপেই এদের দেখে। সামরিক বাহিনীর পেরিস্কোপের তুলনায় এটি অনেক জটিল। জলের নিচে থাকার সময় এর মুখটা শুধু জেগে থাকে। কার্যপ্রণালীর দিক থেকে দুই এক, এর মধ্যেও আয়নাগুলো (বা প্রিজম) একইভাবে সাজানো থাকে (চিত্র 97)।

কাটা মুণ্ডু কথা বলে

সাদাসিধে মানুষ প্রায়ই এই ধরনের খেলা দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে যায়। সত্যিই তো একটা ডিশের উপর রাখা ঠিক মানুষের মতোই দেখতে একটা কাটা মুণ্ডু যদি চোখ পিটপিট করে, কথা বলে এবং খাওয়া-দাওয়া করে, অবাক হবে না-ই বা কেন। যে টেবিলটার উপর মুণ্ডুটা রাখা হয় তার একেবারে কাছে কাউকে যেতে না দিলেও সবাই স্পষ্ট দেখতে পায়, টেবিলের নিচে কিছুই নেই। এই রকম কোনো খেলার আসরে যদি তোমার যাবার সুযোগ হয়, এক টুকরো কাগজ পাকিয়ে বলের মতো করে নিয়ে সেটাকে টেবিলের তলায় ছুঁড়ে দিও। দেখে অবাক হবে, কাগজটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। রহস্যটা আর রহস্য রইল না—একটা আয়নার গায়ে ধাক্কা খেয়ে কাগজের বলটা ফিরে এসেছে। বলটা টেবিলের কাছে না পৌঁছলেও ক্ষতি নেই, কারণ এর প্রতিফলন দেখেই তুমি ধরে নিতে পারবে যে ওখানে একটা আয়না আছে।

টেবিলের একটা পা থেকে আরেকটা পা অবধি জায়গাটুকু জুড়ে যদি একটা আয়না থাকে তাহলেই লোকের ভুল ধারণা জন্মাবে যে টেবিলের নিচে কিছু নেই। অবশ্য ঘরের আসবাব বা দর্শকদের প্রতিফলন ঘটলে চলবে না। এইজন্যেই ঘরটা একেবারেই ফাঁকা থাকা দরকার এবং দেওয়ালগুলো এক রকম হওয়া উচিত।

চিত্র ৭৪



কাটা মুণ্ডুর রহস্য।

মেঝের রঙেও কোনো হেরফের বা নকশা থাকা চলবে না। দর্শকদেরও বসাতে হবে ভদ্রজনোচিত দূরত্বে। দেখতেই পাচ্ছ যে, এর মধ্যে রহস্যের কোনো বালাই নেই, কিন্তু ব্যাপারটা না জানলে একেবারে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

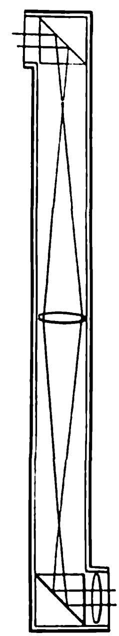
ফুটো দর্শকের চোখ থেকে যত দূরে সরে যায়, ততই সংকুচিত হয়ে ওঠে দৃশ্যের সীমানা। দৃশ্যের সীমানা প্রসারিত করার জন্য আলোক-লেন্সের এক বিশেষ ধরনের সমন্বয় ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পেরিস্কোপের মধ্যে যে আলো ঢোকে তার অংশবিশেষ শোষিত হয় এই লেন্সে, ফলে প্রতিবিম্ব ঝাপসা দেখায়। এই জন্য খুব বেশি হলেও পেরিস্কোপের উচ্চতা কুড়ি মিটারের চেয়ে বাড়ানো সম্ভব হয় না। আর এতেই তো ছাদের কাছে পৌঁছে গেলাম। এর চেয়ে লম্বা

চিত্র 96



পেরিস্কোপ।

চিত্র 97



সাবমেরিন পেরিস্কোপের নকশা।

টেলিস্কোপের প্রতিবিম্ব ঝাপসা হয় এবং দৃশ্যের সীমাও সংকীর্ণ হয়ে আসে। তার উপর আবহাওয়া মেঘলা হলে তো কথাই নেই।

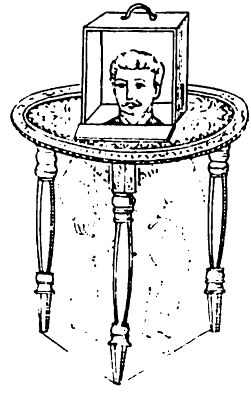
সাবমেরিনের পরিচালকরাও শত্রু জাহাজ আক্রমণ করার সময়ে পেরিস্কোপেই এদের দেখে। সামরিক বাহিনীর পেরিস্কোপের তুলনায় এটি অনেক জটিল। জলের নিচে থাকার সময় এর মুখটা শুধু জেগে থাকে। কার্যপ্রণালীর দিক থেকে দুই এক, এর মধ্যেও আয়নাগুলো (বা প্রিজম) একইভাবে সাজানো থাকে (চিত্র 97)।

কাটা মুণ্ডু কথা বলে

সাদাসিধে মানুষ প্রায়ই এই ধরনের খেলা দেখে একেবারে তাজ্জব হয়ে যায়। সত্যিই তো একটা ডিশের উপর রাখা ঠিক মানুষের মতোই দেখতে একটা কাটা মুণ্ডু যদি চোখ পিটপিট করে, কথা বলে এবং খাওয়া-দাওয়া করে, অবাক হবে না-ই বা কেন। যে টেবিলটার উপর মুণ্ডুটা রাখা হয় তার একেবারে কাছে কাউকে যেতে না দিলেও সবাই স্পষ্ট দেখতে পায়, টেবিলের নিচে কিছুই নেই। এই রকম কোনো খেলার আসরে যদি তোমার যাবার সুযোগ হয়, এক টুকরো কাগজ পাকিয়ে বলের মতো করে নিয়ে সেটাকে টেবিলের তলায় ছুঁড়ে দিও। দেখে অবাক হবে, কাগজটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে। রহস্যটা আর রহস্য রইল না—একটা আয়নার গায়ে ধাক্কা খেয়ে কাগজের বলটা ফিরে এসেছে। বলটা টেবিলের কাছে না পৌঁছলেও ক্ষতি নেই, কারণ এর প্রতিফলন দেখেই তুমি ধরে নিতে পারবে যে ওখানে একটা আয়না আছে।

টেবিলের একটা পা থেকে আরেকটা পা অবধি জায়গাটুকু জুড়ে যদি একটা আয়না থাকে তাহলেই লোকের ভুল ধারণা জন্মাবে যে টেবিলের নিচে কিছু নেই। অবশ্য ঘরের আসবাব বা দর্শকদের প্রতিফলন ঘটলে চলবে না। এইজন্যেই ঘরটা একেবারেই ফাঁকা থাকা দরকার এবং দেওয়ালগুলো এক রকম হওয়া উচিত।

চিত্র ৭৪



কাটা মুণ্ডুর রহস্য।

মেঝের রঙেও কোনো হেরফের বা নক্‌শা থাকা চলবে না। দর্শকদেরও বসাতে হবে ভদ্রজনোচিত দূরত্বে। দেখতেই পাচ্ছ যে, এর মধ্যে রহস্যের কোনো বালাই নেই, কিন্তু ব্যাপারটা না জানলে একেবারে তাজ্জব হয়ে যেতে হয়।

কখনও কখনও আরও মজা করে খেলা দেখানো হয়। প্রথমে যাদুকর একটা ফাঁকা টেবিল দেখায় যার উপরে বা নিচে কিছুই থাকে না। তারপর নিয়ে আসা হয় একটা বন্ধ বাক্স। সবাই ভাবে এর মধ্যে বুঝি জ্যান্ত কাটা মুণ্ডুটা আছে, কিন্তু ডালা খুলতেই দেখা যায় তার ভেতরে কিছুই নেই। যাদুকর বাক্সটাকে এবার টেবিলের উপর রেখে সামনের ডালাটা খোলে। সঙ্গে সঙ্গে কথা বলে ওঠে কাটা মুণ্ডু! কী কাণ্ড! ব্যাপারটা হয়ত আন্দাজ করতে পেরেছ। টেবিলের উপরে একটা গুপ্ত দরজা আছে। খালি বাক্সটার তলায় কোনো ঢাকনা থাকে না, সেটা টেবিলে বসানোর পর টেবিলের নিচে যে লোকটা ঘাপটি মেরে বসেছিল, সে ওই দরজা দিয়ে মাথাটা উপর দিকে বার করে দেয় (চিত্র 98)। এই খেলাটা অন্য রকম ভাবেও দেখানো যায়। সেগুলো তুমি হয়তো নিজেই বার করতে পারবে।

সামনে না পিছনে

গৃহস্থালী এমন অনেক জিনিস আছে যার ঠিক মতো ব্যবহার হয় না। আগেই বলেছি যে পানীয়কে ঠাণ্ডা করার সময়ে অনেকে ঠিক মতো বরফ ব্যবহার করতে পারে না। পানীয়কে বরফের তলায় না রেখে তার উপরে বসিয়ে দেয়। আয়নাকে ঠিক কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেটাও সকলে জানে না। প্রায়ই দেখা যায় নিজের উপর আলো পড়ে এইভাবে বাতিটাকে স্থাপন না করে, লোকে সেটা পেছনে রাখে যাতে আয়নায় তার প্রতিফলন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই কাণ্ড মেয়েদের মধ্যে অনেকেই করে, তাই আমার মেয়ে-পাঠকদের বলছি, আয়না ব্যবহার করার সময়ে এবার থেকে আলোটা যেন তারা নিজেদের সামনে রাখে।

আয়না কি দেখা যায়?

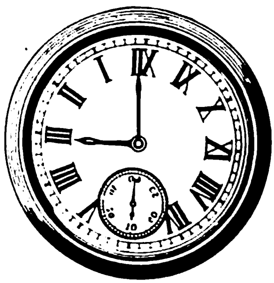
প্রত্যেকেই প্রত্যেকদিন আয়না ব্যবহার করে কিন্তু তবু এই প্রশ্নের উত্তর ঠিক মতো দিতে পারে না। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, সাধারণ আয়না সম্বন্ধে আমরা যা জানি সেটা যথেষ্ট নয়। আয়না দেখতে পায় বলে যারা ভাবে তারা ভুল করে। ভাল পরিষ্কার আয়না অদৃশ্য হয়। আয়নার ফ্রেম, কিনারা ও আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত যা কিছু সবই দেখা যায় কিন্তু আয়না যদি খুব নোংরা না হয় সেটাকে কখনই দেখা যায় না। বিচ্ছুরণকারী তল আলোকে সব দিকে ছড়িয়ে দেয় কিন্তু প্রতিফলনকারী তলের চরিত্র এর বিপরীত, সেটাকে দেখা যায় না। সাধারণত প্রতিফলনকারী তল মসৃণ হয় আর বিচ্ছুরণকারী তল অমসৃণ। কাটামুণ্ডু জাতীয় খেলায় আয়না ব্যবহার করে যত রকম খেলা ও চোখের ধাঁধা দেখানো হয়, সবগুলোই নির্ভর করে আয়নার অদৃশ্য চরিত্রের উপর। দেখার মধ্যে আয়নায় শুধু বিভিন্ন বস্তুর প্রতিফলনই দেখা যায়।

আয়নায় দেখা

অনেকেই বলবে, আয়নার দিকে তাকালে আমরা নিজেদের দেখতে পাই। কেউ কেউ আরও বলবে, আমরা আয়নায় আমাদের অবিকল প্রতিরূপ দেখতে পাই।

এই কথাটা পরীক্ষা করে দেখা যাক। ধরো তোমার ডান গালে একটা তিল আছে। আয়নায় যে লোকটাকে দেখবে তার বাঁ গালে তিল। তুমি হয়তো চুল ডান কাতে আঁচড়াচ্ছ, তোমার প্রতিবিম্ব কিন্তু বাঁ কাতে আঁচড়াবে। হয়তো তোমার ডানদিকের ভুরুটা বাঁ দিকের চেয়ে একটু উঁচু এবং ঘন, আয়নায় তোমার জুড়িটির বেলায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। তুমি হয়তো ডান পকেটে পকেট ঘড়ি ও বাঁ পকেটে

চিত্র 99



আয়নায় পাওয়া।

মানিব্যাগ রাখো, তোমার ঐ নকলের অভ্যাস হবে ঠিক তার উল্টো। ওর ঘড়ির ডায়ালটা লক্ষ্য করো। তোমার ঘড়ির সঙ্গে এর কোনো মিলই নেই। সংখ্যাগুলো আর তাদের সজ্জা ভারী অস্বাভাবিক। এর মধ্যে আট লেখা হয়েছে, একেবারে অভিনব কায়দায়—IIX, যা আগে কখনো দেখা যায় নি। তাছাড়া ওটা রয়েওছে বারো-র জায়গায়। ওদিকে ঘড়িতে বারো-কে দেখাই যাচ্ছে না। ছয়ের পর আসছে পাঁচ, চার ইত্যাদি। আয়নার এই ঘড়িটার কাঁটা দুটোও চলে উল্টো দিকে।

সব চেয়ে লক্ষণীয় যা তা হল আয়নায় তোমার জোড়ের কিন্তু একটা শারীরিক ত্রুটি আছে। খুব সম্ভবতঃ তোমার সেটা নেই। আয়নার লোকটা ন্যাটা। সে বাঁ হাতে লেখে, সেলাই করে এবং খায়। এবং সে বাঁ হাত বাড়িয়ে দেবে তোমার ডান হাতের সঙ্গে করমর্দন করার সময়ে। আচ্ছা, আয়নার লোকটা কি হরফ চেনে? তার অক্ষর জ্ঞানটা কিন্তু খুবই অদ্ভুত ধরনের। তার হাতে ধরা বইটার কিংবা তার বাঁ হাতের হিজিবিজির একটা শব্দও তুমি বুঝতে পারবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

10-01181

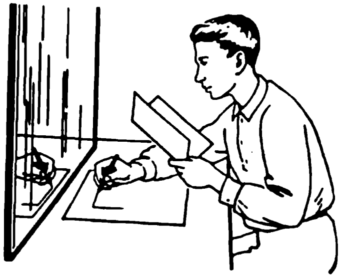
এই লোকটাই কি-না তোমার অবিকল নকল বলে দাবি করে, তুমি কি-না বলো এই লোকটা ঠিক তোমার মতো দেখতে !

ঠাট্টার কথা থাক, কিন্তু তুমি যদি ভাব আয়নার দিকে তাকিয়ে তুমি নিজেকেই পর্যবেক্ষণ করছ তাহলে ভুল করছ। বেশির ভাগ লোকেরই মুখ, শরীর এবং পোশাক ডানে-বাঁয়ে এক রকম হয় না। এটা কিন্তু সাধারণত আমরা খেয়াল করি না। আয়নায় তোমার বাঁ পাশটা, তোমার ডান পাশের সব বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করে। আর ডানটা করে বাঁয়ের। কাজেই আয়নায় তোমার প্রতিফলনে যে-তুমি ধরা পড়ো সে সত্যিকারের তুমি থেকে অনেকখানিই আলাদা।

আয়নার সামনে আঁকা।

এই কাজটা করলে তুমি ও তোমার প্রতিফলনের মধ্যে যে পুরোপুরি মিল নেই, সেটা আরও ভালভাবে ধরা পড়বে। টেবিলের উপর খাড়া করে বসানো একটা আয়নার সামনে বসো।

চিত্র 100



আয়নায় দেখে আঁকা।

এবার এক টুকরো কাগজ নিয়ে শুধু হাতের প্রতিফলনের উপর নজর রেখে ওর পরস্পর ছেদী কর্ণ সমেত একটা আয়তক্ষেত্র আঁকার চেষ্টা করো। আপাত ভাবে এই সহজ কাজটাই দারুণ শক্ত হয়ে উঠবে।

আমরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের দেখা ও অঙ্গ সঞ্চালনের অনুভূতির মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আয়না এই সুশৃংখল সম্পর্কটাকে ভঙ্গ করে, কারণ আয়নাটা আমাদের সচল হাতের একটা বিকৃত প্রতিবিম্বকে পেশ করে। তোমার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে তোমার অভ্যাস প্রতিবাদ করবে। তুমি ডানদিক টেনে একটা লাইন টানতে চাও কিন্তু তোমার হাত পেন্সিলটাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইবে বাঁদিকে। এই ভাবে তুমি যদি আরও জটিল ছবি আঁকতে বা কিছু লিখতে যাও, তাহলে আরও অদ্ভুত ফল পাবে। সমস্ত জিনিসটাকে এমন গুলিয়ে ফেলবে যে দারুণ মজার ব্যাপার হবে।

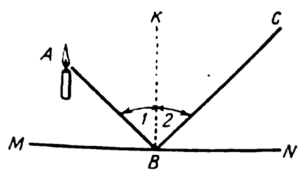
ব্লটিং পেপারের উপর কালির ছোপগুলোও তোমার হাতের লেখার আয়নায় দেখা প্রতিসম প্রতিফলনের সামিল। কিন্তু একবার পড়ার চেষ্টা করে দ্যাখো। একটা শব্দও বুঝতে পারবে না, এমন কি অক্ষরগুলো যদি স্পষ্টও দেখা যায় তবুও নয়। লেখাগুলো বাঁদিকে হেলে থাকবে এবং টানগুলো সব উল্টো-পাল্টা। অবশ্য এই হিজিবিজি আয়নার সামনে ধরলেই আবার তোমার পরিচিত হাতের লেখা দেখতে পাবে। আসলে আয়নাটা তোমাকে তোমার হাতের লেখার প্রতিসম প্রতিফলনের প্রতিসম প্রতিফলন দেখায়।

সব চেয়ে ছোট ও সব চেয়ে দ্রুত

সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় অগ্রসর হয়, অর্থাৎ সম্ভাব্য দ্রুততম রাস্তায় এগিয়ে চলে। আয়না থেকে প্রতিফলিত হবার সময়েও আলো দ্রুততম পথ বেছে নেয়। এই গতিপথটা অনুসরণ করে দেখা যাক। চিত্র 101 এ A মোমবাতিটা হচ্ছে আলোর উৎস, MN একটি আয়না, এবং ABC হচ্ছে A থেকে চোখ C অবধি আলোর পথ। সরলরেখা KB হচ্ছে MN-এর উপর লম্ব।

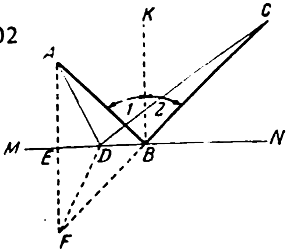
আলোক-বিদ্যার সূত্র অনুসারে প্রতিফলন কোণ-2, আপতন কোণ 1-এর সমান। এ কথাটা জানা থাকলে আমরা খুব সহজেই প্রমাণ করতে পারব যে, MN আয়না থেকে প্রতিফলিত হবার সময়ে আলোক রশ্মি A থেকে C-এর মধ্যে যতগুলি পথ ধরতে পারে তার মধ্যে ক্ষুদ্রতম হল ABC। কথাটা যে সত্যি

চিত্র 101



প্রতিফলনের কোণ 2 হচ্ছে আপতনের কোণ 1-এর সমান।

চিত্র 102



প্রতিফলিত আলো হ্রস্বতম পথ নির্বাচন করে।

সেটা প্রমাণ করার জন্য আমরা ABC-র সঙ্গে একটি অন্য কোনো পথ, ধরা যাক ADC-র তুলনা করব (চিত্র 102)। A বিন্দু থেকে MN-এর উপরে AF লম্ব টানো এবং সেটা যতক্ষণ না বর্ধিত BC রশ্মিকে F বিন্দুতে ছেদ করছে, লম্বটাকে বাড়িয়ে চলো। তারপর একটা সরলরেখা টেনে F এবং D বিন্দু যোগ করো। এবার প্রথমে দেখা যাক, ABF ও EBF ত্রিভুজ দুটি সমান কি না।

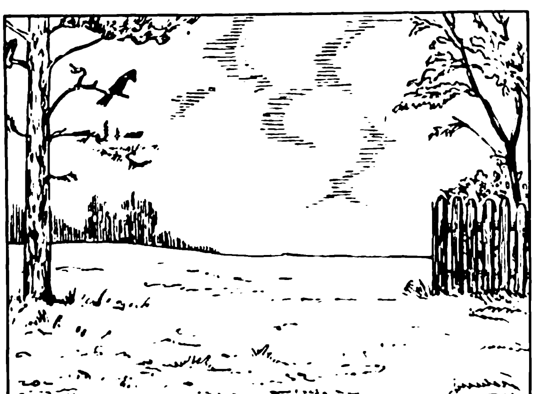
দুটোই সমকোণী ত্রিভুজ এবং দুটোরই সাধারণ বাহু FB রয়েছে সমকোণ লগ্ন হয়ে। তাছাড়া EFB ও EAB কোণ দুটিও সমান, কারণ এরা যথাক্রমে কোণ-2 এবং 1-এর সমান। ফলে AE হচ্ছে EF এর সমান। আবার যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ AED এবং EDF-এর সমকোণ সংলগ্ন বাহু দুটো পরস্পর সমান সেই হেতু ত্রিভুজ দুটিও সমান। অতএব AD, DE-এর সমান। তাই পথটা ABC-এর বদলে আমরা CBF-কেও ভাবতে পারি, কারণ AB হচ্ছে FB-র সমান। একই ভাবে ADC পথের বদলে ভাবা যেতে পারে CDF পথটা। CBF ও CDF তুলনা করে দেখা যায়, সরলরেখা CBF-এর দৈর্ঘ্য রেখা CDF-এর চেয়ে কম। কাজেই, ABC পথ ADC-র চেয়ে ছোট। সুতরাং বক্তব্য প্রমাণিত!

D বিন্দুর অবস্থান যেখানেই হোক না কেন, ABC পথের দৈর্ঘ্য ADC-র চেয়ে সব সময়েই কম হবে, অবশ্য প্রতিফলন কোণ যদি আপতন কোণের সমান হয় তবেই। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, আলো তার উৎস আয়না এবং চোখের মধ্যকার সম্ভাব্য সব পথের মধ্যে যেটি সব চেয়ে ছোট ও দ্রুতগামী সে পথটিই বেছে নেয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রীক গাণিতিক, আলেকজান্দ্রিয়ার হেরন প্রথম এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

কাক যে পথে ওড়ে

অনেক ধাঁধা সমাধানের সময়, ক্ষুদ্রতম পথ নির্ণয়ের এই পূর্ববর্তী আলোচনাটা কাজে লাগতে পারে। এই ঘটনাটা নিয়েই দেখা যাক।

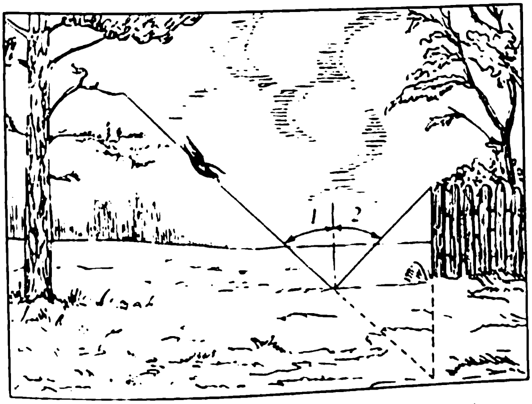
চিত্র 103



কাকের সমস্যা। প্রথমে মাঠ ও তারপর মাঠ থেকে বেড়া অবধি কাক দ্রুততম কোন পথ ধরে উড়বে।

গাছের ডালে বসে আছে একটা কাক আর নিচে মাটির উপর ছড়ানো আছে কিছু শস্যের দানা। কাকটা ছোঁ মেরে মাটির উপর থেকে দানা মুখে তুলে নিয়ে উড়ে গিয়ে বসল বেড়ার মাথায়। প্রথম প্রশ্নটা হল: কাকটা ঠিক কোন্‌খান্‌ থেকে দানাটা তুললে তার গতিপথ সব চেয়ে সংক্ষিপ্ত হবে? (চিত্র 103) এক্ষুনি যে সমস্যাটার কথা আলোচনা করলাম, ওটাও ঠিক এরই মতো। তাই

চিত্র 104



কাকের সমস্যাটির সমাধান।

সহজেই আমরা নিভু্ল উত্তর দিতে পারি: কাকটাকে আলোক রশ্মির পথ অনুসরণ করতে হবে। কিংবা বলা যেতে পারে, তাকে এমনভাবে উড়তে হবে যাতে 1 কোণ 2 কোণের সমান হয় (চিত্র 104)। আমরা তো জেনেই গেছি যে এইটাই ক্ষুদ্রতম পথ।

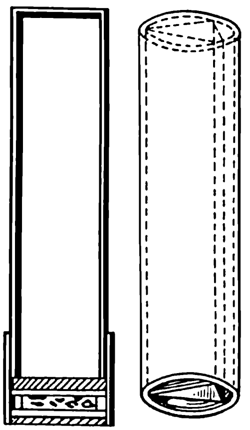
ক্যালিডোস্কোপ

ক্যালিডোস্কোপ বলতে কি বোঝায় তোমরা জান নিশ্চয়। এই মজাদার খেলনাটায় বেশ কিছু নানা রঙের কাচের টুকরো রাখা থাকে দুটো বা তিনটে সমতল আয়নার মধ্যবর্তী জায়গাটায়। খুব সুন্দর সুন্দর নক্‌শা তৈরি করে এই ক্যালিডোস্কোপ। সামান্য একটু ঘোরালেই এগুলোর মধ্যে আবার প্রতিসম পরিবর্তন ঘটে। খেলনাটা খুবই সাধারণ কিন্তু এর মধ্যে যে কত অসংখ্য রকমের ডিজাইন দেখা যেতে পারে তার কথা অনেকেই জানে না। ধরো তোমার কাছে কুড়ি টুকরো কাচ ভরা একটা ক্যালিডোস্কোপ আছে এবং প্রত্যেক মিনিটে এটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুমি দশটা করে নতুন প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছ। এই কুড়ি টুকরো কাচ দিয়ে যতগুলো প্যাটার্ন তৈরী হওয়া সম্ভব, তার সবগুলো দেখতে তোমার কতক্ষণ লাগবে? উদ্দাম কল্পনাও নির্ভুল উত্তর দিতে পারবে না। সাগর

শুকিয়ে যাবে, পাহাড় ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়বে, তবু তোমার দেখা শেষ হবে না। কম করে তোমার 50,000 কোটি বছর লাগবে উৎপন্ন সব কটি নকশা দেখতে।

অগুনতি, অনন্তকাল ধরে পরিবর্তিত এই খেলনা-পরিবেশিত ভিন্ন ভিন্ন নকশারা দীর্ঘকাল ধরে ডিজাইন শিল্পীদের আকর্ষণ করে এসেছে। এর ওয়াল-পেপার, কার্পেট এবং অন্যান্য কাপড়কে অলংকৃত করার উপযোগী অপূর্ব সব নকশার অফুরন্ত উদ্ভাবনী দক্ষতা শিল্পীদের সম্মিলিত কল্পনাকেও হার মানায়।

চিত্র 105



ক্যালিডোস্কোপ।

কিন্তু সাধারণ লোকেরা এটিকে নিয়ে এখন আর মাথা ঘামায় না। একশো বছর আগে অবস্থা কিন্তু এ-রকমটা ছিল না। তখন ওটা ছিল আকর্ষণীয় এক অভিনব বস্তু—যার সম্মানে কবিরা গাথা রচনা করে গেছেন।

1816 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে উদ্ভাবিত হয় ক্যালিডোস্কোপ। বারো থেকে আঠারো মাসের মধ্যে সারা পৃথিবীর মানুষ মেতে ওঠেন এটিকে নিয়ে। 1818 সালে রুশ পত্রিকা 'ব্লাগোনামেরেন্নি'র (বিশ্বস্ত) জুলাই সংখ্যায় নীতিকাহিনীর লেখক এ. ইজমাইলভ এটির সম্বন্ধে লেখেন: ক্যালিডোস্কোপে যা দেখতে পাবেন তার সম্পূর্ণ বর্ণনা কারোও সম্ভব নয়, গদ্যেও নয়। প্রত্যেকটি পাকের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় নকশা, এবং কোনো নকশাটির সঙ্গেই আগেকার কোনো নকশার মিল থাকে না। কী অপূর্ব সব নকশা! এমব্রয়ডারীর পক্ষে কি সুন্দর! কিন্তু অমন উজ্জ্বল রেশমী কাপড় লোকে পাবে কোথায়? সত্যিই অলস একঘেয়েমির বিরক্তি কাটানোর এ এক মন মাতানো অব্যাহতি—তাস নিয়ে পেশেন্স খেলার চেয়ে অনেক ভাল।

"শোনা যায় বহুকাল আগে সপ্তদশ শতাব্দীর লোকে নাকি ক্যালিডোস্কোপের কথা জানত। সে যাই হোক, কিছুকাল আগে ইংল্যান্ডে যন্ত্রটির উন্নতি ও পুনঃ প্রবর্তন ঘটে এবং কয়েক মাস আগে এটি চ্যানেল পেরিয়েছে। একজন ধনী ফরাসী 20,000 ফ্রাঙ্ক দামের একটি ক্যালিডোস্কোপের অর্ডার দিয়েছেন। এর মধ্যে রঙীন কাচের টুকরোর বদলে মণি-মুক্তা থাকবে।"

ইজমাইলভ এর পরে ক্যালিডোস্কোপ সম্বন্ধে মজাদার একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন যেটা শুধু পুরনো সামন্ততান্ত্রিক যুগের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে আর শেষে ধ্বনিত হয়েছে একটা বিপদের সুর ঃ "আলোক যন্ত্র নির্মাতা হিসাবে প্রসিদ্ধ রাজ-দরবারের যন্ত্রবিদ রোস্পিনি মাত্র কুড়ি রুবল দামে নিজের তৈরী ক্যালিডোস্কোপ বিক্রি করছেন। নিঃসন্দেহে, পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যা সংক্রান্ত বক্তৃতা শোনার চেয়ে লোকে অনেক বেশি বরে ক্যালিডোস্কোপ কিনতে চাইবে। প্রসঙ্গত বলতে দুঃখঃ এবং বিস্ময় দুই হচ্ছে যে, ওই সম্মানিত ভদ্রলোক রোস্পিনি কিন্তু পূর্বোক্ত বক্তৃতা থেকে কোনোভাবেই বেশি রোজগার করতে পারেন নি।"

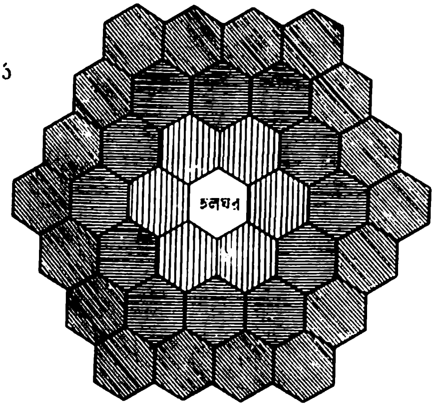
দীর্ঘকাল ক্যালিডোস্কোপ শুধু মজাদার খেলনা হিসাবেই ছিল। বর্তমানে বিভিন্ন নক্শার ডিজাইন করার কাজে এটাকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখন ক্যালিডোস্কোপের নক্শার আলোকচিত্র তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে ফলে সহজেই আলঙ্কারিক প্যাটার্নগুলোর প্রতিরূপ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে।

দৃষ্টিবিভ্রম প্রাসাদ ও মরীচিকা

আমরা যদি কাচের টুকরোর মতো ছোট হয়ে ক্যালিডোস্কোপের ভেতরে ঢুকে পড়তাম, কি রকম অনুভূতি হত আমাদের? 1900 খ্রীস্টাব্দে প্যারিস ওয়াল্ড ফেয়ারের দর্শকরা এই সুযোগ পেয়েছিলেন। সেখানকার 'দৃষ্টিবিভ্রমের প্রাসাদ' অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছিল। একটা বিশাল অনড় ক্যালিডোস্কোপের অভ্যন্তরের মতো করে তৈরি করা হয়েছিল প্রাসাদটাকে। একটা ছ'কোণা হলঘর কল্পনা করো, যার ছ'টা দেওয়ালের প্রত্যেকটাই হল একটা করে বিশাল এবং সুন্দরভাবে পালিশ করা আয়না। ঘরের প্রতিটি কোণে ছিল স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ স্তম্ভ এবং কার্নিশ—যা ছাদের স্থাপত্যের সঙ্গে মিলিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। দর্শক এই ঘরে ঢুকলেই দেখতে পেত সে বুঝি অগুনতি মানুষের মধ্যে একজন এবং প্রত্যেকটা লোককেই ঠিক এক রকম দেখতে। যেদিকেই চোখ যায় সে দেখতে পেত স্তম্ভওলা অসংখ্য ঘর একের পর এক বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। 106 নং চিত্রে যে ঘরগুলোয় উপর-নিচ রেখা টানা আছে সেগুলো প্রথমবারের প্রতিফলনের ফল। পরবর্তী বারোটা

ঘর দেখানো হয়েছে ডান-বাঁ রেখা টেনে। এগুলো দ্বিতীয় প্রতিফলনের পর সৃষ্টি হয়েছে। এর পরের আঠারোটা ঘর হেলানো রেখা টেনে দেখানো হয়েছে—যেগুলি তৃতীয় প্রতিফলনের পর সৃষ্টি হয়েছে। বহু প্রতিফলনের এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবারের প্রতিফলনের সঙ্গে সঙ্গে হলঘরগুলো সংখ্যায় বাড়তে থাকে। ঠিক কতগুণ বাড়বে সেটা স্বাভাবিকভাবেই নির্ভর করবে আয়নাগুলো কি পরিমাণে নিখুঁত ও পরস্পরের বিপরীত আয়নাগুলো ঠিক সমান্তরালভাবে

চিত্র 105



কেন্দ্রীয় হলের দেওয়াল থেকে তিন দফা প্রতিফলনে 36টি হল দেখা যায়।

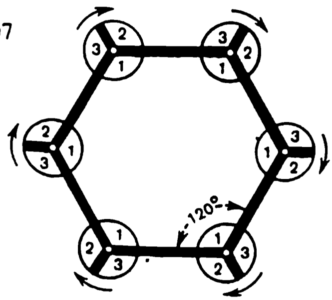
স্থাপিত কিনা, তার উপর। 12-তম প্রতিফলনের পর 468টি হলঘর দেখতে পাওয়ার কথা।

আলোর প্রতিফলন নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রের কথা যারা জানে, তাদের পক্ষে এই দৃষ্টিবিভ্রমের কারণ অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধা হবে না। এখানে তিন জোড়া সমান্তরাল আয়না এবং নির্দিষ্ট কোণে বসানো দশ জোড়া আয়না আছে বলেই এতগুলো প্রতিফলন পাওয়া যায়।

প্যারিসের ওই প্রদর্শনীতে 'মরীচিকার প্রাসাদ' যে দৃষ্টিবিভ্রম সৃষ্টি করেছিল তা আরো অদ্ভুত। এখানে শুধু অসংখ্য প্রতিফলনই ঘটত না, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিফলনের সাজ-সজ্জাও পাল্টাত। অর্থাৎ এই প্রাসাদটি ছিল আসলে একটি বিশালাকারের 'সচল' ক্যালিডোস্কোপ—যার মধ্যে থাকত দর্শকরা। আয়না দিয়ে তৈরী হলঘরের মধ্যে কব্জা দিয়ে আটকানো কয়েকটা কোণা অনেকটা ঘূরন্ত মঞ্চের মতো ঘুরত বলেই ওই ব্যাপারটা ঘটত। 107 নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে 1, 2 এবং 3 চিহ্নিত কোণ তিনটির অনুসারে এখানে তিন রকম পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব।

ধরো, প্রথম ছ'টা কোণ ঘন জঙ্গলের মতো, পরবর্তী ছ'টা কোণ শেখেদের প্রাসাদের মতো এবং শেষ ছ'টা কোণ ভারতীয় মন্দিরের মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এবার লুকোনো যন্ত্রের সাহায্যে একটা পাক্ দিলেই ঘন জঙ্গল সরে গিয়ে শেখ প্রাসাদ দেখা দেবে। আলোর প্রতিফলনের মত অতি সাধারণ একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া পুরো কৌশলটার পিছনে রয়েছে।

চিত্র 107



"মরীচিকার প্রাসাদের" গুপ্ত রহস্য।

চিত্র 108



আলোর প্রতিসরণ ঘটে কেন এবং কিভাবে

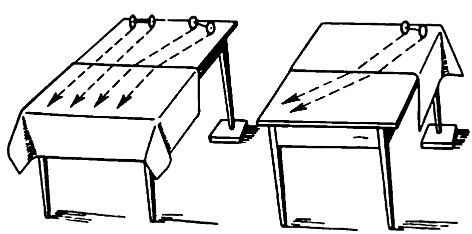
এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময়ে আলোর প্রতিসরণ ঘটা দেখে অনেকেই মনে করে এটা প্রকৃতির একটা খামখেয়ালিপনা। তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না, আলো কেন তার পূর্ববর্তী দিশা বজায় রাখতে সক্ষম হয় না এবং তেরছাভাবে বেরিয়ে যায়। তোমারও কি এই একই অবস্থা? তাহলে জেনে

খুশি হবে যে, কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যেতে যেতে একদল সৈন্য যখন পাকা রাস্তা ছেড়ে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় নামে তখন তারা যা করে তার সঙ্গে আলোর এই ব্যবহারেরও কোনো পার্থক্য নেই।

খুবই সোজা এবং শিক্ষণীয় একটা উদাহরণ দিচ্ছি। 109 নং চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, একটা টেবিলক্লথকে সেইভাবে পাট করে টেবিলের উপরে রাখো। টেবিলের মাথাটা সামান্য কাত করো। এবার ভাঙা খেলনা স্টিম ইঞ্জিনের বা অন্য কোনো খেলনা থেকে একটা অক্ষদণ্ডে যুক্ত কয়েক জোড়া চাকা নিয়ে টেবিলের উপর রাখ। চাকাগুলো গড়াতে থাকবে। চাকার গতিপথ যদি টেবিলক্লথের ভাঁজের সঙ্গে সমকোণে থাকে তাহলে কোনো প্রতিসরণ ঘটবে না এবং এটা আলোক-বিদ্যার সূত্রকেই সমর্থন করবে, কারণ এই সূত্র অনুসারে আলো লম্বভাবে দুটি মাধ্যমের সীমান্ত রেখায় আপতিত হলে বেঁকে যায় না। কিন্তু এই গতিপথ যখন টেবিলক্লথের ভাঁজের পরিপ্রেক্ষিতে তেরছাভাবে স্থাপিত হয়, দুটি মাধ্যমের সীমানা স্বরূপ এই ভাঁজের কাছে দিশা পাল্টে যায়। এখানে বেগের পরিবর্তন ঘটে।

টেবিলের যে অংশে বেগ বেশি (অনাচ্ছাদিত অংশ) সেখান থেকে যে অংশে বেগ কম (আচ্ছাদিত অংশ), সেখানে যাবার সময়ে সেটা (রশ্মি) 'অভিলম্ব

চিত্র 109



আলোর প্রতিসরণের ব্যাখ্যা।

আপতন'-এর নিকটবর্তী হয়। উল্টো দিকে চলার সময়ে তার দিশা অভিলম্ব থেকে দূরে সরে যায়।

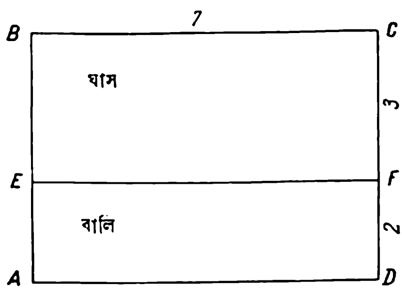
এর থেকেই বোঝা যায় যে, প্রতিসরণের মূল কারণ হল নতুন মাধ্যমে আলোর বেগের পরিবর্তন। এই পরিবর্তন যত বেশি হবে ততই বৃদ্ধি পাবে প্রতিসরণ কোণ এবং সেই সঙ্গে 'প্রতিসরাংক'। দিশার পরিবর্তন কতখানি ঘটেছে সেটা এই প্রতিসরাংক থেকে জানা যায় এবং তা দুটি বেগের অনুপাত মাত্র। বাতাস থেকে জলে যাওয়ার সময়ে প্রতিসরাংক যদি $\frac{4}{3}$ হয়, তার মানে আলো বাতাসের মধ্য

দিয়ে জলের চেয়ে 1·3 গুণ জোরে চলে। এর থেকে আলোর বিস্তারলাভ সম্বন্ধে আরেকটা শিক্ষা পাই আমরা। প্রতিফলনের সময়ে আলো 'ক্ষুদ্রতম' পথ গ্রহণ করে বটে, কিন্তু প্রতিরণের সময়ে তা দ্রুততম পথ বেছে নেয়। এই বেঁকা পথটি ছাড়া আর কোনো পথেই আলোর পক্ষে আরো তাড়াতাড়ি তার লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব নয়।

দীর্ঘতর পথ কিন্তু দ্রুততর

সরল পথের চেয়ে বক্রপথ কি আরো তাড়াতাড়ি আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে পারে? হ্যাঁ—আমাদের পথের বিভিন্ন অংশে আমরা যদি ভিন্ন ভিন্ন বেগে এগোই তবেই তা হতে পারে। কোনো গ্রামবাসীর বাড়ি যদি দু'টি রেলস্টেশন A ও B-এর মধ্যবর্তী অঞ্চলে কিন্তু A স্টেশনের নিকটবর্তী হয়, তাহলে তাড়াতাড়ি B স্টেশনে পৌঁছবার জন্য তারা ক্ষুদ্রতম পথটি না ধরে, হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে প্রথমে A স্টেশনে যায় তারপর সেখান থেকে B স্টেশনের ট্রেন ধরে।

চিত্র 110



অশ্বারোহী সংবাদবাহকের সমস্যা। A থেকে C অবধি দ্রুততম পথটি বার কর।

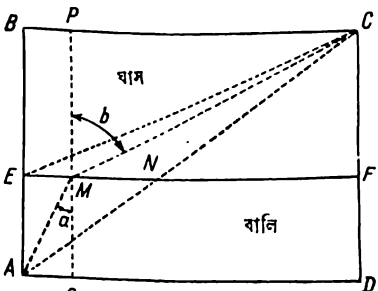
আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি। অশ্বারোহী এক সংবাদবাহককে চিঠি নিয়ে যেতে হবে A বিন্দু থেকে C বিন্দুতে (চিত্র 110)। C বিন্দুর সামরিক ঘাঁটি ও অশ্বারোহীর মাঝখানে রয়েছে একটা মাঠ ও নরম বালির একটা প্রান্তর। E F রেখা এই দু'ই অংশের মধ্যবর্তী সীমান্ত। মাঠের তুলনায় বালি পেরতে দু'গুণ সময় লাগে। সবচেয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি বিলি করার জন্য অশ্বারোহী কোন্ পথ ধরবে?

প্রথম নজরে মনে হতে পারে যে A ও C বিন্দু সংযোগকারী সরলরেখাটাই বুঝি অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আমার ধারণা কোনো অশ্বারোহীই এ পথ ধরবে না। বালি পেরতে সময় বেশি লাগে বলে অশ্বারোহীরা স্বাভাবিকভাবেই, যতটা কম তেরছাভাবে সম্ভব বালুকাভূমি পেরিয়ে সময় বাঁচাতে চাইবে। এর ফলে তারা মাঠের উপর দিয়ে তাকে বেশি দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু

মাঠের উপর দিয়ে তার ঘোড়াটা তাকে দ্বিগুণ জোরে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে. ফলে দূরত্ব বাড়লেও আসলে সময়টা লাগবে কম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অশ্বারোহী এমন একটা পথ অনুসরণ করবে যেটার প্রতিসরণ ঘটবে বালি ও মাঠের সীমান্তে। উপরন্তু, এই সীমান্তের উপরে টানা লম্বের সঙ্গে মাঠের উপরকার পথটা যে কোণে অবস্থান করবে সেটা বালির উপরকার পথটার অনুরূপ কোণের চেয়ে বেশি হবে।

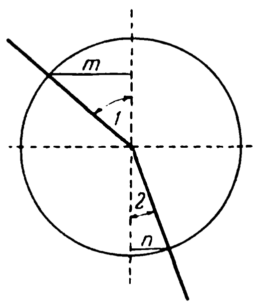
যে কেউ বুঝতে পারবে যে, সরলরেখা AC-টা দ্রুততম পথ নয়। 110 নং চিত্র অনুসারে মাঠ ও বালির বিস্তৃতি সমান নয়, তাই সংবাদবাহক যদি বাঁকা পথ ABC ধরে এগোয় তবে আরো তাড়াতাড়ি তার লক্ষ্যে পেঁছবে (চিত্র 111)। 110 নং চিত্রে দেখানো মাঠ 3 কিলোমিটার ও বালি 2 কিলোমিটার চওড়া। BC-এর দূরত্ব সাত কিলোমিটার। পিথাগোরাস সূত্র অনুসারে, A থেকে C অবধি পুরো পথটা (চিত্র 111) হল $\sqrt{5^2+7^2} = \sqrt{74} = 8{\cdot}6$ কিমি। বালি পেরিয়ে AN অংশটা এর পাঁচ ভাগের দু'ভাগ অথবা 3·44 কিমি। মাঠের চেয়ে বালি পেরতে যেহেতু দু'গুণ সময় লাগে তাই সময়ের বিচারে এই

চিত্র 111



অশ্বারোহী সংবাদবাহকের সমস্যা ও তার সমাধান। AMC হচ্ছে দ্রুততম পথ।

চিত্র 112



Sine বলে কাকে? 1 কোণের Sine হল m ও ব্যাসার্ধের অনুপাত, আর 2 কোণের Sine হল n ও ব্যাসার্ধের অনুপাত।

3·44 কিমি বালি আসলে 6·88 কিমি মাঠের তুল্য। সুতরাং 8·6 কিমি লম্বা সরলরেখার পথ AC হচ্ছে মাঠের উপর 12·04 কিমি-র তুল্য। এবার বাঁকা AEC পথটাকে 'মাঠ'-এর হিসাবে পরিবর্তিত করা যাক। AE অংশ দু' কিলোমিটার লম্বা, তার মানে মাঠের হিসাবে চার কিলোমিটারের তুল্য। EC

অংশ হল $\sqrt{3^2+7^2} = \sqrt{58} = 7{\cdot}61$ কিমি। এই 7·61 কিমি-র সঙ্গে চার কিমি যোগ করলে বাঁকা পথ AEC-র মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে 11·61 কিমি।

এবার দেখতেই পাচ্ছ যে, মাঠের হিসাবে 'ছোট' সোজা রাস্তাটা 12·04 কিমি লম্বা আর 'লম্বা' বাঁকা রাস্তাটা মাত্র 11·61 কিমি। ফলে, $12{\cdot}04 - 11{\cdot}61 = 0{\cdot}43$ কিমি পথ বা প্রায় আধ কিলোমিটার পথ এইভাবে কমানো যাচ্ছে। কিন্তু তবু এটাই সবচেয়ে দ্রুত গমনের পথ নয়। ত্রিকোণমিতির ভাষার সাহায্য নিয়ে সবচেয়ে দ্রুতগমনের পথটিকে নির্দিষ্ট করা যায়। সেই পথটা এমন হবে যাতে ***b*** ও ***a*** কোণের sine-এর অনুপাত মাঠের উপরকার বেগ ও বালির উপরকার বেগের অনুপাতের, অর্থাৎ 2 : 1 অনুপাতের সমান হয়। অথবা বলা যেতে পারে, আমাদের এমন একটা পথ ধরতে হবে যাতে ***b*** কোণের sine, ***a*** কোণের sine-এর দ্বিগুণ হয়। সেই অনুসারে বালি ও মাঠের মধ্যবর্তী সীমানাকে আমাদের M বিন্দুতে পার হতে হবে। এই M বিন্দু রয়েছে E বিন্দু থেকে এক কিলোমিটার দূরে। অতএব $\sin b = \dfrac{6}{\sqrt{3^2+6^2}}$, আর $\sin a = \dfrac{1}{\sqrt{1^2+2^2}}$, এবং অনুপাত $\dfrac{\sin b}{\sin a} = \dfrac{6}{\sqrt{45}} : \dfrac{1}{\sqrt{5}} = \dfrac{6}{3\sqrt{5}} : \dfrac{1}{\sqrt{5}} = 2$, যেটা দুটো বেগের অনুপাতের একেবারে সমান। 'মাঠের' হিসাবে এই পথটার দৈর্ঘ্য কত হবে? $AM = 2\sqrt{2^2+1^2}$ অর্থাৎ 4·47 কিমি মাঠের উপর, $MC = \sqrt{45} = 6{\cdot}71$ কিমি। দুটো যোগ করলে 11·18 কিমি হচ্ছে, অর্থাৎ মাঠের উপরকার সোজা পথ 12·04 কিমি-র চেয়ে 860 মিটার কম।

উদাহরণটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, এ-রকম পরিস্থিতিতে বাঁকা রাস্তাটাই বেশি সুবিধাজনক হয়। আলো স্বভাবতই দ্রুততম গমনের রাস্তাটাই নেয়, কারণ আলোক প্রতিসরণের সূত্র গাণিতিক সমাধানকে পুরোপুরি মেনে চলে। প্রতিসরণের কোণের sine ও আপতনে কোণের sine-এর অনুপাতও যা, নতুন মাধ্যমে আলোর বেগ ও প্রথম মাধ্যমে আলোর বেগ-এর অনুপাতও তাই। এই অনুপাতই দুটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের প্রতিসরাংক। প্রতিফলন ও প্রতিসরণের বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলোর সমন্বয় ঘটিয়ে আমরা 'ফারম্যাট তত্ত্বে' (Fermat Principle) উপনীত হই। এই তত্ত্বকে পদার্থবিদ্‌দের মতো আমরা 'সংক্ষিপ্ততম সময়ের তত্ত্ব'-ও বলতে পারি। এই তত্ত্ব অনুসারে আলো 'সর্বদাই দ্রুততম গমনের পথটি গ্রহণ করে'।

মাধ্যম যখন অসমসত্ত্ব হয় এবং তার প্রতিসরণের প্রকৃতি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়—ঠিক যেমনটা ঘটে আমাদের বায়ুমণ্ডলে—তখনও কিন্তু 'সংক্ষিপ্ততম সময়ের সূত্রে'র কোনো ব্যতিক্রম হয় না। এর থেকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব, নক্ষত্রের আলো

বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে আসার সময়ে কেন সামান্য পরিমাণে বেঁকে যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা একে 'বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ' বলেন। আমাদের বায়ুমণ্ডল যতই মাটির নিকটবর্তী হয় ততই তার ঘনত্ব বাড়ে। এই বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আলো এমনভাবে বেঁকে যায় যাতে তার বক্রতার ভিতরের দিকটা থাকে পৃথিবীর দিকে। বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকের স্তরগুলোয় আলো বেশি সময় কাটায়, কারণ এখানে তার গতি কম বাধা পায় এবং নিচের 'ধীরগতি' স্তরগুলোয় কম সময় ব্যয় করে। ফলে, পুরোপুরি সোজা পথে অগ্রসর হলে যা হত আলো তার চেয়ে তাড়াতাড়ি তার লক্ষ্যে পেঁছিয়।

ফারম্যাট তত্ত্ব যে শুধু আলো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য তা নয়। শব্দ এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত তরঙ্গই, তা তাদের চরিত্র যা-ই হোক না, এই তত্ত্ব অনুসারেই অগ্রসর হয়। তোমরা হয়ত এর কারণ জানতে চাইবে তাই 1933 সালে খ্যাতনামা পদার্থবিদ শ্রোয়েডিঙ্গার নোবেল প্রাইজ নেবার সময়ে স্টকহোমে যে বক্তৃতা করেছিলেন তার থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করছি। ক্রম পরিবর্তনশীল ঘনত্ব সম্পন্ন মাধ্যমে আলো কিভাবে চলে জানাতে গিয়ে তিনি বলেছিলেনঃ "বুক বরাবর সবার এগিয়ে চলাকে একটা নির্দিষ্ট লাইনে ধরে রাখার জন্য এক পল্টন সৈন্যের সামনের সারির প্রত্যেককে একটা লম্বা লাঠিতে দৃঢ়ভাবে ধরিয়ে দেওয়া হল। এবার আদেশ হল—জোড় কদম! জলদি চল! ধরা যাক, ওদের চলার জমির গড়নটা ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে আর এর ফলে ওদের বুক বরাবরের লাইনটা এমনভাবে ঘুরে যাচ্ছে যে, ডান প্রান্তটি আগে এবং পরে বাঁ প্রান্তটি অধিকতর দ্রুতগতি সম্পন্ন হচ্ছে। এক্ষেত্রে দেখা যাবে যে, ওদের চলার পথটা কিন্তু সোজা না হয়ে বাঁকাই হবে। তাহলেও ঐ জমিটার উপর দিয়ে ওদের গন্তব্যে পেঁছানোর ব্যাপারে ওরা কিন্তু স্বল্পতম সময়ই নেবে। স্পষ্টত এটা করতে গিয়ে সৈন্যদের প্রত্যেককে ওদের সাধ্যমত জোরে দৌড়তে হবে।"

রবিনসন ক্রুসোর মতো আরো কয়েকজন

জুল ভার্ন-এর লেখা 'মিস্টেরিয়াস আইল্যাণ্ড' বইটা যারা পড়েছ মনে করে দ্যাখো গল্পের নায়করা কিভাবে আগুন জ্বালিয়েছিল। তাদের কাছে কিন্তু চকমকি পাথর, লোহা বা কাঠ ছিল না। ডিকোর রবিনসন ক্রুসো নেহাতই ঘটনাক্রমে এর সাহচর্য পেয়েছিল বজ্রপাতের দরুন একটা গাছে আগুন ধরে গিয়ে। জুল ভার্ন-এর উপন্যাসে কিন্তু একজন শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারের বুদ্ধি এবং পদার্থবিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান সবাইকার সেবায় লেগেছিল। তোমার কি মনে আছে যে. সেই পেনক্রফ্‌ট নামে নাবিকটি শিকার করে ফিরে এসে ইঞ্জিনিয়ার ও সাংবাদিককে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সামনে বসে থাকতে দেখে কিরকম আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল :

" 'কিন্তু আগুনটা জ্বালল কে?' পেনক্রফ্‌ট জিজ্ঞেস করল।

" 'সূর্য'!'

"গিডিওন স্পিলেটের উত্তরে কোনো মিথ্যে ছিল না। সূর্যই সরবরাহ করেছে সেই উত্তাপ, যা পেনক্রফ্‌টকে অবাক করে দিয়েছিল। পেনক্রফ্‌ট যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। সে এতই অবাক হয়ে গিয়েছিল যে ইঞ্জিনিয়ারকে আর কোনো প্রশ্ন করার কথাও মাথায় আসেনি।

" 'মহাশয় আপনার কাছে কি আতস কাচ ছিল? হার্ডিঞ্জের হার্বার্ট প্রশ্ন করলেন।

" 'না হে, আতস কাচ ছিল না। কিন্তু একটা তৈরি করে নিয়েছি।' তিনি উত্তর দিলেন।

"এই বলে তিনি সেই জিনিসটা দেখালেন যা আতস কাচের কাজ করেছিল। এটা তিনি তাঁর নিজের ও সাংবাদিকের হাতঘড়ির কাচ দুটো খুলে নিয়ে তৈরি করেছিলেন। তিনি কাচ দুটোর মধ্যে জল ভরে নিয়ে মুখে মুখে রেখে একটু কাদা দিয়ে জুড়ে নিয়েছিলেন। এই ভাবেই গড়ে উঠেছিল একটা সত্যিকার আতস কাচ, যেটা সূর্যরশ্মিকে খুব শুকনো কিছু শৈবালের উপর ঘনীভূত করতেই কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠেছিল।"

মনে হচ্ছে তোমরা নিশ্চয় জানতে চাইবে যে, ঘড়ির কাচদুটোর মধ্যে কেন জল ভরে নিতে হয়েছিল? শুধু হাওয়া-ভর্তি করলেও কি সূর্যের রশ্মি যথেষ্ট ঘনীভূত হত না? একেবারেই হত না। ভিতরে ও বাইরে দুটি সমান্তরাল (এককেন্দ্রী) তল দ্বারা আবদ্ধ থাকে ঘড়ির কাচ। পদার্থবিদ্যা আমাদের জানায় যে, এ ধরনের তলদ্বারা আবদ্ধ মাধ্যম অতিক্রম করার সময়ে আলো তার গতিপথ প্রায় পাল্টায় না বললেই চলে। দ্বিতীয় ঘড়ির কাচটা পার হবার সময়েও আলো বেঁকে যায় না। ফলে আলোকরশ্মিকে একটি বিন্দুতে ঘনীভূত করা যায় না। সেটা করতে হলে কাচ দুটোর মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটা এমন একটা স্বচ্ছ পদার্থ দিয়ে ভরে দিতে হবে যা হাওয়ার চেয়ে ভালভাবে আলোকে প্রতিসরিত করবে। জুল ভার্ন-এর ইঞ্জিনিয়ারও তাই করেছিল।

বলের আকারের যে কোনো জল ভরা কাচের পাত্রই আতস কাচের কাজ করবে। প্রাচীনকালের মানুষরাও এটা জানতেন এবং লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় জলটা তেতে ওঠে না। এমন ঘটনার কথাও জানা আছে যে, ভুল করে খোলা জানালার ধারে এমনই একটা জল ভরা রোদ্রে রাখা বোতল থেকে পর্দা এবং টেবিলক্লথে আগুন ধরে যায়, টেবিলটাও পুড়ে যায়। আগেকার দিনের ঔষধ-পত্রের দোকানের জানলার বাহার হিসাবে রঙীন জল ভরা বড় বড় গোলা রাখা

বিহীন অবস্থায় আটকে পড়েছিল—যেখানে দুরন্ত ঠাণ্ডা, উষ্ণতা শূন্যের 48° সে-এর নিচে। এই অবস্থায় ডক্টর ক্লবেনীকে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করেছিল একটা বরফের 'আতস কাচ'।

" 'সত্যিই এ আমাদের ভয়ানক দুর্ভাগ্য' ক্যাপ্টেন বললেন।

" 'হ্যাঁ।' সায় দিলেন ডক্টর।

" 'আমাদের একটা আতস কাচ অবধি নেই যে আগুন জ্বালাব!'

" 'সত্যি এ ভারী আক্ষেপের কথা।' ডক্টর অভিমত দিলেন, 'কারণ, সূর্যের আলোর যা তেজ তাতে কাঠকুটো ধরিয়ে নেওয়া যেত।'

113 নং চিত্র



"ডক্টর সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিকে ঘনীভূত করছেন কাঠের টুকরোর উপর।

" 'তাহলে ভাল্লুকটাকে কাঁচাই খেতে হচ্ছে।' বললেন ক্যাপ্টেন।

" 'আচ্ছা, একটা জিনিস তো···' ডক্টরের বিমর্ষ উত্তর।

" 'কি?' হ্যাটেরাস প্রশ্ন করলেন।

" 'একটা বুদ্ধি এসেছে।'

" 'যাক্ তাহলে আমরা বেঁচে গেলাম।' মাঝির সর্দার উৎফুল্ল।

" 'কিন্তু···' ডক্টর দ্বিধাগ্রস্ত।

" 'ব্যাপারটা কি?' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন।

" 'আমাদের কাছে আতস কাচ নেই কিন্তু একটা তৈরি করে নিতে পারি।'

" 'কিভাবে?' মাঝির সর্দার প্রশ্ন করল!

" 'এক টুকরো বরফ থেকে!'

হত। সেই থেকে কখনো কখনো কাছে পিঠে রাখা দাহ্য পদার্থে আগুন ধরে যেত।

জলভরা একটা ছোট গোল বোতল দিয়ে—12 সেমি ব্যাস হলেই চলবে—ঘড়ির কাচের উপর জল ফোটানো যায়। 15 সেমি ফোকাল দূরত্বে (ফোকাসটা বোতলের খুব কাছেই হবে), তুমি 120° সে উষ্ণতা সৃষ্টি করতে পারো। এটা দিয়ে আতস কাচের মতোই সহজে সিগারেট ধরনো সম্ভব। অবশ্য একটা কথা এখানে খেয়াল রাখা দরকার—জল-ভরা লেন্সের চেয়ে কাচের লেন্স অনেক বেশি কার্যকর হয়, কারণ প্রথমত জলের প্রতিসরাংক অনেক কম এবং দ্বিতীয়ত, জল ভীষণভাবে শোষণ করে নেয় অবলোহিত রশ্মি, যা বস্তুকে তপ্ত করার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। চশমার লেন্স বা ছোট দূরবীন আবিষ্কারের হাজার কয়েক বছর আগেও গ্রীকদেশের প্রাচীন মানুষেরা কিন্তু কাচের লেন্সের এই প্রজ্বলনকারী ক্ষমতার কথা জানত। অ্যারিস্টোফেনিস তাঁর 'মেঘ' নামে কমেডিতে সেই কথা লিখেছেন। স্ট্রেপটিয়াডিস-এর কাছে সক্রেটিস এই সমস্যাটির কথা জানাচ্ছেন ঃ

"ধরুন কেউ আপনার নামে একটা পাঁচ টেলেন্টের (মুদ্রা) ঋণপত্র তৈরি করেছে। সেটাকে আপনি কিভাবে নষ্ট করে দিতে পারেন ?

"স্ট্রেপটিয়াডিস ঃ আমি তার একটা উপায় বার করেছি। সেটা যে খুবই অভিনব তা আপনি নিজেও স্বীকার করবেন। কেমিস্টের দোকানে যে বিস্ময়কর স্বচ্ছ পাথর বিক্রি হয় দেখেছেন বোধ হয় ? যেটা দিয়ে আগুন ধরানো যায়।

"সক্রেটিস ঃ আপনি কি আতস কাচের কথা বলছেন ?

"স্ট্রেপটিয়াডিস ঃ ঠিক তাই।

"সক্রেটিস ঃ তা না হয় হল, কিন্তু কিভাবে ?

"স্ট্রেপটিয়াডিস ঃ আমার নামে ঋণপত্র লেখার সময়েই আমি লোকটার পিছনে দাঁড়িয়ে ঋণপত্রের উপর সূর্যের আলো ফোকাস করে সে যা লিখবে সব গলিয়ে দেব।"

এখানে বলে রাখা দরকার যে, অ্যারিস্টোফেনিসের সময়ে গ্রীকরা মোমের ফলকের উপর লিখত বলে সেটাকে গলিয়ে দেওয়া কঠিন ছিল না।

বরফের সাহায্য নিয়ে আগুন জ্বালা

বরফ যদি বেশ স্বচ্ছ হয় তাহলে সেটা উত্তল লেন্স এবং ফলে আতস কাচেরও ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আরও বলি, এই প্রক্রিয়ায় বরফ কিন্তু গরম হয়ে গলে যায় না। এর প্রতিসরাংক জলের চেয়ে সামান্য একটু কম হয়, ফলে জল-ভর্তি গোলাকার কাচের পাত্রকে যেমন আতস কাচ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তেমনই করা যায় এই আকারের এক টুকরো বরফকেও। জুল ভার্ন-এর লেখা 'ক্যাপ্টেন হাটেরাস-এর অভিযান'-এ অভিযাত্রীরা এমন এক জায়গায় এসে আগুন

" 'আপনি কি মনে করেন ··'

" 'না হবার কারণ কি? আমাদের দরকার হল কাঠের উপর সূর্যরশ্মি ঘনীভূত করা। সেটা এক টুকরো বরফ দিয়েও হতে পারে। অবশ্য পানীয় জল-জমা বরফই সবচেয়ে ভাল—বেশি স্বচ্ছ এবং ভাঙার সম্ভাবনাও কম থাকে।'

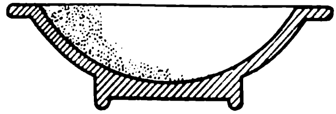
" 'ওই যে বরফের চাঙড়টা দেখা যাচ্ছে, মনে হয় ওইটা দিয়েই কাজ চলে যাবে আমাদের।' মাঝির সর্দার কয়েক শ' পা দূরে একটা চাঁইয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

" 'হ্যাঁ। কুড়ুলটা নিয়ে নাও। চলো সবলে মিলে যাই।'

" বরফের চাঙড়টার কাছে পৌঁছে তিন জনেই দেখল সত্যিই সেটা পানীয় জল জমে তৈরী হয়েছে।

" ডক্টর মাঝির সর্দারকে প্রায় এক ফুট ব্যাসের মতো একটা টুকরো কেটে নিতে বললেন। তারপর তিনি কুড়ুল ও তাঁর ছুরি দিয়ে সেটাকে কেটেকুটে এবং হাতে ঘষে পালিশ করে খুব ভাল একটা স্বচ্ছ আতস কাচ তৈরি করলেন। ডক্টর সূর্যের উজ্জ্বল রশ্মিকে কাঠের উপর ঘনীভূত করতেই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আগুন ধরে গেল।"

জুল ভার্ন-এর এই গল্প অসম্ভব নয়। 1763 খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে প্রথম এইভাবে আগুন ধরানো হয়েছিল। তারপর একই কাজে একাধিক বার বরফের ব্যবহার হয়েছে। অবশ্য শূন্যের 48° সেণ্টিগ্রেড নিচে, অত ঠাণ্ডায় কুড়ুল ও ছুরি জাতীয় অতি সাধারণ যন্ত্র ও 'নিজের হাত' ব্যবহার করে একজন বরফের আতস কাচ তৈরি করছে ভাবতেও কষ্ট হয়। অবশ্য অনেক সোজা একটা পদ্ধতি আছে: ঠিক মতো আকৃতির একটা বাটিতে জল ঢেলে সেটাকে জমিয়ে ফেলো। তারপর বাটির তলাটা একটু গরম করে বরফটাকে বার করে নাও। এরকম একটা 'আতস কাচ' শুধু ঘরের বাইরে মেঘমুক্ত বরফ-জমা শীতের দিনে ব্যবহার করা

চিত্র 114 

বরফের আতস-কাচ তৈরী করার পাত্র।

যায়। শার্সি-বন্ধ ঘরের ভেতরে এটাকে ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারণ জানলার কাচ সৌর শক্তির অনেকটাই শোষণ করে নেয়, যা অবশিষ্ট থাকে সেটা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়।

সূর্যালোকের সাহায্য

এবার আরেকটা পরীক্ষার কথা বলি যা শীতকালের সময় করতে কোনো অসুবিধা হবে না। দুটো সমান মাপের কাপড় নাও, একটা সাদা আর অন্যটা কালো। কাপড় দুটো সূর্যের আলোয় বরফের উপর বিছিয়ে দাও। ঘণ্টা-খানেক কি দুই বাদে দেখবে, কালো কাপড়ের অর্ধেকটা ডুবে গেছে কিন্তু সাদাটা আছে যথাস্থানে। কালো কাপড়ের তলায় বরফ তাড়াতাড়ি গলে, কারণ এই রঙের কাপড় তার উপর আপতিত সূর্যরশ্মির অধিকাংশই শোষণ করে নেয়। সাদা কাপড়টা কিন্তু সূর্যরশ্মির অধিকাংশই বিচ্ছুরিত করে দেয় বলে গরম হয় কম।

বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম এই শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষাটি করেছিলেন। এই মার্কিন বিজ্ঞানী স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বজ্রবহের (lightning conductor) উদ্ভাবক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

"দরজির অর্ডার-সংগ্রহের কার্ড থেকে বিভিন্ন রঙের কয়েকটা চৌকো কাপড়ের টুকরো নিয়েছিলাম। কালো, গাঢ় নীল, হাল্কা নীল, সবুজ, কমলা, লাল, হলুদ সাদা এবং আরো নানা রঙ বা মিশ্র রঙের কাপড় ছিল। একদিন ঝলমলে রোদ্দুরের মধ্যে কাপড়ের সব কটা টুকরোকে বরফের উপর পেতে দিলাম। কয়েক ঘণ্টা পরে (ঠিক কতক্ষণ বলতে পারব না) কালো কাপড়টা সূর্যের তাপে সবচেয়ে তপ্ত হয়ে এত নিচে তলিয়ে গেল যে, সূর্যরশ্মি তখন আর তার উপর পড়ছিল না। ঘন নীল কাপড়টাও প্রায় ততটাই তলিয়ে ছিল, হালকা নীলটা অবশ্য তার চেয়ে কম। অন্যান্য কাপড়গুলোও যে যত হালকা রঙের সে তত কম তলিয়েছিল। আর সাদাটা রয়ে গিয়েছিল বরফের উপরেই। বরফের মধ্যে এতটুকু বসে যায়নি।

"দর্শনের গুরুত্ব কি, যদি না তা কোনো কাজে লাগে ?—এর থেকে কি আমরা এই শিক্ষাই পাচ্ছি না যে, গরমকালে রোদ্দুরে কালোর চেয়ে সাদা রঙের পোশাক পরাই ভাল। এই রকম পোশাক পরে আমরা যখন বাইরে বেড়াতে বেরোই, একে তো হাঁটাচলার পরিশ্রমে শরীর গরম হয়ে ওঠে, তার উপর রোদ্দুরে আরও তেতে ওঠে কালো পোশাক পরা দেহ। এই বাড়তি গরম লেগে ভয়ংকর জ্বর আসাও অসম্ভব নয়। পুরুষ ও নারীদের গ্রীষ্মের টুপি সাদা হওয়া উচিত, তাহলে হয়তো কিছুটা তাপ প্রতিহত হবে এবং গরম লেগে মাথাধরার হাত থেকে অনেকে অব্যাহতি পাবেন। তাছাড়া সেই মারাত্মক হিট্-স্ট্রোক—ফরাসীরা যাকে বলে Coup de soleil—তার প্রকোপ থেকেও মানুষ রেহাই পেতে পারে।…ফল রাখার জায়গার দেওয়ালগুলো কালো রঙ করা হলে দিনের বেলায় রোদ্দুর থেকে এত তাপ সঞ্চয় করে রাখবে যে রাত্তিরেও খানিকটা উষ্ণতা বজায় রাখবে, বরফের হাত থেকে ফলগুলো বাঁচবে কিংবা তাদের পাকতে সাহায্য করবে।—এ ছাড়াও

কম বা বেশি গুরুত্বের আরো অনেক খুঁটিনাটিও হয়তো অনুসন্ধিৎসু মনের কাছে ধরা দেবে।"

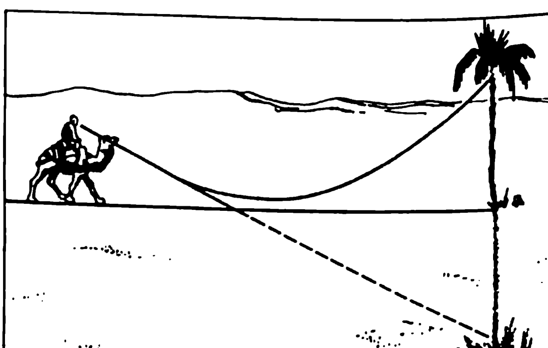
এই জ্ঞান থেকে কি উপকার পাওয়া যেতে পারে সেটা খুব ভালভাবে উপলব্ধি করা গিয়েছিল 1903 সালে, জার্মানরা যখন তাদের 'হাউস্' নামে জাহাজে চড়ে উত্তর মেরু অভিযানে বেরিয়েছিলেন।

জাহাজটা বরফ-জমা সমুদ্রে আটকা পড়েছিল। এ সব ক্ষেত্রে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সচরাচর যা করা হয়, বিস্ফোরকের বা বরফ-কাটা করাতের ব্যবহার, কিছুতেই কোনো কাজ হয় নি। তারপর সাহায্য নেওয়া হয় সূর্যরশ্মির। জাহাজের অগ্রভাগের নিকটতম ফাটল বরাবর দু কিলোমিটার লম্বা ও কয়েক ডজন মিটার চওড়া এক ফালি বরফের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হল কালো ছাই ও কয়লার গুঁড়ো। দক্ষিণ মেরুতে এই ঘটনা ঘটেছিল গ্রীষ্মকালে, ফলে ডিনামাইট ও করাত যা পারেনি, মেরু অঞ্চলের দীর্ঘদিনের সূর্য সেই কাজটাই করে দিল। এই ফালি বরাবর বরফ গলে গিয়ে জাহাজটাকে বরফের কামড় থেকে মুক্ত করলো।

মরীচিকা

তোমরা সবাই বোধ হয় জানো কেন মরীচিকা দেখা যায়। অগ্নিবর্ষী সূর্য মরুভূমির বালিকে তাতিয়ে দেয় এবং এই বালি তখন আয়নার মতো গুণাগুণ অর্জন

চিত্র 115



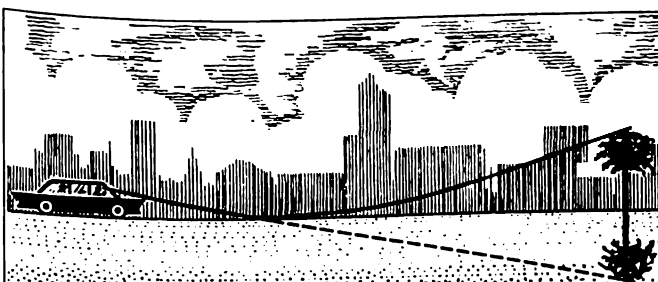
মরুভূমির মরীচিকার ব্যাখ্যা। পাঠ্যপুস্তকে এই ধরনের ছবি দেখা যায় যাতে ভূমির দিকে প্রসারিত রেখাটি বড্ড বেশী খাড়া করে দেখানো থাকে।

করে, কারণ ভূমি-সংলগ্ন বায়ুস্তরগুলোর ঘনত্ব তার ঠিক উপরকার স্তরগুলোর চেয়ে কম থাকে। দূরবর্তী কোনো বস্তু থেকে আগত আলোর তির্যক রশ্মি এই বায়ু

স্তরগুলোকে স্পর্শ করার পর ভূমির কাছ থেকে তেরছা হয়ে বেঁকে উপরে উঠে যায়। ঠিক যেমনটা ঘটে আলোকরশ্মি স্থূল কোণে আয়নায় এসে পড়ার পর প্রতিফলিত হওয়ার সময়ে। মরুভূমি ভ্রমণকারী তাই ভাবেন তিনি বুঝি একটা জলের বিস্তৃতিকে দেখতে পাচ্ছেন যার জলে তীরবর্তী বস্তুর প্রতিফলন চোখে পড়ছে (চিত্র 115)। বলা ভাল ভূমি-সংলগ্ন তপ্ত বায়ুস্তর আয়নার মতো প্রতিফলন সৃষ্টি করে না, এটাকে বরং ডুবো-জাহাজ থেকে দেখা জলের তলের মতো লাগে। এটা সাধারণ প্রতিফলনের ঘটনা নয়। পদার্থবিদরা একে বলেন পূর্ণ প্রতিফলন। এটি তখনই ঘটে, আলো যখন অত্যধিক স্থূল. ছবিতে যা দেখানো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি, কোণে বায়ুস্তরে প্রবেশ করে। না হলে আপতনের 'সংকট কোণ' (critical angle) অতিক্রম করা যাবে না।

ভুল বোঝার ভয় আছে, তাই বলে রাখি—পাতলা স্তরগুলোর উপরে ঘনতর বায়ুস্তরগুলো থাকা দরকার। কিন্তু আমরা জানি যে ঘন হাওয়ার ওজন বেশি এবং তা নিচে নেমে এসে হালকা হাওয়ার স্থান দখল করে এবং হালকা হাওয়া বাধ্য হয় উপরে উঠে যেতে। তাহলে মরীচিকার ক্ষেত্রে ঘন হাওয়া, কি করে পাতলা হাওয়ার উপরে থাকছে ? কারণ ওখানে বাতাস অবিরাম গতিসম্পন্ন— ভূমিসংলগ্ন তপ্ত বায়ুকে উপরে ঠেলে তোলে তার স্থান দখলকারী নিত্য নতুন তপ্ত হাওয়া। গরম বালির উপর সর্বদাই প্রচুর হালকা বাতাস থেকেই যায়।

চিত্র 116



বাঁধানো রাজপথে মরীচিকা।

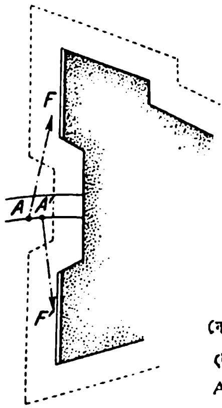
এটা যে সারাক্ষণই বালির উপর হালকা একই বাতাসকে হতে হবে তার কোনো কথা নেই—কিন্তু তার জন্য রশ্মির আচরণে কোনো পার্থক্য ঘটে না।

স্মরণাতীত কাল থেকে এই প্রক্রিয়ার কথা শুনে আসছি আমরা। (উপরবর্তী হালকা বায়ুর স্তরে কিছুটা ভিন্ন ধরনের মরীচিকাও সৃষ্টি হয়)। বেশির ভাগ লোকের ধারণা যে, চিরাচরিত মরীচিকা বুঝি শুধু অগ্নিক্ষরা দক্ষিণের মরুভূমিতেই

দেখা যায় এবং অধিকতর উত্তর অক্ষাংশের দিকে কখনোই দেখা সম্ভব নয়। এটা ভুল ধারণা। গ্রীষ্মকালে পিচের রাস্তার উপর প্রায়ই এমনটা দেখা যায়, কারণ রাস্তাগুলোর রঙ কালো বলে সূর্যের তাপে খুব তেতে ওঠে। রাস্তার উপরিভাগ দেখে তখন মনে হয় এখানে বুঝি জল জমে রয়েছে, তাই দূরবর্তী বস্তুর প্রতিফলনও চোখে পড়ছে। এরকম ক্ষেত্রে আলো যে-পথ অনুসরণ করে সেটা চিত্র 116-তে দেখানো হয়েছে। ভালভাবে নজর করলে এ রকম দৃশ্য প্রায়ই দেখা যায়।

আরেক ধরনের মরীচিকা দেখা যায়—পার্শ্ববর্তী মরীচিকা—যার সম্বন্ধে সাধারণত লোকের কোনো ধারণাই নেই। একটি তপ্ত খাড়া দেওয়াল থেকে সৃষ্ট

চিত্র 117



যে দুর্গে মরীচিকা দেখা গিয়েছিল তার গ্রাউণ্ড-প্ল্যান। দেওয়াল F কে A বিন্দু থেকে এবং দেওয়াল F´-কে A বিন্দু থেকে পালিশ করা বলে মনে হচ্ছিল।

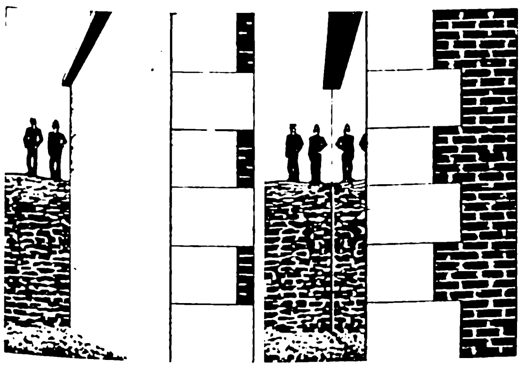
এই রকম একটি মরীচিকার বর্ণনা পাওয়া যায় এক ফরাসী ভদ্রলোকের লেখা থেকে। একটি দুর্গের প্রাচীরের কাছে আসতেই তাঁর নজরে পড়ল দেওয়ালটা হঠাৎ পালিশ করা আয়নার মতো ঝলমল করে উঠল এবং পার্শ্ববর্তী দৃশ্যাবলী প্রতিফলিত করল। আরো কয়েক পা এগোতেই ঠিক একই ধরনের পরিবর্তন নজরে পড়ল অন্য একটা দেওয়ালে। তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন এটা ঘটার কারণ হল সূর্যের তেজে দেওয়ালগুলো যথেষ্ট তেতে উঠেছিল। চিত্র 117 তে দেখান হয়েছে দেওয়ালের অবস্থান (F এবং F´) এবং যে যে জায়গায় দর্শক দাঁড়িয়েছিলেন (A এবং A´)।

ফরাসী ভদ্রলোক লক্ষ্য করেছিলেন যে, দেওয়ালটা যখনই তেতে উঠছিল তখনই মরীচিকা দেখা যাচ্ছিল। তিনি এই ঘটনার আলোকচিত্র অবধি তুলে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চিত্র 118-তে বাঁদিকে দেখান হয়েছে দুর্গের দেওয়াল F, যেটা A´ বিন্দু থেকে

তোলা আলোকচিত্রে হঠাৎ ঝকবকে আয়নার মতো হয়ে উঠেছে। ডানদিকের চিত্রটায় সেটা দেখা যাচ্ছে। বাঁদিকের চিত্রের ওই সাধারণ খসখসে ধূসর বর্ণ কংক্রিটের দেওয়ালটা নিশ্চয় তার নিকটবর্তী সৈনা দুটিকে প্রতিফলিত করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্যভাবে ওই দেওয়ালটাই, ডানদিকের চিত্রে দেখা যাচ্ছে, একটা আয়নায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং 'প্রতিসম'ভাবে (symmetrically) সন্নিহিত সৈনা দুটিকে প্রতিফলিত করছে। বলাই বাহুল্য, স্বয়ং দেওয়ালটা এই প্রতিফলন ঘটাচ্ছে না, ঘটাচ্ছে দেওয়াল সংলগ্ন তপ্ত বায়ুস্তর। গ্রীষ্মকালের

চিত্র 114



খসখসে ধূসরবর্ণ দেওয়াল (বাঁ দিকে) হঠাৎ যেন পালিশ করা আয়নার (ডান দিকে) মতো কাজ করতে লাগল।

খুব গরমের দিনে বড় বড় বাড়ির দেওয়ালের দিকে নজর দিলে, তুমিও হয়তো এ-ধরনের মরীচিকা দেখতে পাবে।

'সবুজ রশ্মি'

"তুমি কি কখনো সমুদ্রের দিগন্তে সূর্যকে অস্ত যেতে দেখেছ? নিশ্চয় দেখেছ। সূর্যের উপরকার কিনারাটাকে দিগন্ত স্পর্শ করতে ও তারপরে অদৃশ্য হওয়া অবধি লক্ষ্য করেছ কি? তাও হয়তো করেছ। কিন্তু আকাশে যখন কোনো মেঘ নেই, সেই নির্মেঘ নীল অম্বরে আমাদের উজ্জ্বল আলোকদাতা যখন তার শেষ রশ্মি বর্ষণ করে, সেই মুহূর্তটিতে কি ঘটে খেয়াল করেছ কি? সম্ভবত করনি। এই সুযোগ ছেড় না। লাল রশ্মির পরিবর্তে তুমি অপূর্ব এক সবুজ রশ্মি দেখতে পাবে। এরকম সবুজ কোনো শিল্পী কখনো সৃষ্টি করতে পারেননি। স্বয়ং প্রকৃতিও বিভিন্ন রঙের গাছপালায় বা সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছ সমুদ্রেও এমন সবুজের শোভা সৃষ্টি করেন নি।"

এক ইংরাজী দৈনিকপত্রে প্রকাশিত এই খবরটি পড়ে জুল ভার্ন-এর 'সবুজ রশ্মি'-র নায়িকা বিহ্বল হয়ে যায়। শুধু নিজের চোখে ঘটনাটা দেখার জন্য সে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। জুল ভার্নের গল্পের এই স্কটিশ মেয়েটি প্রকৃতির এই অপূর্ব সৃষ্টি কিন্তু দেখতে পায়নি। তা না পেলেও, ঘটনাটা কিন্তু সত্য। এটা কোনো পৌরাণিক কল্পনা নয়, যদিও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক কিংবদন্তী। প্রকৃতি প্রেমিক মাত্রেই এটিকে উপভোগ করতে পারেন, তবে এটিকে খুঁজে পাবার জন্য কষ্ট স্বীকার করতেই হবে।

সবুজ রশ্মি বা ঝিলিকটা আসে কোত্থেকে? প্রিজম-এর মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর দিকে তাকালে কি দেখতে পাও ভেবে দ্যাখো তো। এক কাজ করো। প্রিজম্‌টাকে চোখের কাছে তুলে ধরো। প্রিজমের চওড়া অনুভূমিক তলটা যেন থাকে নিচের দিকে। প্রিজমের ভেতর দিয়ে এবার দেওয়ালের গায়ে সাঁটা একটা কাগজের দিকে তাকাও। প্রথমেই দেখবে কাগজের টুকরোটা যেন উপর দিকে ঠেলে উঠল। তারপরে কাগজটার উপর দিকে নজরে পড়বে বেগুনী-নীলের একটি পটি আর তলার দিকে হলুদ-লালের একটা কিনারা। কাগজের উপরে উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে প্রতিসরণের দরুন, আর রঙীন ধারগুলো সৃষ্টি হবার কারণ, কাচের ধর্মই হল বিভিন্ন রঙের আলোকে বিভিন্নভাবে প্রতিসরিত করা। বেগুনী ও নীলকে তা অন্য যে কোনো রঙের চেয়ে বেশি বাঁকিয়ে দেয়। সেই জন্যই উপরের দিকে আমরা বেগুনী-নীল ফিতে দেখি। ওদিকে, কাচ যেহেতু লালকে সবচেয়ে কম বাঁকায় তাই এটাই হয় তলার দিক্‌টার রঙ।

আমার পরবর্তী ব্যাখ্যাগুলো যাতে আরও সহজে বুঝতে পারো তাই এই রঙীন পটিগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার। কাগজ থেকে বেরিয়ে আসা সাদা আলোকে প্রিজম্ বর্ণালীর সব কটা রঙে ভেঙে ফেলে। তাই কাগজের বহুবর্ণ প্রতিবিম্ব দেখা যায়। এই প্রতিবিম্বগুলো প্রতিসরণের মাত্রা অনুসারে একের পর এক এবং প্রায়ই একের উপর আরেকটি আপতিত হয়ে সাজানো থাকে। এই উপর্যুপরি আপতিত প্রতিবিম্বগুলোর সম্মিলনের ফলেই সাদা আলো সৃষ্টি হয় (বর্ণালীর আলোর সমাহার)। তবে তার উপরে এবং নিচে থাকে রঙীন পটির মতো অংশ। বিখ্যাত কবি গোটে এই পরীক্ষা করেছিলেন কিন্তু সত্যিকারের অর্থ অনুধাবন করতে পারেন নি বলে মনে করেছিলেন যে, নিউটনের রঙের তত্ত্বের খুঁত বার করেছেন। পরবর্তীকালে তিনি নিজে একটা 'রঙের তত্ত্ব' লিখেছিলেন যার ভিত্তিটা প্রায় পুরোটাই ছিল ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত।

কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি যে, তোমরা আর সে ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটাবে না এবং প্রিজম সব কিছুকে নতুনভাবে রাঙাবে, এমন আশাও করবে না।

আমরা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে একটি বিশাল বায়ুর প্রিজ্‌ম্‌ হিসাবে দেখতে পাই, যার ভূমিটি রয়েছে আমাদের দিকে ফেরানো। আমরা যখন দিগন্তের সূর্যের দিকে তাকাই আমরা সেটাকে একটা গ্যাসের প্রিজমের ভিতর দিয়ে দেখতে পাই। সূর্যের বলয়টার উপর দিকে আছে একটা নীল-সবুজ ফালি আর নিচের দিকে আছে হলদে-লাল ফালি। সূর্য যখন দিগন্তের উপরে থাকে তার উজ্জ্বলতার জন্য অন্যান্য অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল রঙের ফালিগুলো হারিয়ে যায়, আমরা তাদের একেবারেই দেখতে পাই না। কিন্তু সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের সময়ে সূর্যের পুরো বলয়টাই বলতে গেলে দিগন্তের নিচে থাকে, তখন হয়ত চোখে পড়ে যায় তার উপরদিকের কিনারায় দু ধরনের নীল রঙ সমেত ফালিটা—উপরের দিকে আকাশী নীল আর নিচের দিকে সবুজ আর নীল মিশে উৎপন্ন হালকা নীল। দিগন্তের কাছে বাতাস যদি পরিষ্কার এবং ঈষদচ্ছ (translucent) থাকে আমরা একটা নীল ফালি, বা 'নীল রশ্মি' দেখতে পাই। কিন্তু বায়ুমণ্ডল অনেক সময়ে নীল রঙগুলোকে বিচ্ছুরিত করে দেয় এবং আমরা শুধু অবশিষ্ট পড়ে থাকা সবুজ ফালিটা বা 'সবুজ রশ্মি'টাকে দেখতে পাই। অবশ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খল (turbid) বায়ুমণ্ডল নীল ও সবুজ, দুটো রঙকেই বিচ্ছুরিত করে দেয় এবং তখন আমরা কোনো রঙীন ফালিই দেখতে পাই না, অস্তগামী সূর্যকে দেখায় শুধু সিঁদুরে লাল।

সোভিয়েত জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. এ. টিখভ 'সবুজ রশ্মি' সম্বন্ধে একান্তভাবে নিয়োজিত একটি এক বিষয়ী প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর লেখা পড়ে সবুজ রশ্মি দেখার ব্যাপারে আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র লাভ করতে পারি।

" অস্তগামী সূর্য যদি গাঢ় লাল রঙ ধারণ করে এবং খালি চোখে সেদিকে তাকাতে কষ্টকর না হয়, তাহলে ধরে নিতে পারো যে, সবুজের ঝলসানি দেখা যাবে না।"

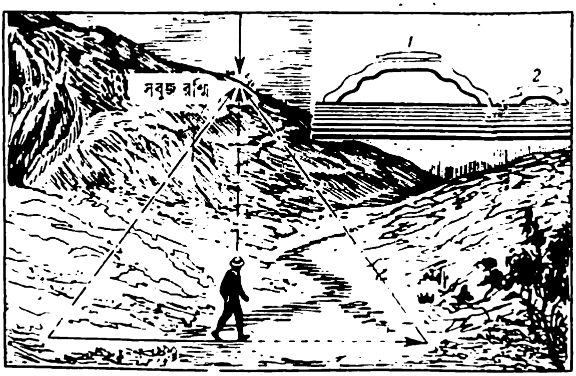
এটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই। লাল সূর্য মানেই বায়ুমণ্ডল তার নীল ও সবুজ রঙকে বিচ্ছুরিত করে দিচ্ছে কিংবা বলা যায়, সূর্যের থালার উপর দিককার পুরো কিনারাটাকেই। 'অপর দিকে', টিখভ লিখেছেন, "অস্তগামী সূর্য যখন তার স্বাভাবিক সাদাটে-হলদে রঙ প্রায় পাল্টায় না এবং খুব উজ্জ্বল দেখায় (অর্থাৎ, বায়ুমণ্ডল যখন যৎসামান্য আলো শোষণ করে—লেখক)—তখনই আপনি সবুজের ঝিলিক প্রত্যাশা করতে পারেন। অবশ্য, দিগন্তকে সেখানে একটি সরলরেখা হতে হবে, যেখানে উঁচু-নিচু কোনো অভিক্ষিপ্ততা, বনভূমি বা বাড়িঘর ইত্যাদির কোনো ব্যাঘাত প্রয়াশই থাকবে না। সমুদ্রে এই শর্তগুলোর বাস্তবতা পরিলক্ষিত হয় আর সেই জন্যই নাবিকরা সবুজ ঝলকের সঙ্গে পরিচিত।"

সংক্ষেপে গুছিয়ে বলা যেতে পারে : 'সবুজ রশ্মি' দেখতে হলে উদয়ের বা অস্তের সময় সূর্যকে নিরীক্ষণ করতে হবে আকাশকে পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অবস্থায়। উত্তর অক্ষাংশের যে কোনো স্থানের চেয়ে দক্ষিণের দিগন্ত বরাবর আকাশ অনেক বেশি স্বচ্ছ থাকে, তাই সেখানে 'সবুজ রশ্মি' দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু মধ্যবর্তী অক্ষাংশ বরাবরও এটা প্রায় দেখাই যায় না, অনেকেরই এরকম ধারণা আছে। সেটা কিন্তু ভুল ধারণা এবং আমার মনে হয় তার পিছনে রয়েছে জুল ভার্ন-এর অবদান। ভাল করে চেষ্টা করলে, আজ হোক বা কাল, তুমিও 'সবুজ রশ্মি' দেখতে পাবে। এই ঘটনাটা কিন্তু ছোট দূরবীনেও দেখা গেছে।

দুজন অ্যালসেশিয়ান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ব্যাপারটার বিবরণ দিচ্ছেন এইভাবে :

"সূর্য অস্ত যাবার ঠিক আগের মিনিটের কথা। সে সময় সূর্যের বেশ কিছুটা অংশ তখনও চোখের সামনে থাকবে। সূর্যের গোলাটার সুস্পষ্ট বহিঃসীমা ঘিরে দেখা দেবে একটা সবুজ পাড়। কিন্তু সূর্য অস্ত যাবার ঠিক আগে সেটাকে আর খালি চোখে দেখা যাবে না। অবশ্য কেউ যদি যথেষ্ট

চিত্র 119



অনেকক্ষণ ধরে "সবুজ রশ্মি" দর্শন। পর্বতশ্রেণীর পিছনে এটা 5 মিনিট ধরে দেখা গিয়েছিল। ওপরে ডান ধারের কোণে: ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রে "সবুজ রশ্মি" যে রকম দেখা গিয়েছিল। সূর্যের থালাটার আকৃতি এবড়ো-খেবড়ো।
1-সূর্যের চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বলতার জন্য খালি চোখে সবুজ কানিটা দেখা যায় না।
2-সূর্য প্রায় পুরোপুরি অস্ত যাবার পরে খালি চোখে "সবুজ রশ্মি" দেখা যায়।

শক্তিশালী দূরবীন (মোটামুটিভাবে 100 গুণ বিবর্ধনক্ষম) ব্যবহার করেন তাহলে পুরো ঘটনাটাই দেখতে পাবেন। নিদেনপক্ষে সূর্যাস্তের দশ মিনিট আগে সবুজ কানিটাকে দেখতে পাওয়া যায়। সূর্যের থালাটার উপর দিকের অর্ধেকটা

জুড়ে থাকে এটা, আর তলার অর্ধেকটা জুড়ে থাকে লাল ফালি। প্রথম দিকে কালিটা অত্যন্ত সরু থাকে। শুরুতে তা চাপের মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মতো স্থান দখল করে। সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে এটার বিস্তৃতি ঘটে এবং কখনো কখনো চাপের আধ মিনিট পর্যন্ত স্থান জুড়ে দেখা দেয়। এই সবুজ ফালির উপর দিকে প্রায়ই চোখে পড়ে একই ধরনের সবুজ আলো। সূর্যের ধীরে ধীরে অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা যেন কিনারা বরাবর সরতে সরতে ঠিক চুড়োর উপর উঠে আসে এবং কখনো কখনো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে সবুজ আলো ছড়িয়ে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।" (চিত্র 119)

সাধারণত এই ঘটনার স্থায়িত্ব দু চার সেকেণ্ডের মতো। খুবই অনুকূল পরিস্থিতিতে অবশ্য এটাকে অনেকক্ষণ বেশি দেখা যেতে পারে। পাঁচ মিনিটেরও বেশি দেখতে পাওয়ার একটা ঘটনার কথা জানা গেছে। সে সময় দূরবর্তী একটা পাহাড়ের পিছনে সূর্য ডুবছিল। দ্রুত পা চালিয়ে যাবার সময় একজন পথচারীর তখন মনে হয়েছিল যে সবুজ কালিটা যেন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে (চিত্র 119)।

সূর্যোদয়ের সময়েও 'সবুজ রশ্মি' দেখা গেছে বলে জানি আমরা। সূর্যোদয় মানে আমাদের এই পৃথিবীর আলোকদাতা তখন দিগন্ত থেকে উঁকি মারতে শুরু করে। এই সময়ে 'সবুজ রশ্মি' দেখতে পাওয়ার ঘটনা পণ্ডিতদের একটা ভুল ধারণাকে শুধরনোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কারণ অনেকেই বলেন যে, এ ব্যাপারটা নাকি একটা চোখের ভুল ছাড়া কিছুই নয়। উজ্জ্বল অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাদের চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে বলেই এমনটা দেখায়। সূর্যোদয়ের সময়ে দেখা 'সবুজ রশ্মি' এই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। এখানে বলে রাখি নক্ষত্রজগতে সূর্যই একমাত্র 'সবুজ রশ্মি' বিতরণ করে না। Venus-ও অস্ত যাবার সময়ে একরকম করে।

পরিচ্ছেদ ৭

দৃষ্টি

আলোকচিত্রণ উদ্ভাবনের আগে

আজকাল আলোকচিত্রণ এত সাধারণ একটা ঘটনা হয়ে গেছে যে, ভাবতে অসুবিধা হয়, গত শতাব্দীতেও আমাদের পূর্বপুরুষরা এটির অবর্তমানে কি করে কি করতেন। প্রায় শ'খানেক বছর আগে ব্রিটিশ কারারক্ষী অফিসাররা কিভাবে একজনের চেহারার নকল তৈরি করতেন, তার এক মজাদার কাহিনী বলেছেন চার্লস ডিকেন্স তাঁর 'পস্‌থোমাস্‌ পেপারস্‌ অফ দা পিকউইক ক্লাব'-এ। ঘটনার স্থান ঋণীদের কারাগার, পিকউইককে যেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। পিকউইক্‌কে বলা হল, ছবির জন্য তাকে বসতে হবে।

" 'আমার ছবি আঁকা হবে বলে বসে থাকব !' মিস্টার পিকউইক বললেন।

" 'আপনার চেহারার একটা নকল নেওয়া হবে স্যার্‌।' গাট্টাগোট্টা পাহারাদার বলল।

" 'নকল নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের এখানে দারুণ ব্যবস্থা আছে। দেখতে না দেখতে কাজ শেষ হয়ে যাবে, এবং সবসময়েই একেবার অবিকল নকল। ভেতরে আসুন স্যার, কোনো রকম দ্বিধা করবেন না।'

" 'মিস্টার পিকউইক আমন্ত্রণ গ্রহণে বাধ্য হয়ে উপবিষ্ট হলেন। মিস্টার ওয়েলার এসে দাঁড়ালেন তাঁর চেয়ারের পিছনে। ফিসফিস করে জানালেন, এই বসাটা আসলে এমন একটা ব্যবস্থা যাতে বিভিন্ন পাহারাদাররা কয়েদী ও দর্শনার্থীদের আলদাভাবে চিনতে পারে।

" 'শোনো, সর্দার', মিস্টার পিকউইক বললেন, 'এবার বোধহয় শিল্পীদের আসা উচিত। সবার সামনে এরকম একটা জায়গায় বসে থাকা…'

" 'মনে হয় ওরা এখুনি এসে পড়বে।' সর্দার বলল। 'ওই দেখুন স্যার ওটা একটা ডাচ্‌ ঘড়ি।'

" 'তাই তো দেখছি।' মিস্টার পিকউইক অভিমত দিলেন।

" 'আর ওই একটা পাখির খাঁচা। বাড়ির মধ্যে বাড়ি, কারাগারের মধ্যে কারাগার। তাই না স্যার ?' সর্দার বলল।

"মিস্টার ওয়েলার যখন এই দার্শনিক মন্তব্য করছিলেন তার মধ্যেই মিস্টার পিকউইকের ছবি আঁকার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। মিস্টার পিকউইকও সেটা টের পেয়েছিলেন। গাঁট্টাগোট্টা এক পাহারাদারের পাহারার পালা শেষ হয়েছে। সে দরজা ছেড়ে এসে বসে পড়েছে। অসতর্ক দৃষ্টিতে তাঁকে লক্ষ্য করছে। ওদিকে যে লম্বা পাহারাদারটা ওর জায়গায় এসেছে, সে উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে কোটের নিচে দু হাত ঢুকিয়ে একদৃষ্টে বেশ কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করল মিস্টার পিকউইককে। তৃতীয় আরেকজন, কিঞ্চিৎ বিরক্ত মুখে এসে দাঁড়িয়েছে মিস্টার পিকউইকের কাছ ঘেঁষে। বোধ হয় তাঁর চা পানে বিঘ্ন ঘটেছে, কারণ তিনি যখন প্রবেশ করেন তাঁর মুখের মধ্যে তখনও মাখন-পাঁউরুটির শেষ টুকরোটা ছিল। দু'হাত কোমরে রেখে ভদ্রলোক চোখ কুঁচকে নিরীক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে আরও দুজন যোগ দিয়েছে এদের দলে। দারুণ মনোযোগ দিয়েও চিন্তিতভাবে তারা পিকউইকের চেহারার বৈশিষ্ট্য খুঁটিয়ে দেখছে। এই ঘটনাক্রম চলাকালীন মিস্টার পিকউইক রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছিলেন এবং চেয়ারে বসে থাকাটাই যেন কণ্টকর হয়ে উঠেছিল। তবে এই সময়ে কাউকে লক্ষ্য করে তিনি কোনো মন্তব্য করেন নি। এমন কি সর্দারকেও কোনো কিছু বলেন নি। সে তখন চেয়ারের পিছনে ঠেস দিয়ে বসে শুধু মনিবের অবস্থার কথা চিন্তা করছিল আর ভাবছিল, আইন ও শান্তিভঙ্গের দায়ে পড়তে না হলে যে কটা পাহারাদার জমা হয়েছে সব কটাকে আক্রমণ ও কাবু করার এমন আনন্দদায়ক সুযোগ সে কখনই নষ্ট হতে দিত না।

"অবশেষে অনেকক্ষণ পরে নকল গ্রহণের কাজ শেষ হল এবং মিস্টার পিকউইককে জানানো হল তিনি এখন কারাগারে যেতে পারেন।"

এরও আগে এরকম স্মৃতিতে ধারণ-করা 'প্রতিকৃতি'র বদলে কয়েকটি 'বৈশিষ্ট্যের' তালিকা দিয়েই কাজ চালানো হত। পুশকিন তাঁর 'বরিস গোদিউনভ'-এ লিখেছেন, গ্রেগরি ওৎরেপাইয়েভকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল জারের খাতায়ঃ "চেহারায় খাটো. চওড়া বুক. একটা হাত লম্বায় অন্যটার চেয়ে কম, নীল চোখ, হলদে চুল. গালের উপর একটা আর কপালের উপর আরেকটা আঁচিল আছে।" এখন আর আমাদের এসবের দরকার নেই। শুধু একটা আলোকচিত্র তুলে নিলেও কাজ হয়ে যায়।

কি করে করতে হয় অনেকেই জানে না

রাশিয়ায় আলোকচিত্রণের প্রথম প্রচলন ঘটে 1840 নাগাদ। সেটা ছিল দাগারোটাইপ পদ্ধতির। ধাতব পাতের উপর ছাপ তোলার এই পদ্ধতিটির নামকরণ হয়েছিল এটির উদ্ভাবক দ্যগারের নামানুসারে। পদ্ধতিটা মোটেই

সুবিধাজনক ছিল না। একজনকে দীর্ঘ সময় ধরে—প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো পোজ নিয়ে থাকতে হত। লেনিনগ্রাদের পদার্থবিদ অধ্যাপক বি. পি. ভাইনবার্গ আমাকে বলেছিলেন, "আমার ঠাকুর্দা ক্যামেরার সামনে চল্লিশ মিনিট বসার পর তবে একটা মাত্র দাগারোটাইপ পেয়েছিলেন। তার থেকে আবার কোনো প্রিণ্ট নেওয়া সম্ভব ছিল না।"

কিন্তু শিল্পীকে না ডেকেই নিজের ছবি পাওয়ার এই সুযোগটা সাধারণ লোকের কাছে অভিনব বলে মনে হয়েছিল। বেশ কিছুদিন লেগেছিল ব্যাপারটার নতুনত্ব ঘুচতে। 1845 সালের পুরনো একটা রুশ পত্রিকায় এ-সম্বন্ধে মজাদার একটা গল্প ছাপা হয়েছিল :

"এখনও অনেকেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে. দাগারোটাইপ আপনা থেকেই কাজ করে। এক দিন এক ভদ্রলোক তার প্রতিকৃতি তৈরি করাতে এলেন। মালিক [আলোকচিত্রী—লেখক] তাঁকে বসতে অনুরোধ করলেন। তারপরে লেন্স নিয়ন্ত্রণ করে একটা প্লেট ঢুকিয়ে ঘড়ির দিকে তাকালেন। আলোকচিত্রী অতঃপর ঘর ছেড়ে চলে যেতেই ভদ্রলোক মনে করলেন আর চুপটি করে বসে থাকার দরকার নেই। তিনি উঠে দাঁড়লেন, এক টিপ নস্যি নিলেন, চার ধার থেকে পর্যবেক্ষণ করলেন ক্যামেরাকে, লেন্সের কাছে চোখ নিয়ে গিয়ে দেখলেন, ঘাড় নেড়ে বিড় বিড় করে বলেলেন. 'কি কলই না বানিয়েছে।' তারপর শুরু করলেন তিনি ঘরের মধ্যে পায়চারি।

"মালিক ফিরে এসে ব্যাপার দেখে স্তম্ভিত। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন ; 'আপনি করছেন কি ? বললাম না স্থির হয়ে বসে থাকতে !'

" 'বসে ছিলাম তো। আপনি বেরিয়ে গেলেন তারপরে তো উঠেছি।'

" 'আহা ঠিক তখনই তো আপনার চুপ করে বসে থাকা উচিত ছিল।'

" 'অকারণে চুপ করে বসে থাকব কেন ? ভদ্রলোক পাল্টা প্রশ্ন করলেন।'

আজকের দিনে আমরা নিশ্চয় অতটা সারল্য প্রকাশ করি না।

তবু আলোকচিত্রণের কিছু কিছু ব্যাপার আছে যা অনেকেই জানে না। যেমন ধরা যাক, একটা আলোকচিত্রকে কিভাবে দেখতে হবে সেটা কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানে। সত্যিই তাই। আলোকচিত্রণের প্রচলনের পর এক শতাব্দী পেরিয়ে গেছে, এখন ঘরে ঘরে এর চল, তবু ব্যাপারটা যতটা সোজা মনে হয় তা নয়। সত্যি বলতে, পেশাদাররাও ঠিক ঠিক ভাবে আলোকচিত্রের দিকে তাকায় না।

কিভাবে আলোকচিত্র দেখতে হয়

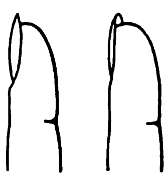
আলোকতত্ত্বের একই ভিত্তির উপর নির্ভর করে আমাদের চোখ ও ক্যামেরা। ক্যামেরার ঘষা কাচের পর্দার উপর যা কিছুর প্রক্ষেপ করা হয় তা নির্ভর করে

লেন্স ও বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর। ক্যামেরা এমন একটা দৃষ্টিকোণ (perspective) প্রদান করে যেটা লেন্সের বদলে আমাদের চোখ বসালে আমরা শুধু এক চোখ দিয়েই দেখতে পেতাম। কথাটা ভাল করে খেয়াল করো। কাজেই আমরা যদি আলোকচিত্র থেকে সেই দর্শন অনুভূতি লাভ করতে চাই যা ছবির বস্তুটি স্বয়ং সৃষ্টি করত, তাহলে সর্বপ্রথম আমাদের শুধু এক চোখ দিয়ে আলোকচিত্রটি দেখা উচিত, এবং দ্বিতীয়ত সেটাকে ধরা উচিত প্রকৃত দূরত্বে।

দু'ই চোখ দিয়ে তুমি যখন কোনো আলোকচিত্র দেখ তখন যে ছবিটা পাও সেটা চ্যাপ্টা, ত্রিমাত্রিক নয়। এটা আমাদের দৃষ্টির ত্রুটি। কোনো আকার বিশিষ্ট বস্তুর দিকে আমরা যখন তাকাই, দু'চোখের রেটিনার উপর তার যে প্রতিবিম্ব পড়ে, সে দু'টি কিন্তু এক রকমের নয় (চিত্র 120)। এই জন্যই একটা বস্তুর উঁচু-নিচু তারতম্য আমরা দেখতে পাই। আমাদের মস্তিষ্ক দুটি ভিন্ন প্রতিবিম্বকে একত্রিত করে দেয় এবং সেটা তখন তার গভীরতার তারতম্য সমেত ধরা দেয়। এইটাই হল স্টিরিওস্কোপের মূল তত্ত্ব। অন্য দিকে আমরা যদি চ্যাপ্টা কোনো কিছুর দিকে তাকাই—যেমন ধরা যাক একটা দেওয়াল—তখন দুটো চোখই অনুভূতিতে একই ধরনের ছবি পায় যার থেকে মস্তিষ্ক জানতে পারে যে, আমরা যে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে আছি সেটা সত্যিই চ্যাপ্টা।

এবার তোমার বোঝা উচিত দু'চোখ দিয়ে একটা আলোকচিত্র দেখার সময়

চিত্র 120



মুখের কাছে ধরলে বাঁ এবং ডান চোখ একটা আঙুলকে এই রকম স্বতন্ত্রভাবে দেখে।

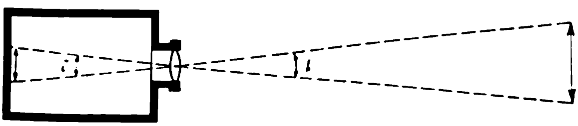
আমরা কি ভুলই না করি। এভাবে দেখা মানেই নিজেদের বিশ্বাস করতে বাধ্য করা যে আমাদের সামনে যে ছবিটা রয়েছে সেটা চ্যাপ্টা। আমরা দু' চোখ দিয়ে একটা আলোকচিত্র দেখি অথচ সেটা আসলে দেখার কথা এক চোখ দিয়ে। তা না করায় আলোকচিত্র যে ছবিটি দেখাতে চায় সেটা আমরা নিজেদের দেখতে দিই না এবং এর ফলে ক্যামেরা কর্তৃক অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা মায়াময়তাকে আমরা নষ্ট করি।

আলোকচিত্রকে কত দূরে ধরা দরকার

আলোকচিত্রকে প্রকৃত দূরত্বে ধরার ব্যাপারে যে দ্বিতীয় নিয়মের কথা বলেছিলাম, সেটাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। না হলে আমরা ছবিটার ভুল পরিপ্রেক্ষণ

পাব। কত দূরে ধরা দরকার একটা আলোকচিত্রকে ? প্রকৃত চিত্রটাকে পুনসৃষ্টি করতে হলে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকচিত্রটাকে দেখা দরকার ঠিক যেখান থেকে ক্যামেরার লেন্সটা তার ঘষা কাচের পর্দার উপর প্রতিবিম্বটা পুনর্গঠিত করেছিল। কিংবা বলা যেতে পারে, ঠিক যেভাবে সেটা আলোকচিত্রের বস্তুটিকে 'দেখেছিল' (চিত্র 121)। ফলে আলোকচিত্রটিকে চোখের কাছ থেকে এমন দূরত্বে রাখতে হবে যাতে এই দূরত্ব, বস্তু ও লেন্সের মধ্যের দূরত্বের তত ভাগ কম হয়, ঠিক যত ভাগ কম হয় বস্তুর প্রতিবিম্ব তার প্রকৃত আকারের থেকে। অন্য ভাবেও বলা যায় কথাটা। আলোকচিত্রটাকে এমন দূরত্বে রাখতে হবে যেটা মোটামুটিভাবে ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল দূরত্বের সমান।

চিত্র 121



ক্যামেরার মধ্যে কোণ 1, কোণ 2-এর সমান।

এখন বেশির ভাগ ক্যামেরারই ফোকাল দূরত্ব হয় 12-15 সেমি (এই বইটি লেখার সময় প্রচলিত ক্যামেরার কথা ভেবেই লেখক এই উক্তি করেছেন।—সম্পাদক), তাই এসব ক্যামেরায় তোলা ছবি আমরা কখনই প্রকৃত দূরত্বে রেখে দেখতে পাব না, কারণ খুব ভাল হলেও সাধারণ মানুষের চোখের ফোকাল দূরত্ব (25 সেমি) ক্যামেরার ফোকাল দূরত্বের দ্বিগুণ হয়। দেওয়ালে লাগানো একটা আলোকচিত্রও চ্যাপ্টা লাগে, কারণ আরো অনেক দূর থেকে এটাকে দেখা হয়। কেবল নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যাদের চোখের ফোকাল দূরত্ব কম হয় এবং শিশুরা, যারা খুব কাছের জিনিসও দেখার ব্যবস্থা করে নিতে পারে—এদের পক্ষেই এক মাত্র এক চোখ দিয়ে দেখে একটা আলোকচিত্রকে ঠিক মতো উপভোগ করা সম্ভব। কারণ, এরা যখন কোনো আলোকচিত্রকে 12-15 সেমি দূরে ধরে, তখন চ্যাপ্টা প্রতিবিম্ব দেখে না, বস্তুর গভীরতার তারতম্যও দেখতে পায়—ঠিক যে ধরনের প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে স্টিরিওস্কোপ।

আমার মনে হয়, এবার আমি যে কথাটা বলব সেটা শুনে তোমরা আর আপত্তি জানাবে না। একমাত্র অজ্ঞতার কারণেই আলোকচিত্র যে আনন্দ দিতে পারে তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না, এবং প্রায়ই আমরা অকারণে সেগুলোকে জীবন্ত নয় বলে মন্তব্য করি।

বিবর্ধক লেন্সের অদ্ভুত প্রভাব

নিকট-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা সাধারণ আলোকচিত্রেও গভীরতার তারতম্য সহজেই দেখতে পায়। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা তাহলে কি করবে? এ ব্যাপারে বিবর্ধক লেন্স তাদের সাহায্য করতে পারে। দুগুণ বিবর্ধনের ক্ষমতা বিশিষ্ট লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোকচিত্র দেখলে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেও নিকট-দৃষ্টিসম্পন্নের মতোই পূর্বোক্ত সুবিধা ভোগ করবে। দৃষ্টিকে পীড়িত না করেও ছবিতে গভীরতার তারতম্য দেখতে পাবে।

এভাবে দেখা আর অনেকটা দূর থেকে দু'চোখ দিয়ে আলোকচিত্র দেখার মধ্যে অনুভূতির বিরাট তফাত ঘটে যায়। এতে প্রায় স্টিরিওস্কোপের ফল পাওয়া যায়। এবার আমরা জেনে ফেলেছি, কেন এক চোখ দিয়ে বিবর্ধক কাচ ব্যবহার করে দেখার সময় আলোকচিত্র অনেক সময়েই ত্রিমাত্রিক চরিত্র ধারণ করে। এই তথ্যটা সাধারণভাবে অনেকেরই জানা কিন্তু কদাচিৎ তার কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই বইটির একজন সমালোচক আমাকে এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন:

"ভবিষ্যৎ কোনো সংস্করণে আপনার এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা উচিত—বিবর্ধক লেন্স দিয়ে দেখার সময়ে আলোকচিত্র কেন ত্রিমাত্রিক হয়ে দেখা দেয়। কারণ আমার মতে এই বইয়ে স্টিরিওস্কোপ সংক্রান্ত আলোচনা এ বিষয়ের উপর কোনো আলোকপাত করতে পারে না। এক চোখ দিয়ে স্টিরিওস্কোপ দেখার চেষ্টা করুন। তত্ত্ব যাই বলুক ছবিটাকে ত্রিমাত্রিক বলেই মনে হয়।"

তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, এর থেকে স্টিরিওস্কোপিক দৃষ্টির তত্ত্বের কোনো খুঁত খুঁজে বার করা যায় না। খেলনার দোকানে পরিদৃশ্য (panorama) নামে যা বিক্রি হয় তার অদ্ভুত ব্যাপারটার পিছনেও রয়েছে এই একই তত্ত্ব। এটা একটা ছোট্ট বাক্স যার মধ্যে রাখা হয় সাধারণ একটা আলোকচিত্র—হয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, নয় মানুষজনের। একটি বিবর্ধক লেন্সের মধ্য দিয়ে এক চোখ দিয়ে সেটা দেখতে হয়। ফলে এটা আপনা থেকেই স্টিরিওস্কোপিক গুণ অর্জন করে। এই দৃষ্টিবিভ্রমকে সাধারণত আরোই বাড়িয়ে তোলা হয় আসল আলোকচিত্রের সামনের দিকে কাগজ বা পিচবোর্ড কেটে তৈরি করা কিছু বস্তু স্থাপন করে। নিকটবর্তী বস্তুর ত্রিমাত্রিকতা সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি খুব সজাগ। দূরবর্তী বস্তু সম্বন্ধে কিন্তু এই অনুভূতি ততটা প্রখর নয়।

বড় করা আলোকচিত্র

আমরা কি এমন আলোকচিত্র তৈরি করতে পারি যাতে বিবর্ধক লেন্স ব্যবহার না করেই সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ সেটাকে যথাযথভাবে দেখতে পাবে? ফোকাল দূরত্ব বেশি এমন ধরনের লেন্স বিশিষ্ট ক্যামেরা ব্যবহার করলেই সেটা

সম্ভব। ইতিমধ্যেই তোমরা জেনে ফেলেছ যে, 25-30 সেমি ফোকাল দূরত্ব বিশিষ্ট লেন্সের সাহায্যে তোলা একটা আলোকচিত্রকে যদি সাধারণ দূরত্ব থেকে এক চোখ দিয়ে দেখা হয় তবে তার মধ্যে গভীরতার বোধ জন্মাবে।

এমন আলোকচিত্রও তোলা যায় যা বেশ কিছুটা দূর থেকে দু'চোখ দিয়ে দেখলেও চ্যাপ্টা লাগবে না। তোমাদের আগেই বলেছি যে দুটি এক ধরনের রেটিনার প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে মিলে মিশে একটা চ্যাপ্টা ছবি হয়ে যায়। অবশ্য বস্তু থেকে দূরত্ব যত বাড়ে আমাদের মগজের পক্ষে ওই কাজ করাটা ততই কঠিন হয়ে পড়ে। 70 সেমি ফোকাল দূরত্ব বিশিষ্ট লেন্সের সাহায্যে তোলা আলোক-চিত্র দু চোখ দিয়ে দেখলেও তার গভীরতার বোধ নষ্ট হয় না।

এ ধরনের লেন্স ব্যবহার করা সব সময়ে সুবিধাজনক নয়, তাই তোমাদের আরেকটা পদ্ধতির কথা বলছি। সেটা হল, আলোকচিত্র যে কোনো সাধারণ ক্যামেরা দিয়েই তোল ক্ষতি নেই, শুধু সেটাকে বড় করে নিলেই হবে। এর ফলে আলোক-চিত্রটাকে যথাযথভাবে দেখবার দূরত্বটা বৃদ্ধি পায়। 15 সেমি লেন্স দিয়ে তোলা একটা আলোকচিত্রকে চার বা পাঁচ গুণ বড় করে নিতে পারলেই যথেষ্ট। সেটাকে তখন 65 থেকে 75 সেমি দূরে রেখে দু'চোখ দিয়ে দেখতে পারবে। এটা ঠিক যে ছবিটার তীক্ষ্ণতা একটু কমে যাবে, কিন্তু ওই দূরত্বে সেটা প্রায় চোখেই পড়বে না। কিন্তু স্টিরিওস্কোপিক প্রভাব ও গভীরতার দিক থেকে তোমার লাভ ছাড়া আর কিছু হবার সম্ভাবনা নেই।

সিনেমা হলের সেরা আসন

সিনেমা-দর্শকেরা খুব সম্ভবত লক্ষ্য করেছে যে. কোনো কোনো সিনেমা যেন হঠাৎ খুব জীবন্ত হয়ে ওঠে। গভীরতার বোধ মাঝে মাঝে এত স্পষ্ট হয় যে মনে হয় রক্তমাংসের অভিনেতাদের আর সত্যিকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। সাধারণ ধারণা যাই হোক, এটা কিন্তু ফিল্মের জন্যে ঘটে না, তুমি কোথায় আসন গ্রহণ করেছ, তার উপরেই নির্ভর করে। যদিও চলচ্চিত্র এমন ক্যামেরায় তোলা হয় যাদের ফোকাল দূরত্ব খুবই কম, কিন্তু পর্দার উপরে তাদের প্রক্ষেপ কয়েক শ' গুণ বিবর্ধিত হয়—এবং বেশ কিছু দূর থেকে (10 সেমি × 100 = 10 মি) দু'চোখ দিয়ে তুমি সেটা লক্ষ্য করতে পারো।

ছবি তোলার সময় মুভি ক্যামেরা ঠিক যে দৃষ্টিকোণ থেকে 'তাকিয়েছিল' তুমিও যদি সেই কোণ থেকে ছবিটাকে দ্যাখো তাহলেই গভীরতার বোধ সবচেয়ে ভালভাবে পাওয়া যায়।

দর্শনের এই সুবিধাজনক কোণের বিচারে দূরত্বের হিসাবটা কিভাবে করা হবে ? প্রথমত, এমন একটা আসন বেছে নিতে হবে যা পর্দার ঠিক মাঝখানের বিপরীতে থাকে। দ্বিতীয়ত, আসনটা পর্দা থেকে সেই দূরত্বে থাকা দরকার,

যা পর্দার প্রস্থের ঠিক ততগুণ বেশি হবে, ঠিক যতগুণ বেশি মুভি ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল দূরত্বটা ফিল্মের প্রস্থ থেকে। কিসের ছবি তোলা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে মুভি-ক্যামেরার লেন্সের ফোকাল দূরত্ব সাধারণত 35 মিমি, 50 মিমি, 75 মিমি বা 100 মিমি হয়। ফিল্মের প্রমাণ প্রস্থ 24 মিমি। উদাহরণ হিসাবে 75 মিমি ফোকাল দূরত্ব ধরে আমরা এই অনুপাতটা পাচ্ছি:

$$\frac{\text{দূরত্ব}}{\text{পর্দার প্রস্থ}} = \frac{\text{ফোকাল দূরত্ব}}{\text{ফিল্ম প্রস্থ}} = \frac{75}{24} \simeq 3$$

কাজেই, পর্দা থেকে কত দূরে বসবে তা বার করার জন্য তোমায় পর্দার বা পর্দার উপরে ছবির প্রক্ষেপের প্রস্থকে তিন দিয়ে গুণ করতে হবে। প্রস্থটা যদি তোমার ছ'পা সমান হয় তাহলে পর্দা থেকে আঠের পা দূরে তোমার আসন নেওয়া উচিত। স্টিরিওস্কোপ জাতীয় কোনো কিছু পরীক্ষা করে দেখার সময় এই কথাগুলো মনে রেখো, কারণ তখন হয়তো দেখবে যেটাকে উদ্ভাবন বলে চালানো হচ্ছে সেটা আসলে পূর্বোক্ত পরিস্থিতির কারণেই ঘটছে।

সচিত্র পত্রিকার পাঠকদের জন্য

বই এবং পত্রিকায় ছাপা ছবির সঙ্গে মূল আলোকচিত্রের—যার থেকে এগুলোর পুনর্মুদ্রণ হয়েছে—তাদের ধর্মের কোনো তফাত নেই। যথাযথ দূরত্ব থেকে এক চোখ বন্ধ করে দেখলে এগুলোরও গভীরতার তারতম্য ধরা পড়ে। কিন্তু বিভিন্ন আলোকচিত্র যেহেতু বিভিন্ন ফোকাল দূরত্ব সম্পন্ন লেন্স বিশিষ্ট ক্যামেরায় তোলা তাই প্রকৃত দূরত্ব বার করতে হলে বারে বারে পরীক্ষা ও ত্রুটি সংশোধন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। একটা চোখকে হাত চেপে আড়াল করে ছবিটাকে হাত খানিক দূরে ধরো। ছবিটার তল থাকবে তোমার দৃষ্টিরেখার সমকোণে এবং তোমার খোলা চোখটা থাকবে ছবির ঠিক মাঝ বরাবর। চোখ খোলা রেখেই আস্তে আস্তে ছবিটাকে কাছে নিয়ে এসো, তাহলেই বুঝতে পারবে ঠিক কোন মুহূর্তে ছবিটার গভীরতার তারতম্য সবচেয়ে ভালভাবে ধরা পড়ছে।

এমন অনেক ছবি আছে যা সাধারণভাবে দেখলে ঝাপসা এবং চ্যাপ্টা মনে হয় কিন্তু আমার নির্দেশ মতো দেখলে ছবিটার গভীরতা এবং স্পষ্টভাব চোখে পড়বে। এমন কি জলের ঝলমলানি এবং এই জাতীয় বিশুদ্ধ স্টিরিওস্কোপিক বৈশিষ্ট্যগুলোও ধরা পড়বে।

ভাবলে অবাক লাগে যে, জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ে এই সব সহজ জিনিসের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল অর্ধ শতাব্দীরও আগে কিন্তু তবু খুব কম লোকেই এগুলো ঠিক ঠিক জানে। উইলিয়াম কার্পেন্টার তাঁর 'প্রিন্সিপ্‌লস অফ মেণ্টাল ফিজিওলজি উইথ দেয়ার অ্যাপ্লিকেশন টু দা ট্রেনিং অ্যান্ড ডিসিপ্লিন অফ দা

মাইণ্ড, অ্যাণ্ড দা স্টাডি অফ ইটস্ মরবিড্ কন্ডিশনস্' গ্রন্থে কিভাবে আলোকচিত্র দেখতে হয় সে সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ

"এটা খুবই লক্ষণীয় যে, আলোকচিত্র দেখার এই পদ্ধতি আয়ত্ত করলে শুধু যে বস্তুর ত্রিমাত্রিকতাটিই ফুটিয়ে তুলতে পারা যায় তাই নয়, আরও অনেক কিছু বৈশিষ্ট্য তাতে এমনভাবে চোখে পড়ে যা বাস্তবের খুবই কাছাকাছি। ফলে তা আরও অনেক বেশি ইঙ্গিতপূর্ণ হয়ে ওঠে। এটা বিশেষভাবে নজরে পড়ে যখন 'স্থির জলাশয়ে'র ছবি তোলা হয়। সাধারণত আলোকচিত্রের মধ্যে এগুলোই সবচেয়ে অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। 'দু'চোখ' দিয়ে দেখলে যদিও তার উপরিভাগটাকে সাদা মোমের মত অস্বচ্ছ লাগে, তবু শুধু 'এক চোখে' দেখলে পরেই তার মধ্যে অপূর্ব গভীরতা ও স্বচ্ছতা অর্পিত হয়। যে সব তল থেকে আলো প্রতিফলিত হয়, যেমন ব্রোঞ্জের কিংবা হাতির দাঁতের জিনিস থেকে, সেগুলোর চরিত্র সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। দু'চোখের বদলে এক চোখ দিয়ে দেখলে আলোকচিত্র থেকে মূল বস্তুটি কিসের তৈরী তা আঁচ করতে খুব একটা অসুবিধা হয় না (অবশ্য স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করলে অন্য কথা)।"

আরেকটা কথাও খেয়াল রাখা দরকার। বিবর্ধিত আলোকচিত্র, আমরা আগেই দেখেছি বেশি জীবন্ত হয়; কিন্তু ছোট মাপের আলোকচিত্র তা হয় না। এটা ঠিক যে, ছোট আলোকচিত্রে সাদা-কালোর বৈপরীত্য অনেক ভাল খোলে, কিন্তু ছবিগুলো থেকে বস্তুর উঁচু নীচু অংশের বোধ ভালভাবে পাওয়া যায় না। কেন এমন হয় তোমাদের এখন বলতে পারা উচিত—এই ছবিগুলোর আনুষংগিক দৃষ্টিকোণ (perspective) এমনিতেই সীমিত—ছোট হলে তা আরো কমে যায়।

কিভাবে অংকিত চিত্র দেখতে হয়

আলোকচিত্রের সম্বন্ধে যা বলেছি আঁকা ছবির বেলায়ও তার অনেকটাই খাটে। প্রকৃত দূরত্ব থেকেই তাদের সবচেয়ে ভাল দেখায়, কারণ শুধু তখনই সেটার ত্রিমাত্রিকতা ধরা দেয়। আরও ভাল হয় যদি এক চোখ দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয়, বিশেষ করে ছবি যদি ছোট হয়।

কার্পেণ্টার আগের বইটিতেই লিখেছেন, "এটা অনেক দিন ধরেই জানা আছে যে, আমরা যদি স্থির দৃষ্টিতে একটা ছবির দিকে তাকাই, যার চিত্রানুপাতিক প্রক্ষেপ, আলো ও ছায়া, এবং সূক্ষ্ম বর্ণনাসমূহ মূল বাস্তবের প্রতিনিধি স্বরূপ, তাহলে ছবিটির সৃষ্ট-প্রভাব আরও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে, যদি আমরা তা দুয়ের বদলে শুধু এক চোখ দিয়ে দেখি। তাছাড়া ছবিটির আশপাশকে সযত্নে দৃষ্টির বাইরে রাখার জন্য আমরা যদি একটা যথাযথ আকার ও আকৃতির নলের মধ্য দিয়ে দেখি তাহলে ছবিটার জীবন্ত ভাব আরও বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনাটিকে

সাধারণত পুরোপুরি ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। লর্ড বেকন বলেছেন, 'দুইয়ের বদলে এক চোখ দিয়ে আমরা খুব সুন্দরভাবে দেখতে পাই, কারণ এর ফলে প্রাণসত্তা অধিকতর একত্রিত হয় এবং জোরালো হয়ে ওঠে।' অন্যান্য লেখকরাও, ভিন্ন ভাষায় হলেও বেকনের সঙ্গে একমত যে, এক চোখ ব্যবহারের সময় এই ঘটনার জন্য দায়ী দৃষ্টিক্ষমতার সমাহরণ। কিন্তু আসল কথা হল, কাছাকাছি দূরত্বে আমরা দু'চোখ দিয়ে দেখার সময় ছবির জিনিসটাকে চ্যাপ্টাভাবে দেখতে বাধ্য। কিন্তু এক চোখ দিয়ে দেখলে পরিপ্রেক্ষণ, আলোছায়ার খেলা ইত্যাদির ইঙ্গিত অনুসারে আমাদের মন এমন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে যে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ছবিটার ত্রিমাত্রিকতা হয়তো ফুটে ওঠে, এমন কি একটা মডেলের ঘনত্বও হয়তো ধারণ করতে পারে।"

বড় চিত্রের ক্ষুদ্রাকৃতি আলোকচিত্রে অনেক সময় মূলের চেয়ে ভালভাবে ত্রিমাত্রিকতাকে ধরা দেয়। এর কারণ হল আকারে ছোট হওয়ার জন্য ছবিটিকে সাধারণত যে দূরত্ব থেকে দেখার কথা সেটা হ্রাস পেয়ে বাস্তবে যে দূরত্বে দেখছি সেই দূরত্বে নেমে আসে এবং তখন ঐ নিকটবর্তী অবস্থানেই আলোকচিত্রটি সজীব হয়ে ওঠে।

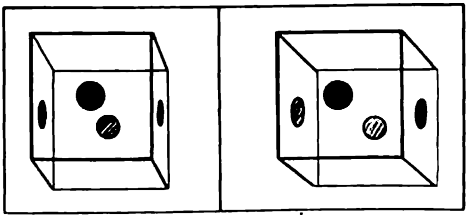
স্টিরিওস্কোপ

ঘন বস্তুকে আমরা দুইয়ের বদলে ত্রিমাত্রিক রূপে দেখি কেন? এটা তো ঠিক যে, অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব চ্যাপ্টাই হয়। তাহলে অনুভূতির চিত্রে আমরা জ্যামিতিক ঘনত্ব পাই কিভাবে? এর বেশ কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, বস্তুর বিভিন্ন অংশ ভিন্নভাবে আলোকিত থাকার জন্য তার আকৃতি বুঝতে সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির দূরত্ব চোখের কাছ থেকে সমান নয় বলে তাদের স্পষ্টভাবে দেখার জন্য চোখকে ধাতস্থ করায় আমাদের যে চেষ্টাটুকু করতে হয়, তারও একটা ভূমিকা আছে। এবং তৃতীয়ত ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল দুই অক্ষিপটে প্রতিবিম্ব দুটি ভিন্ন হয়। পর্যায়ক্রমে ডান এবং বাঁ চোখ বন্ধ করে নিকটবর্তী কোনো বস্তুর দিকে তাকালে ব্যাপারটাকে সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব (চিত্র 120 এবং 122)।

এবার একই বস্তুর দুটো অঙ্কনের কথা চিন্তা করো। একটা বাঁ চোখ দিয়ে দেখা ও অন্যটা ডান চোখ দিয়ে। আমরা যদি চিত্রদুটোর দিকে এমনভাবে তাকাই যাতে প্রত্যেকটা চোখ শুধু তার 'নিজের' ছবিটা দেখতে পায় তাহলে দু'টো স্বতন্ত্র চ্যাপ্টা ছবির পরিবর্তে আমরা একটা ত্রিমাত্রিক ছবি দেখতে পাই। ঘন বস্তুর দিকে এক চোখে তাকিয়ে যে ত্রিমাত্রিক অনুভূতি পাওয়া যায় এটা তার থেকেও বেশি।

এই যুগ্ম-চিত্র দেখার জন্য স্টিরিওস্কোপ নামে একটা বিশেষ যন্ত্র আছে। প্রতিবিম্ব দুটিকে একত্রিত করার জন্য পুরনো ধরনের স্টিরিওস্কোপে আয়না এবং পরবর্তী যুগের মডেলে উত্তল কাচের প্রিজম ব্যবহার করা হত। উত্তলতার জন্য প্রিজম প্রতিবিম্ব দুটিকে কিঞ্চিত বড় করে দেয়। এই প্রিজমে ছবি জোড়া থেকে আগত আলো এমনভাবে প্রতিসরিত হয় যে তার কাল্পনিক প্রসারণ এই উপরিপাতন ঘটায়।

চিত্র 122



বাঁ এবং ডান চোখ দিয়ে দেখলে একটা ছিট ছিট দাগওলা কাচের ঘনককে এই রকম দেখাবে।

দেখতেই পাচ্ছ যে, স্টিরিওস্কোপের মূল নীতি অত্যন্ত সোজা আর সেইজন্যেই এটা যে অনুভূতির জন্ম দেয় তা আরও বিস্ময়কর লাগে। মনে হয় তোমাদের অনেকেই নানা ধরনের স্টিরিওস্কোপ চিত্র দেখেছ, কেউ কেউ হয় তো ঘনমাপন পদ্ধতি আরও সহজে শেখার জন্যও স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করেছ। সে যাইহোক, এবার আমি তোমাদের স্টিরিওস্কোপের প্রয়োগ সম্পর্কে বলব। আমার ধারণা তোমাদের অনেকেই এ-সম্বন্ধে জান না।

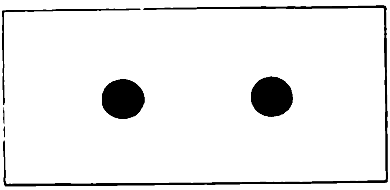
দ্বিনেত্র দৃষ্টি

আমরা যদি আমাদের চোখকে বিশেষভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারি তাহলে স্টিরিওস্কোপ ছাড়াই আমরা ওই রকম যুগ্ম-চিত্র দেখতে এবং একই অনুভব লাভ করতে পারি। তফাতের মধ্যে প্রতিবিম্বটা শুধু স্টিরিওস্কোপের মতো বড় হয়ে ধরা দেবে না। স্টিরিওস্কোপের উদ্ভাবক হুইটস্টোন এই প্রাকৃতিক ব্যবস্থাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন। প্রথমে সহজ ও তারপরে ক্রমশ কঠিন, এইভাবে এখানে কতকগুলো স্টিরিওস্কোপ চিত্র দেওয়া হয়েছে। স্টিরিওস্কোপ ছাড়াই আমি তোমাদের ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করতে বলব। মনে রেখো, অভ্যাস না করলে কিন্তু কোনো ফল পাবে না। (খেয়াল রেখো যে, স্টিরিওস্কোপ দিয়েও সবাই যে স্টিরিওস্কোপিক ভাবে দেখতে পায় তা নয়। যারা টেরা কিংবা এক চোখ দিয়ে কাজ করতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে দ্বিনেত্র দৃষ্টি আয়ত্ত করা একেবারেই সম্ভব

নয়। অন্যেরা দীর্ঘ অনুশীলনের পর ফল পায়। তরুণরা অবশ্য খুব তাড়াতাড়ি, মিনিট পনেরর মধ্যেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়।)

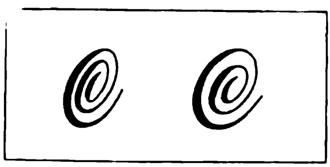
চিত্র 123 দিয়ে শুরু করো, যেটার মধ্যে দুটো কালো ফোঁটা দেখা যাচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড ফোঁটাদুটোর মধ্যবর্তী অংশে তাকিয়ে থাকো এবং তারই মধ্যে

চিত্র 123



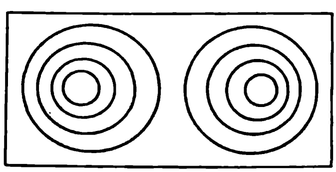
কয়েক সেকেণ্ড ধরে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অংশের দিকে তাকিয়ে থাক। মনে হবে বিন্দু দুটো যেন মিশে যাবে।

চিত্র 124



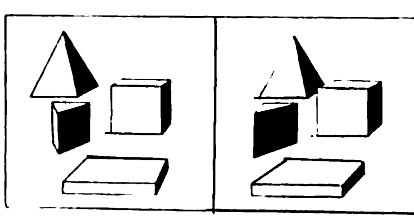
আগের মতই করো. তারপর পরের ছবিটা দেখো।

চিত্র 125



এই প্রতিবিম্ব দুটো মিশে যাবার পর দেখবে একটা পাইপের মতো জিনিসের অভ্যন্তর যা দূরে প্রসারিত হয়েছে।

চিত্র 126

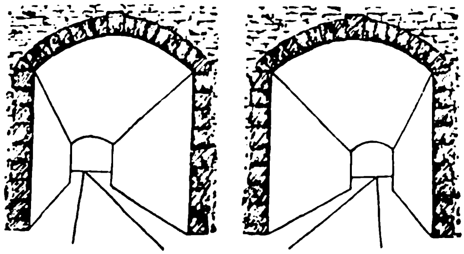


এই চারটে জ্যামিতিক বস্তুমিশে যাবার পর মনে হবে শূন্যে ভাসছে।

পিছন দিকের কোনো কল্পিত বস্তুকে দেখার চেষ্টা করো। শীঘ্রই তুমি দুইয়ের বদলে তার দ্বিগুণ, অর্থাৎ চারটে ফোঁটা দেখতে পাবে। তারপর দু প্রান্তের ফোঁটা দুটো যেন নড়ে চড়ে দুধারে অনেক দূরে সরে যাবে আর মাঝখানকার ফোঁটা দুটো কাছে সরে এসে একটা হয়ে যাবে। 124 নং ও 125 নং চিত্র নিয়েও

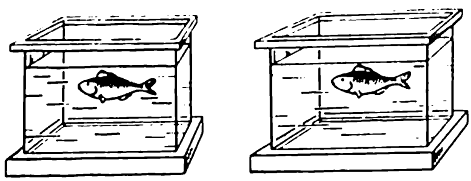
এই পরীক্ষা করলে দেখতে পাবে যেন লম্বা একটা নলের অভ্যন্তরভাগ সুদূরে প্রসারিত হয়েছে।

চিত্র 127



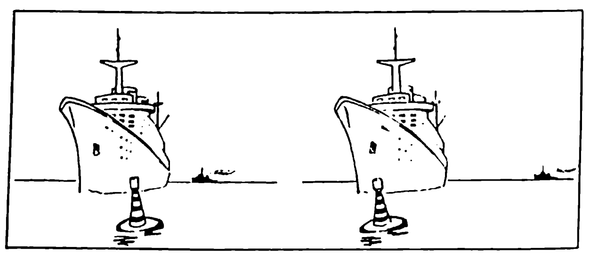
এই এক জোড়া ছবি দেখে মনে হয় লম্বা একটা সুড়ঙ্গ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

চিত্র 128·



অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ।

চিত্র 129



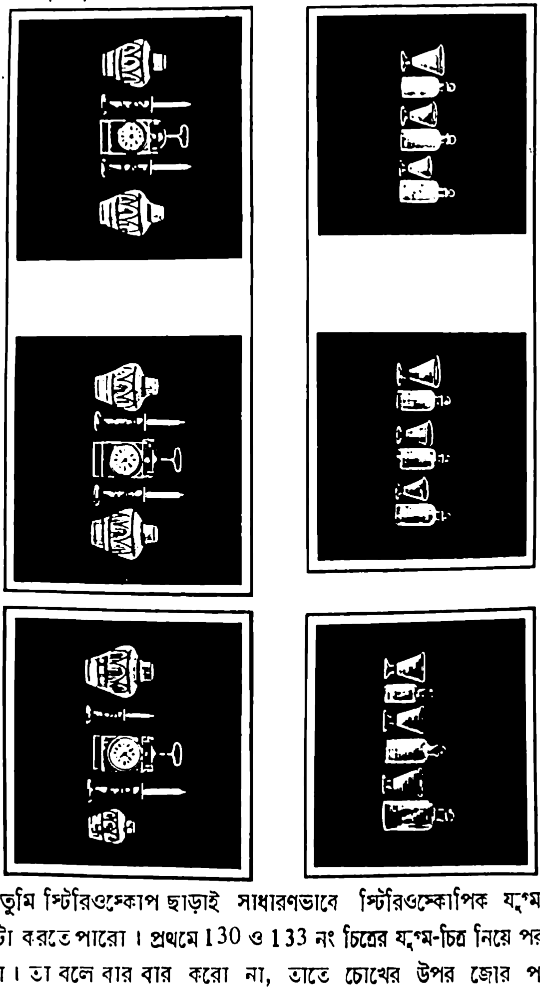
স্টিরিওস্কোপিক সমুদ্রচিত্র।

এবার 126 নং চিত্রের দিকে নজর ফেরালে দেখবে জ্যামিতিক বস্তুগুলো বাতাসে ভাসছে। 127 নং চিত্রে একটা দীর্ঘ বারান্দা অথবা সুড়ঙ্গের মতো দেখাবে। 128 নং চিত্র দেখে অ্যাকোয়ারিয়ামের স্বচ্ছ কাচ বলে ভুল হবে। শেষ পর্যন্ত 129 নং চিত্র থেকে একটা সম্পূর্ণ সামুদ্রিক দৃশ্যের চিত্র দেখতে পাবে।

সহজেই কৃতকার্য হওয়া সম্ভব। কয়েকবার চেষ্টা করার পরে আমার বেশির ভাগ বন্ধুরাই কৌশলটা শিখে নিয়েছে। দূর ও নিকট দৃষ্টিসম্পন্নদের চশমা খোলার দরকার নেই। যে কোনো ছবি তাঁরা যেভাবে দেখেন এই ছবি জোড়াও

সেই ভাবেই দেখবেন। বারে বারে পরীক্ষা করে ঠেকে শিখতে হবে ছবিগুলি ঠিক কত দূরে ধরা দরকার। লক্ষ্য রাখবে ছবির উপর যেন ভালোভাবে আলো পড়ে—এটা গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র 130



এবার তুমি স্টিরিওস্কোপ ছাড়াই সাধারণভাবে স্টিরিওস্কোপিক যুগ্ম-চিত্র দেখতে চেষ্টা করতে পারো। প্রথমে 130 ও 133 নং চিত্রের যুগ্ম-চিত্র নিয়ে পরীক্ষা করে দ্যাখো। তা বলে বার বার করো না, তাতে চোখের উপর জোর পড়তে পারে। কায়দাটা রপ্ত করতে না পারলে তুমি সহজ কিন্তু রীতিমতো কাজ-চালানো একটা স্টিরিওস্কোপ তৈরি করে নিতে পারো দূরবদ্ধ-দৃষ্টিসম্পন্ন লোকের চশমার কাচ দিয়ে। এক টুকরো কার্ডবোর্ডে কাচ দুটোকে পাশাপাশি এমনভাবে বসিয়ে

নাও যাতে তাদের মধ্যবর্তী অঞ্চল শুধু দেখার কাজে লাগানো যায়। একটা ডায়াফ্রামকে পার্টিশান হিসাবে বসিয়ে দাও কাচ দুটোর মধ্যে।

এক এবং দু'চোখ দিয়ে

130 নং চিত্রে (উপরের বাঁদিকের কোণে) একই রকমের আকারের তিনটে বোতলের আলোকচিত্র রয়েছে। যতই খুঁটিয়ে দ্যাখো আয়তনের কোনো পার্থক্য খুঁজে পাবে না। কিন্তু তফাত একটা আছে, বেশ উল্লেখযোগ্য একটা পার্থক্য। চোখ বা ক্যামেরা থেকে সমান দূরত্বে রাখা হয়নি বলেই ওগুলোকে এক রকম মনে হচ্ছে। বড় বোতলটা ছোটটার চেয়ে দূরে আছে। কিন্তু তিনটে বোতলের মধ্যে কোনটা বড়? যত ইচ্ছে তাকিয়ে তাকিয়ে দ্যাখো, তবু কোনো উত্তর দিতে পারবে না। কিন্তু সমস্যাটার সমাধান খুব সহজেই হয়ে যায়, যদি স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা হয় বা বাইনোকুলার দৃষ্টি প্রয়োগ করা যায়। তখন তুমি স্পষ্ট দেখবে যে, বাঁদিকের বোতলটা রয়েছে সবচেয়ে দূরে এবং ডানদিকেরটা সবচেয়ে কাছে। উপরে ডানদিকের কোণের আলোকচিত্রে বোতলগুলির প্রকৃত আকার দেখা যাচ্ছে।

130 নং চিত্রের স্টিরিওস্কোপিক যুগ্ম-চিত্র আরো ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ফুলদানি ও মোমবাতিগুলোকে একই রকমের মনে হলেও তাদের আকারের মধ্যে খুবই অমিল আছে। বাঁদিকের ফুলদানিটা ডানদিকেরটার চেয়ে লম্বায় দু'গুণ বেশি, ওদিকে বাঁদিকের মোমবাতিটা ঠিক তার বিপরীত, সেটা ঘড়ি এবং ডানদিকের মোমবাতিটার চেয়ে অনেক ছোট। বাইনোকুলার দৃষ্টিতে অবিলম্বে এর কারণ ধরা পড়ে—জিনিসগুলো এক সারিতে নেই, বিভিন্ন দূরত্বে রয়েছে। বড় জিনিস-গুলো ছোটগুলোর তুলনায় বেশি দূরে আছে। 'এক চোখের' দৃষ্টির তুলনায় 'দু চোখের' বাইনোকুলার দৃষ্টি কত সুবিধাজনক তার কী সুন্দর একটা উদাহরণ!

জালিয়াতি ধরা

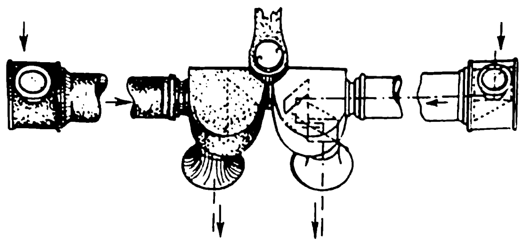
মনে করো তোমার কাছে দুটো সমান কালো রঙের বর্গক্ষেত্রের দুটো সম্পূর্ণ সদৃশ চিত্র রয়েছে। স্টিরিওস্কোপে তাদের এমন একটি বর্গক্ষেত্র হিসাবে দেখা যাবে, যা বর্গক্ষেত্র যুগলের প্রত্যেকটির সদৃশ। প্রত্যেক বর্গক্ষেত্রের কেন্দ্রে যদি একটি করে সাদা ফোঁটা থাকে তাহলে সেটা স্টিরিওস্কোপে দেখা বর্গক্ষেত্রেও ধরা পড়বে। কিন্তু তুমি যদি কোনো একটা বর্গক্ষেত্রের মধ্যে ফোঁটাটাকে কেন্দ্র থেকে সামান্য দূরে সরিয়ে বসাও তাহলে স্টিরিওস্কোপে যদিও একটাই ফোঁটা দেখা যাবে কিন্তু মনে হবে সেটা যেন বর্গক্ষেত্রের 'সামনের' কিংবা 'পিছনের' দিকে রয়েছে, বর্গক্ষেত্রের উপরে নেই। সামান্যতম পার্থক্যও স্টিরিওস্কোপে গভীরতার বোধ সৃষ্টি করে। এর থেকে জালিয়াতি ধরার সহজ একটা উপায় পাওয়া

যায়। স্টিরিওস্কোপে সন্দেহজনক ব্যাঙ্কের নোট ও তার পাশে একটা আসল নোট রেখে দেখলেই তুমি জালিয়াতি ধরতে পারবে, তা সে যতই চতুরভাবে করা হোক না কেন। সামান্যতম ত্রুটি, এমন কি ছোট্ট একটা লাইনের হেরফেরও যদি হয় সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়বে। মনে হবে সেটা যেন ব্যাঙ্কনোটের হয় সামনে কিংবা পিছনে রয়েছে। (ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডোভ প্রথম এই পদ্ধতির কথা বলেছিলেন। মুদ্রণ কৌশলের কারণে বর্তমানে প্রচলিত সব নোটের ক্ষেত্রে এটা এখন প্রযোজ্য নয়। তবু একটা বইয়ের পাতার দুটো প্রুফের মধ্যে কোন্‌টা সদ্য কম্পোজ করা টাইপ থেকে ছাপান হয়েছে, সেটা কিন্তু এই পদ্ধতিতে ধরে ফেলা যায়।)

দৈত্যরা যেরকম দেখে

কোনো বস্তু যদি খুব দূরে থাকে, 450 মিটারেরও বেশি দূরত্বে, তাহলে স্টিরিওস্কোপের অনুভূতি আর বোধগম্য হয় না। আমাদের দু' চোখের মধ্যকার ব্যবধান ছয় সেণ্টিমিটারকে 450 মিটারের মতো দূরত্বের সঙ্গে কোনো মতেই তুলনা করা চলে না। তাই বহু দূরের ঘরবাড়ি, পাহাড় এবং প্রাকৃতিক দৃশ্যকে যে চ্যাপ্টা লাগে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। একই ভাবে

চিত্র 131



টেলিস্টিরিওস্কোপ :

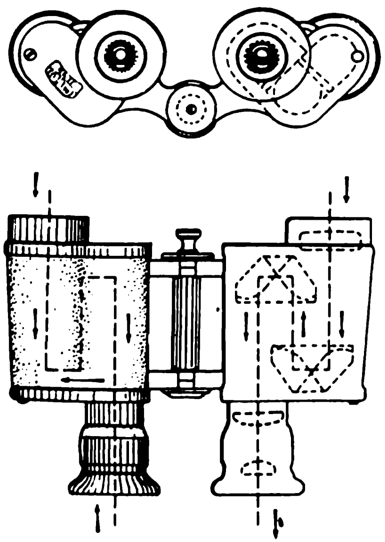
মহাকাশের যাবতীয় বস্তুও যেন সমান দূরত্বে বিরাজ করছে বলে মনে হয়। কিন্তু আসলে গ্রহগুলির তুলনায় চাঁদ রয়েছে অনেক কাছে, আবার ওদিকে স্থির নক্ষত্রদের তুলনায় গ্রহগুলো অনেক নিকটবর্তী। কাজেই এই ধরনের স্টিরিওস্কোপিক যুগল আলোকচিত্র তোলা হলে সেটা স্টিরিওস্কোপে দেখলেও তার মধ্যে ত্রিমাত্রিকতার মায়া সৃষ্টি হবে না।

অবশ্য এই সমস্যা সমাধানের সহজ একটা উপায় আছে। আমাদের দু' চোখের মধ্যকার দূরত্বের অধিক ব্যবধানে স্থাপিত দুটি স্থান থেকে দূরবর্তী বস্তুর আলোকচিত্র তোলো। এইভাবে যে স্টিরিওস্কোপিক ভ্রম সৃষ্টি হবে সেটাই ঘটত

যদি আমাদের চোখ দুটোর মধ্যে ব্যবধান স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হত। প্রাকৃতিক দৃশ্যের স্টিরিওস্কোপিক চিত্র এইভাবেই গ্রহণ করা হয়। এগুলো সাধারণত বিবর্ধক (উত্তল) প্রিজম দিয়ে দেখা হয় এবং তার ফল হয় খুবই বিস্ময়কর।

তোমরা বোধ হয় আন্দাজ করতে পেরেছ যে পারিপার্শ্বিক দৃশ্যাবলির প্রকৃত ত্রিমাত্রিক অবস্থাকে দেখার জন্য আমরা দুটো ছোট দূরবীক্ষণ যন্ত্রকে ব্যবহার করতে পারি। টেলি-স্টিরিওস্কোপ নামে এই যন্ত্রের মধ্যে থাকে দুটি টেলিস্কোপ,

চিত্র 132



প্রিজম্ বাইনোকুলার।

যা আমাদের দু চোখের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক ব্যবধানের চেয়ে বেশি দূরে বসানো থাকে। প্রতিফলনকারী প্রিজমের সাহায্যে প্রতিবিম্বটির উপরিপাতন ঘটান হয় (চিত্র 131)।

টেলি-স্টিরিওস্কোপ দিয়ে দেখার সময় যে অনুভূতি হয় তার অভিজ্ঞতার প্রকৃত বর্ণনা কথায় সম্ভব নয়। প্রকৃতির রূপান্তর ঘটে যায়, দূরবর্তী পর্বতশ্রেণীর উঁচু-নিচু ভাব জীবন্ত হয়ে ওঠে, গাছ, পাথর, ঘর-বাড়ি এবং সমুদ্রের জাহাজ সবই ত্রিমাত্রিক হয়ে দেখা দেয়। এখন আর কিছুই চ্যাপ্টা ও অচল বলে মনে হয় না। সাধারণ ছোট দূরবীক্ষণে যে জাহাজটাকে দিগন্তে একটা বিন্দুর মতো দেখাচ্ছিল, সেটা চলতে শুরু করে দেয়। পৌরাণিক কল্পনার দৈত্যরাও খুব সম্ভবত এই রকমই

পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করত। এই যন্ত্রের বিবর্ধন ক্ষমতা যখন দশ গুণ হয় এবং এর লেন্সের মধ্যকার ব্যবধান অক্ষিদ্বয়ের মধ্যকার দূরত্বের ছয় গুণ হয় (6·5 × 6 = 39 সেমি) তখন খোলা চোখে যা দেখা যায় তার তুলনায় উঁচু-নিচু ভাবের অনুভূতি 60 গুণ (6 × 10) বৃদ্ধি পায়। এমন কি 25 কিলোমিটার দূরের বস্তুর মধ্যেও ত্রিমাত্রিকতা লক্ষ্য করা যায়। ভূমি জরিপের কাজে, নাবিক, বন্দুকধারী ও ভ্রমণকারীদের কাছে এই যন্ত্র দেবতার আশীর্বাদের মত। তার উপর এর সঙ্গে দূরত্ব-মাপক যন্ত্রাংশ যুক্ত হলে তো কথাই নেই। জাইস্ প্রিজম বাইনোকুলারও একই বোধ সৃষ্টি করে, কারণ এর লেন্সের মধ্যকার দূরত্ব দু' চোখের মধ্যবর্তী স্বাভাবিক দূরত্বের চেয়ে বেশি (চিত্র 132)। অপেরা গ্লাসের বেলায় কিন্তু এর ঠিক উল্টোটা ঘটে। ত্রিমাত্রিক ভ্রম সেখানে কমে যায়, কারণ তার লেন্স দুটোর মধ্যে এতটা ব্যবধান থাকে না। ইচ্ছাকৃতভাবেই এটা ঘটান হয় যাতে মঞ্চসজ্জার প্রত্যেকটি খুটিনাটি একত্রে একটা অভিপ্রেত প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

স্টিরিওস্কোপে মহাবিশ্ব

চাঁদ বা অন্য যে কোনো মহাজাগতিক বস্তুর দিকে যদি আমরা টেলি-স্টিরিওস্কোপ ফেরাই তাহলে ত্রিমাত্রিক ভাবের কোনোই প্রকাশ দেখতে পাব না। এটাই স্বাভাবিক—কারণ এই ধরনের যন্ত্রের পক্ষেও মহাজাগতিক দূরত্ব খুবই বেশি। পৃথিবী থেকে গ্রহদের দূরত্বের তুলনায় দুটো লেন্সের মধ্যবর্তী 30-50 সেমি দূরত্ব অতি নগণ্য। দুটো দূরবীক্ষণ যন্ত্র যদি কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরেও স্থাপন করা হয় তবু আমরা কোনো ফল পাব না, কারণ, গ্রহগুলি রয়েছে কয়েক কোটি কিলোমিটার দূরে।

এই হল স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্রণের ক্ষেত্র : ধরা যাক আজ আমরা একটা গ্রহের ছবি তুললাম, তারপর কাল তুললাম তার আরেকটা ছবি। দুটো ছবিই তোলা হবে পৃথিবীর উপরকার একই স্থান থেকে কিন্তু সৌরজগতের বিচারে এই স্থান দুটি এক নয়, কারণ 24 ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবী তার কক্ষপথে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করবে। কাজেই আলোকচিত্র দুটো সদৃশ হবে না। স্টিরিওস্কোপে ছবি জোড়া ত্রিমাত্রিক ভাব সৃষ্টি করবে। বুঝতেই পারছ যে, পৃথিবীর কক্ষীয় গতির জন্যই আমরা মহাজাগতিক বস্তুর স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্র গ্রহণ করতে সক্ষম হই। এমন একটা দানবের কথা কল্পনা করো যার মাথাটা এত বড় যে চোখ দুটোর মধ্যবর্তী দূরত্ব লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পেরিয়ে যায়। এর থেকে তুমি এধরনের স্টিরিওস্কোপ আলোকচিত্রণের অসাধারণ ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

বর্তমানে মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মাঝে অবস্থানকারী অ্যাসট্রয়েডদের আবিষ্কার করার কাজে স্টিরিওস্কোপ ব্যবহার করা হয়। খুব বেশি দিনের কথা নয়, জ্যোতির্বিদরা এই অ্যাসট্রয়েডের মধ্যে যে কোনো একটিকে দেখতে পেলেই মনে করতেন ভাগ্য খুব সুপ্রসন্ন। এখন এই কাজটা করার জন্য বিভিন্ন সময়ে তোলা মহাকাশের সেই অংশের স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্র দেখাই যথেষ্ট। স্টিরিওস্কোপ সঙ্গে সঙ্গে অ্যাস্টরয়েডকে দেখিয়ে দেয়, সেটাকে আকাশের গায়ে চিহ্নিত করে দেয়।

স্টিরিওস্কোপে আমরা শুধু মহাজাগতিক বস্তুর অবস্থানের নয়, তাদের উজ্জ্বলতার পার্থক্যও ধরতে পারি। জ্যোতির্বিদরা এর থেকে তথাকথিত 'পরিবর্তনীয়' নক্ষত্রদের খুঁজে বার করতে সহজ এক পদ্ধতি বার করেছেন। এই নক্ষত্রগুলোর আলো পর্যায়ক্রমে বাড়ে-কমে। কোনো নক্ষত্র যদি অসম উজ্জ্বলতা প্রদর্শন করে, তবে তার স্টিরিওস্কোপেও আলোর হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটবে—তাতে সেই 'পরিবর্তনীয়' নক্ষত্রটির অস্তিত্ব ধরা পড়বে।

তিন চোখের দৃষ্টি

কথাটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে পড়েছে বলে ভেবো না যেন। সত্যিই তিন চোখের কথা বোঝাতে চাইছি। কিন্তু তিন চোখ দিয়ে লোকে দেখবে কি করে? এবং তৃতীয় নেত্র কি কারুর থাকতে পারে?

বিজ্ঞান তোমাকে বা আমাকে তৃতীয় নেত্র দিতে না পারুক, এমন ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা দিতে পারে যাতে আমরা তিন চোখওলা প্রাণীর মতোই একটা জিনিসকে দেখতে পাই। প্রথমেই বলে রাখি, দৈনন্দিন জীবনে এক চোখো লোক যদিও গভীরতার বোধ লাভ করতে পারে না, কিন্তু স্টিরিওস্কোপিক চিত্র থেকে তা পেতে পারে। তার জন্য দ্রুত একের পর এক পর্দার উপর ডান ও বাঁ চোখের জন্য তৈরী আলোকচিত্র দুটি প্রক্ষেপ করতে হয়। এই চিত্র দুটি স্বাভাবিক মানুষ দু'-চোখ দিয়ে যুগপৎ দেখতে পায়। কিন্তু মোদ্দা ফল দু'ক্ষেত্রেই এক হয়, কারণ স্বল্প ব্যবধানের চোখের প্রতিবিম্বগুলো এমনভাবে মিলে যায় যা দু'টো প্রতিবিম্বকে একসঙ্গে দেখলেও ঘটে থাকে। (পূর্বোক্ত কারণগুলো ছাড়াও চলচ্চিত্রে মাঝে মাঝে যে বিস্ময়কর 'গভীরতা' দেখা যায় তার কারণগুলোর মধ্যে এটা অন্যতম। চলচ্চিত্রের ক্যামেরা যদি সমান গতিতে চলে—ফিল্ম ওয়াইণ্ডার যন্ত্রাংশের জন্য যা প্রায়ই ঘটে থাকে—তাহলে স্থির চিত্রগুলো এক রকম হবে না এবং সেগুলো পর্দার উপর দিয়ে একের পর এক পেরিয়ে যাবার সময় আমাদের কাছে ত্রিমাত্রিক প্রতিবিম্ব হিসাবে ধরা দেবে।)

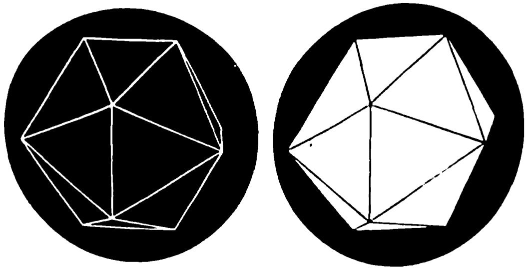
তাই যদি হয়, তবে দু'চোখো লোক কেন যুগপৎ এক চোখ দিয়ে দ্রুত পরিবর্তিত দুটি আলোকচিত্র এবং দ্বিতীয় চোখ দিয়ে ভিন্নতর কোণ থেকে তোলা

তৃতীয় একটি আলোকচিত্র দেখতে পাবে না? কিংবা বলা যেতে পারে, স্টিরিও-স্কোপিক তিনটি চিত্র দেখতে পাবে না কেন? দেখা যেতে পারে বই কি। একটা চোখ তখন পরিবর্তনশীল যুগ্ম স্টিরিওস্কোপ চিত্র থেকে একটাই প্রতিবিম্ব দেখলেও তার ত্রিমাত্রিক ভাব ধরা পড়বে, ইতিমধ্যে অপর চোখটি তৃতীয় আলোক-চিত্রটিকে দেখবে। এই 'তিন চোখের' দৃষ্টিতে ছবির গভীরতার বোধ খুবই বৃদ্ধি পায়।

স্টিরিওস্কোপিক চকমকানি

133 নং চিত্রে যে স্টিরিওস্কোপিক যুগ্ম-চিত্র রয়েছে তাতে দুটো বহুতলক ঘনক্ষেত্র রয়েছে, একটা কালোর উপর সাদা রেখা দিয়ে এবং অন্যটা সাদার উপর

চিত্র 133



স্টিরিওস্কোপিক ঝলমলানি। স্টিরিওস্কোপে এই একজোড়া ছবিকে কালো পশ্চাদপটে একটা ঝলমলে স্ফটিকের মত দেখায়।

কালো রেখা দিয়ে। স্টিরিওস্কোপে তাদের কেমন দেখাবে? হেল্‌ম্‌হোলৎজ্‌ বলছেন:

"স্টিরিওস্কোপিক যুগ্ম-চিত্রের একটির পশ্চাদপট যদি সাদা হয় ও দ্বিতীয়টির কালো, তাহলে সম্মিলিত প্রতিবিম্ব যেন ঝলমল করছে মনে হয়। এমন কি কাগজটা যদি অনুজ্জ্বল হয় তবুও। কেলাসের নমুনার এই ধরনের স্টিরিও-স্কোপিক ছবি দেখে মনে হয় গ্র্যাফাইটও ঝিকমিক করছে। জলের চিকমিক, পাতার উজ্জ্বলতা এবং এই ধরনের আরো জিনিস তখন বিশেষভাবে চোখে পড়ে।"

রাশিয়ান শারীরতত্ত্ববিদ শেচেনভ (Sechenov)-এর লেখা 'ফিজিওলজি অফ দা সেন্সেস—ভিশন' নামে একটি বই আছে। বইটি পুরনো হলেও তার প্রাসঙ্গিকতা এখনো হারিয়ে যায়নি। বইটিতে এই ঘটনার সুন্দর একটা ব্যাখ্যা রয়েছে।

"বিভিন্নভাবে আলোকিত বা রঙ-করা তলের কৃত্রিমভাবে স্টিরিওস্কোপিক একত্রীকরণ ঘটানোর পরীক্ষায় আমরা এমন অবস্থা তৈরি করতে পারি যাতে আমরা বস্তুটিকে উজ্জ্বল দেখি। অনুজ্জ্বল একটা তলের সঙ্গে চকচকে পালিশ করা একটি তলের পার্থক্যটাই বা কি? প্রথমটিতে আলোকের বিচ্ছুরিত প্রতিফলন ঘটে বলে ওর উপরকার সব বিন্দুই যেন সমানভাবে আলোকিত বলে মনে হয়। ওদিকে পালিশ-করা তলটি কিন্তু শুধু একটি নির্দিষ্ট দিকে আলোকে প্রতিফলিত করে। কাজেই এরকম ঘটতেই পারে যে, এক চোখ দিয়ে তুমি হয়তো অনেকগুলো প্রতিফলিত রশ্মি দেখতে পাচ্ছ এবং অন্য চোখ দিয়ে প্রকৃত পক্ষে একটাকেও দেখতে পাচ্ছ না—স্টিরিওস্কোপে সাদা তলের সঙ্গে কালোর মিশ্রণ ঘটালে ঠিক এই অবস্থারই পুনরাবৃত্তি হয়। বলাই বাহুল্য এমন ঘটনাও ঘটতে পারে যখন ঝকমকে পালিশ-করা তলের দিকে তাকালে প্রতিফলিত আলো দর্শকের চোখ দুটির মধ্যে অসমভাবে বিতরিত হয়। ফলত, স্টিরিওস্কোপিক চকমকানি প্রমাণ করে যে, এই অভিজ্ঞতাই ওই প্রতিবিম্বের মিশ্রণের ঘটনার মূল। অভিজ্ঞতা দ্বারা শিক্ষিত চক্ষু নামক যন্ত্র যখন সত্যিকার দেখার সঙ্গে মিলিয়ে পরখ করে তখনই দুটি দৃষ্টিক্ষেত্রের মধ্যকার বিরোধিতা লোপ পেয়ে জন্ম নেয় দৃঢ় কল্পনা।"

কাজেই কোন জিনিসকে ঝকমক করতে দেখার কারণ—অন্তত একটা কারণ হল—রেটিনার প্রতিবিম্ব দুটোর উজ্জলতার অসমতা। স্টিরিওস্কোপ ছাড়া আমরা এটা কদাচিৎ অনুমান করতে পারতাম।

ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা

একটু আগেই বলেছি যে, একই বস্তুর বিভিন্ন প্রতিবিম্ব খুব তাড়াতাড়ি পরিবর্তিত করলে তারা মিশে গিয়ে ত্রিমাত্রিকতার মায়া সৃষ্টি করে। আমরা যখন স্থির থাকি এবং প্রতিবিম্বগুলো চলতে থাকে তখনই কি শুধু এরকম ঘটে? না কি, প্রতিবিম্ব যখন স্থির কিন্তু আমরা চলতে থাকি, তখনই তাই ঘটবে? হ্যাঁ প্রত্যাশা অনুযায়ী ঠিক সেই মোহই হয় আমাদের। খুব সম্ভবত অনেকেই দেখেছে যে, এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে তোলা চলচ্চিত্র অনেক সময় অস্বাভাবিকভাবে জীবন্ত হয়ে ওঠে—ঠিক স্টিরিওস্কোপে যে রকম লাগে। দ্রুতগামী ট্রেন বা গাড়িতে চড়ে যাবার সময় আমরা যদি আমাদের দৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন হই তাহলে এটা নিজেরাই দেখতে পাব। এই ভাবে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ত্রিমাত্রিক ভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে—দৃশ্যপটের সম্মুখ ভাগকে পশ্চাদভাগ থেকে একেবারে স্বতন্ত্রভাবে চেনা যায়। এক্ষেত্রে অচল অবস্থায় চোখের দ্বিনেত্র দৃষ্টির 450 মিটার-এর সীমাটাকে অনেকটা ছাড়িয়ে যায় আমাদের চোখের 'স্টিরিওস্কোপিক ব্যাসার্ধ'।

এক্সপ্রেস ট্রেনের জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখার মনোরম অনুভূতিকেও কি এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না? দূরবর্তী বস্তুগুলো ক্রমেই পিছিয়ে পড়ে

এবং আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই দিগন্ত জোড়া বিশাল দৃশ্যপট ক্রমেই উন্মিলিত হচ্ছে। বনের মধ্যে ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময়ে আমরা প্রতিটি গাছ, ডাল এবং পাতাকে স্টিরিওস্কোপিক ভাবে দেখতে পাই। নিশ্চল দর্শকের দর্শনের মতো তখন তা মিলে মিশে একটা চ্যাপ্টা ছবি হয়ে ধরা দেয় না। পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে জোরে গাড়ি ছুটিয়ে গেলেও একই প্রতিক্রিয়া হয়। আমরা যেন পাহাড় ও উপত্যকার আকারগুলো ধরাছোঁয়ার মধ্যে পেয়ে যাই।

এক চোখো লোকেও এটা দেখতে পাবে। আমি নিশ্চিত যে তারা এর থেকে বিস্ময়কর অভিনব একটা অনুভূতিও লাভ করবে। কারণ পূর্বে উল্লিখিত দ্রুত পর্যায়ে একের পর এক ছবি দেখিয়ে ত্রিমাত্রিক মোহ সৃষ্টি করার সমতুল্য এই ঘটনাটা। (এর থেকেই আবার, ট্রেন বাঁক নেবার সময়ে তার থেকে তোলা চলচ্চিত্রের লক্ষণীয় স্টিরিওস্কোপিক বৈশিষ্ট্যকে ব্যাখ্যা করা যায়। গৃহীত চিত্রের বস্তুগুলি যদি বাঁকের ব্যাসার্ধের মধ্যে থাকে তবেই অবশ্য এটা হয়। এই 'ট্র্যাক্ এফেক্ট'-এর কথা ক্যামেরাম্যানরা ভালভাবেই জানেন।)

খুব সহজেই আমার বক্তব্য পরীক্ষা করে দেখা যায়। গাড়ি বা ট্রেনে চড়ে যাবার সময় নিজের দৃষ্টি সম্বন্ধে সজাগ থাকো। একশো বছর আগে ডাভ উল্লিখিত একটা বিস্ময়কর ঘটনাও হয়তো নজর করতে পারবে—এই ব্যাপারটার কথা সবাই ভুলে গেলেও এটা যে অভিনব তাতে সন্দেহ নেই।—কাছের যে জিনিসগুলো শোঁ শোঁ করে পিছনে সরে যাচ্ছে সেগুলোকে যেন ছোট মনে হয়। দ্বিনেত্র দৃষ্টি এর কোনো কারণ দর্শাতে পারবে না। এর সহজ কারণ হল—আমাদের দূরত্বের অনুমান করতে ভুল হয়। আমাদের অবচেতন মনের কাছে কাছের বস্তুকে যা মনে হচ্ছে তার চেয়ে তা ছোটই মনে হবে, তবেই তা সর্বদা এক রকম থাকবে। এই হল হেল্ম্হোলৎজের ব্যাখ্যা।

রঙীন কাচের চশমা দিয়ে

লাল-রঙা কাচের চশমা পরে সাদা কাগজের উপরে লাল অক্ষরের লেখার দিকে তাকালে শুধু লাল রঙের পশ্চাদপট ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। অক্ষরগুলো লাল পশ্চাদপটের সঙ্গে মিলে গিয়ে একেবারে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু ওই লাল-রঙা কাচের চশমা পরে সাদা কাগজের উপরে নীল অক্ষরের লেখার দিকে তাকাও, দেখবে লেখাটা এবার 'কালো' হয়ে স্পষ্ট ধরা পড়ছে সেই লাল পশ্চাদপটের উপরেই। কালো কেন? ব্যাখ্যাটা সহজ। লাল কাচ নীল রশ্মিকে পেরতে দেয় না। কাচটা লাল হবার কারণ হল এটা শুধু লাল রশ্মিকেই পেরতে দেয়। ফলত, নীল অক্ষরের পরিবর্তে তুমি আলোর অনুপস্থিতি, অর্থাৎ কালো অক্ষর দেখতে পাও।

13-01181

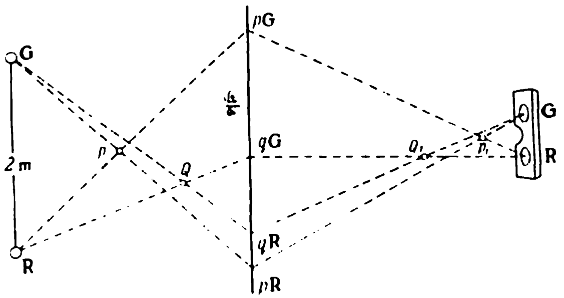
রঙীন 'অ্যানাগ্লিফস্' নামে পরিচিত জিনিস থেকে যে ফল পাওয়া যায়, একই ফল পাওয়া যায় স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্র থেকে। 'অ্যানাগ্লিফস্-এর পিছনে নীতি হিসাবে রয়েছে রঙীন কাচের এই ধর্ম। অ্যানাগ্লিফ একটা ছবি, যার মধ্যে ডান ও বাঁ চোখের স্টিরিওস্কোপিক প্রতিবিম্ব দুটি থাকে উপরিস্থাপিত এবং তাদের মধ্যে একটি নীল ও অন্যটি লাল রঙের হয়।

পৃথক রঙের কাচের মধ্য দিয়ে একটা 'অ্যানাগ্লিফস্'-কে দেখায় কালো কিন্তু ত্রিমাত্রিক। লাল কাচের ভেতর দিয়ে ডান চোখ ডান চোখের জন্য নির্দিষ্ট নীল প্রতিবিম্বটাকে শুধু দেখতে পায়—এবং দেখতে পায় কালো হিসাবে। ইতিমধ্যে বাঁ চোখে নীল কাচের ভেতর দিয়ে বাঁ চোখের জন্য নির্দিষ্ট লাল প্রতিবিম্বটা শুধু দেখতে পায়—সেটাও কালো দেখায়। প্রত্যেক চোখ তার জন্য নির্দিষ্ট শুধু একটি করে প্রতিবিম্ব দেখে। এটা স্টিরিওস্কোপের পুনরাবৃত্তি এবং তার ফলে সেই একই ফল পাওয়া যায়—অর্থাৎ ত্রিমাত্রিকতার মায়া।

'বিস্ময়কর ছায়াবাজি'

সিনেমায় এককালে যে 'ছায়াবাজি' দেখান হত তারও ভিত্তি হিসাবে ছিল পূর্ব উল্লিখিত নীতি। দর্শকরা পৃথক রঙের কাচের মধ্য দিয়ে যখন চলমান

চিত্র 134



"ছায়া রহস্যের" ব্যাখ্যা।

বস্তু দ্বারা সৃষ্ট ছায়া পরদায় দেখত, বস্তুগুলোকে ত্রিমাত্রিক বলে মনে হত। এই ভ্রম সৃষ্টি হত দুরঙা স্টিরিওস্কোপ থেকে। ছায়া সৃষ্টিকারী বস্তুটি বসান থাকত পর্দা ও দুটি সন্নিহিত আলোর উৎসের মাঝখানে। আলোর উৎসদুটির একটি হত লাল ও অন্যটি নীল। এর থেকে দুটি আংশিকভাবে উপরিস্থাপিত রঙীন ছায়া দেখা যেত যথাযথ মানানসই রঙের কাচের ভিতর দিয়ে।

এইভাবে সৃষ্ট স্টিরিওস্কোপিক ভ্রান্তি দারুণ মজাদার। জিনিসগুলো যেন সোজা তোমার দিকে এগিয়ে আসে। ধরো একটা বিশাল মাকড়সা গুটিগুটি

এগিয়ে আসছে তোমার দিকে এবং তুমি তখন আপনা থেকেই ভয়ে শিউরে বা চিৎকার করে উঠবে। এই কাজে যে যন্ত্র লাগে তা খুবই সরল। 134 নং চিত্র থেকে তার ধারণা পাবে। চিত্রে G এবং R হচ্ছে সবুজ এবং লাল বাতি দুটি (বাঁদিকে); P এবং Q হল এই দুই আলো ও পর্দার মাঝে স্থাপিত বস্তু; pG, qG, pR এবং qR হল এই বস্তুদের দ্বারা পর্দার উপর নিক্ষিপ্ত রঙীন ছায়া; G সবুজ কাচ ও R লাল কাচ এবং এই দুটি কাচ দিয়ে দেখার সময় দর্শক P_1 এবং Q_1 নির্দিষ্ট অংশে বস্তুদুটিকে দেখতে পাবে। পর্দার পিছনে মাকড়সাটাকে যখন Q থেকে P-তে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়, দর্শক মনে করে ওটা Q_1 থেকে P_1-এ এগিয়ে এল।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, যত বার পর্দার পিছনে বস্তুটাকে আলোর উৎসের দিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার ফলে পর্দার উপর নিক্ষিপ্ত ছায়াটি আকারে বৃদ্ধি পায়, ততবারই দর্শক ভাবে বস্তুটা পর্দা থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

যে জিনিসটাকে দর্শক ভাবে পর্দা থেকে তার দিকে এগিয়ে আসছে, সেটা আসলে পর্দার পিছনে ঠিক তার উল্টো দিকে সরে যাচ্ছে, অর্থাৎ, পর্দা থেকে আলোকের উৎসের দিকে।

ম্যাজিক রূপান্তর

এবার লেনিনগ্রাদ রিক্রিয়েশন পার্কে 'বিজ্ঞানে বিনোদন' নামে প্যাভিলিয়নে যে সব বুদ্ধিদীপ্ত পরীক্ষা দেখান হয় সে সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। প্যাভিলিয়নের একটা কোণকে বৈঠকখানার মতো সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এর চেয়ারগুলোতে লাগান ছিল তৈল-নিরোধক গাঢ়-কমলা রঙের ঠেস-ঢাকনা, টেবিলে বিছান ছিল সবুজ পশমী চাদর, তার উপর বসান ছিল লাল ক্রেন-বেরীর রস ভরা কাচের পাত্র আর ফুল-সমেত একটা ফুলদানি। তাছাড়া এক তাক ভরা বই ছিল যাদের বাঁধাইয়ের উপর রঙীন হরফে নাম লেখা ছিল।

দর্শকরা প্রথমে সাধারণ সাদা বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত 'বৈঠকখানা' দেখত। তারপর সাধারণ আলো নিভিয়ে পরিবর্তে একটা লাল আলো জ্বেলে দিতেই দেখা যেত, কমলা ঢাকনাগুলি গোলাপী এবং সবুজ টেবিল ক্লথ গাঢ় রক্ত-বেগুনী হয়ে দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যে লাল বেরীর রস তার রঙ হারিয়ে সাদা জলের মতো দেখাত, ফুলদানির ফুলগুলোরও রঙ পাল্টে গিয়ে অন্যরকম মনে হত, এবং বাঁধাই-করা বইগুলোর উপরকার কিছু কিছু লেখা একেবারে অদৃশ্য হয়ে যেত। আরেকবার সুইচ টিপলে 'সবুজ' আলো জ্বলে উঠত। 'বৈঠকখানা' তখন আবার এমন ভোল বদলে ফেলত যে চেনাই মুশ্কিল হয়ে যেত।

এই ম্যাজিক রূপান্তর নিউটনের বর্ণতত্ত্বকেই ভালভাবে ব্যাখ্যা করে। নিউটনের তত্ত্বের সার হল, একটি তলের রঙ কি হবে সেটা তলটা কোন কোন রঙের রশ্মি বিক্ষিপ্ত করছে তার উপর নির্ভর করবে। তলটা কোন রশ্মি শোষণ করছে তার সঙ্গে তলটার রঙের কোনো সম্পর্ক নেই। নিউটনের স্বদেশবাসী খ্যাতনামা ব্রিটিশ পদার্থবিদ জন্ টিন্ডাল এই বক্তব্যটাকেই সূত্রবদ্ধ করেছেন।

"অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঘনায়িত সাদা আলোর রশ্মি ফেলা হল তাজা পাতার উপর। তারপর পর্যায়ক্রমে একটা বেগুনী কাচ একবার টেনে আনলে ও সরিয়ে দিলেই হঠাৎ সবুজটা লাল এবং লালটা আবার সবুজ হয়ে ওঠার যে ব্যাপারটা ঘটে সেটা ভারী বিস্ময়কর……এটা শোষণের ব্যাপার।"

বোঝাই যাচ্ছে যে, সাদা আলোয় সবুজ টেবিলক্লথটাকে সবুজ দেখাবার কারণ হল, এটা মূলত সবুজ রশ্মি এবং সন্নিহিত বর্ণালীর রঙগুলো বিক্ষিপ্ত করছিল এবং বাকী সব রশ্মির প্রায় সবটাই শোষণ করে নিচ্ছিল। আমরা যদি এই সবুজ টেবিলক্লথের উপর লাল ও বেগুনী আলোর একটা মিশ্রণ নিক্ষেপ করি তাহলে সেটা শুধু বেগুনীকে বিক্ষিপ্ত করবে ও লালের অধিকাংশই শোষণ করে নেবে এবং ফলত রক্তবর্ণ হয়ে উঠবে। 'বৈঠকখানা'-য় রঙের যত রকম পরিবর্তন ঘটে তার পিছনে এটাই হল প্রধান কারণ।

কিন্তু লাল আলো ফেলার পর লাল বেরীর রস সমস্ত রঙ হারাল কেন? কারণ পাত্রটাকে সবুজ পশমী টেবিলক্লথের উপর পাতা এক ফালি সাদা কাপড়ের উপরে রাখা হয়েছিল। আমরা এই সাদা কাপড়টা সরিয়ে নিলেই লাল বেরীর রস লাল হয়ে উঠবে। এটা তখনই তার রঙ হারায় (লাল আলোয়) যখন এর পশ্চাদপট হিসাবে সাদা কাপড়টা থাকে। সাদা কাপড়টা যদিও লাল হয়ে ওঠে, তবু অভ্যাসবশত এবং টেবিলক্লথের রঙের সঙ্গে প্রতিতুলনায় এটাকে আমরা সাদা হিসাবেই গণ্য করি। রসের রঙটা ওই কাপড়ের ফালির সঙ্গে এক হয়ে যায় এবং কাপড়ের ফালিটাকে আমরা সাদা বলে গণ্য করি, তাই নিজেদের অজ্ঞাতসারেই রসটাও আমাদের সাদা বলে মনে হয়। এই কারণেই ওটাকে তখন লাল রসের পরিবর্তে সাদা জলের মত দেখায়। রঙীন কাচের মধ্য দিয়ে যদি আশপাশের জিনিসপত্র দ্যাখো, তাহলেও এই রকম অনুভূতি লাভ করবে।

এই বইটা কতটা লম্বা?

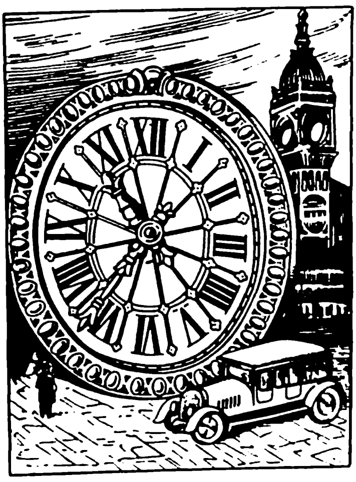
তোমার বন্ধুকে জিগ্যেস করো, সে যদি তার হাতের বইটাকে মেঝের উপর রেখে খাড়া করে ধরত তাহলে সেটা কতটা লম্বা হত। এবার তার বিবৃতিটা পরীক্ষা করো। তার আন্দাজে ভুল হবেই। সে যা বলেছে বইটা লম্বায় তার অর্ধেক হবে। আরো ভাল হয় যদি তাকে নিচু হয়ে হাত দিয়ে উচ্চতা নির্দেশ করতে না বলে মুখে বলতে বলো। তুমিও চেষ্টা করো তার সঙ্গে। পরিচিত

যে কোনো জিনিস, যেমন ধরো একটা টেবিল ল্যাম্প বা টুপি নিয়েও পরীক্ষা করে দেখতে পারো। অবশ্য জিনিসটা এমন হওয়া চাই যা তোমরা চোখের তল বরাবর দেখতে অভ্যস্ত। লোকে যে ভুল করে তার কারণ হল ধার থেকে দেখলে প্রত্যেক বস্তুই আকারে ছোট হয়ে যায়।

টাওয়ার ক্লকের ডায়াল

আমাদের মাথার অনেক উপরকার কোনো জিনিসের বিশেষ করে টাওয়ার ক্লকের আকার অনুমান করার সময়ে আমরা অনবরত এই একই ভুল করি। আমরা জানি এই ঘড়িগুলো খুবই বড়, তবু আমাদের অনুমিত আকার বাস্তবের চেয়ে

চিত্র 135



ওয়েস্ট মিনিস্টার টাওয়ার ঘড়ির আকার।

অনেক ছোট হয়। 135 নং চিত্রে দেখান হয়েছে, লণ্ডনের বিখ্যাত ওয়েস্টমিনস্টার টাওয়ার ক্লকটিকে নিচে রাস্তার উপর নামিয়ে আনা হলে কত বড় দেখাবে। সাধারণ মানুষকে এর পাশে বেঁটে বামন বলে মনে হবে। তা সত্ত্বেও ওই দূরবর্তী ক্লক-টাওয়ারের মধ্যে যে ফোকরটি দেখানো হয়েছে, তার মধ্যে এটা কিন্তু ঠিক এঁটে যাবে—বিশ্বাস করো আর নাই করো!

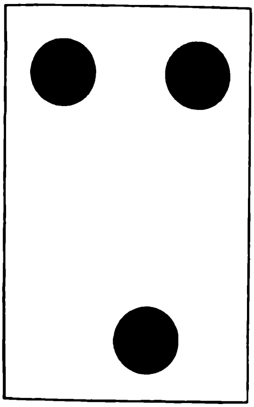
সাদা আর কালো

দূর থেকে চিত্র 136-এর দিকে তাকিয়ে বলতে হবে, ওই তলাকার ফোঁটা আর উপরকার যে কোনো একটা ফোঁটার মধ্যে ক'টা কালো ফোঁটা বসানো যাবে। চারটে

না পাঁচটা ? আমি বলে দিতে পারি তোমরা বলবে, "তা ওখানে পাচটা না হলেও চারটের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে।"

বিশ্বাস করো বা না করো, পরীক্ষা করে মিলিয়েও নিতে পারো, ওখানে শুধু তিনটের জায়গা আছে তার বেশি নয়। এই ভ্রম যার জন্য কালো রঙের অংশকে সমান মাপের সাদা রঙের অংশের চেয়ে ছোট মনে হয়, এটা 'কিরণীয়' (irradiation) নামে পরিচিত। আমাদের চোখের এক ত্রুটির ফলেই এরকম হয়। দৃকযন্ত্র হিসাবে আমাদের চোখ ঠিক আলোক বিজ্ঞানের চুলচেরা প্রয়োজন মেটাতে পারে না। ভালভাবে ফোকাস-করা ক্যামেরার ঘষা কাচের পর্দার উপর বস্তুর যেরকম সুনির্দিষ্ট বহিসীমা পাওয়া যায়, চোখের প্রতিসরণীয় মাধ্যম ঠিক তেমনটা প্রক্ষেপ করতে পারে না ওর রেটিনার উপরে। 'গোলাপেরণ' নামে যা

চিত্র 136



তলার বিন্দু ও ওপরকার যেকোন বিন্দুর মধ্যেকার ফাঁকটা মনে হয় ওপরকার বিন্দু দুটোর মধ্যেকার ফাঁকের বেশী। আসলে, দুটোই সমান।

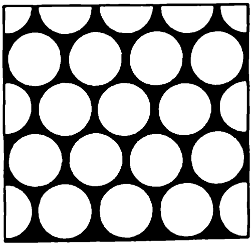
পরিচিত তার জন্য প্রত্যেকটি সাদা অংশের একটি সাদা ঝালর থাকে যা রেটিনার প্রতিবিম্বের আকারকে বাড়িয়ে দেয়। এই জন্যই সমান আকারের কালো ও সাদা অংশের মধ্যে সাদাটাকে বড় দেখায়।

বিখ্যাত কবি গোটে প্রকৃতির একজন একনিষ্ঠ ছাত্র-দর্শক হলেও পদার্থবিদ হিসাবে খুব বিজ্ঞতার পরিচয় দেন নি। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'থিওরি অফ কালারস্'-এ লিখেছেন :

"একটি কালো বস্তুকে সমান মাপের সাদা বস্তুর চেয়ে ছোট দেখায়। কালো জমির উপর একটা সাদা ফোঁটা এবং সাদা জমির উপর সমান ব্যাসবিশিষ্ট একটি কালো ফোঁটাকে আমরা যদি যুগপৎ পর্যবেক্ষণ করি তাহলে শেষোক্তটি পূর্বোক্তটির চেয়ে পাঁচভাগের এক ভাগ ছোট বলে মনে হবে। আমরা যদি তদনুসারে কালো ফোঁটাটাকে বড় করে দিই তাহলে দুটো ফোঁটাকেই এক রকম মনে হবে। বর্ধমান

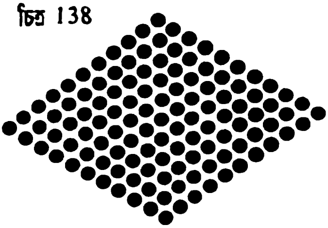
চাঁদের ফালিকে এমন একটা বৃত্তের অংশ বলে মনে হয় যার ব্যাসটা চাঁদের ছায়াময় অংশের চেয়ে বড় হবে। এই ছায়াময় অংশটাও কখনো কখনো দেখা যায় ["পূর্ণিমার চাঁদ যখন অমাবস্যার বাহুলগ্ন" তখন যে ছাইরঙা আলো দেখা যায় —লেখক]। হালকা রঙের পোশাকের চেয়ে কালচে ধরনের পোশাকে আমাদের রোগা লাগে। একটা কিছুর কিনারা গড়িয়ে উপর দিয়ে আগত আলো যেন তার

চিত্র 137



দূর থেকে গোল সাদা ফোঁটাগুলোকে ষড়ভুজের মত দেখায়।

চিত্র 138



দূর থেকে কালো ফোঁটাগুলোকে ষড়ভুজের মত দেখায়।

মধ্যস্থলে একটা অবনমন ঘটায়। একটা স্কেলের পিছনে মোমবাতি জ্বললে, ওই জায়গাটায় স্কেলের উপর যেন একটা খাঁজ আছে বলে মনে হয়। সূর্য উদয় বা অস্ত যাবার সময়েও যেন দিগন্তে অবনমন সৃষ্টি করে বলে মনে হয়।"

গ্যেটে সবই ঠিক বলেছেন, শুধু একটাই ব্যতিক্রম—একটা সাদা অংশ সমান মাপের কাল অংশের চেয়ে সর্বদাই একই অনুপাতে বড় দেখাবে না। অংশ দুটোর দিকে কতটা দূরে থেকে তাকানো হচ্ছে শুধু তার উপরেই নির্ভর করে সেটা। কেন ? 136 নং চিত্রটাকে আরও দূরে সরিয়ে দাও। ভ্রমটা আরও বিস্ময়কর হবে, কারণ আগে যে প্রসারিত ঝালরের কথা বলা হয়েছে সেটার আকার সর্বদাই সমান। কাছে থাকলে ঝালরটা সাদা ক্ষেত্রটাকে 10% বাড়িয়ে তোলে। দূরে থাকলে, সেটা সাদা ক্ষেত্রের 30%, এমনকি 50% অবধি অধিকার করতে পারে, কারণ ফোঁটাটার আসল প্রতিবিম্বটা ইতিমধ্যে নিজেই ছোট হয়ে এসেছে। এর থেকেই বোঝা যায় যে, দু' তিন পা দূরে থেকে 137 নং চিত্রের গোল সাদা ফোঁটাগুলোকে কেন ষড়ভুজ বলে মনে হয়। ছয় বা আট পা দূরে সরে গেলে ছবিটাকে পুরোপুরি মৌচাকের মতোই লাগবে।

শুধু 'কিরণীয়ন'-ই এই ভ্রমের জন্য দায়ী, এই ব্যাখ্যাটা আমায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি, সাদা জামার উপর কালো

ফোঁটা থাকলেও দূর থেকে ষড়ভুজের মতো লাগে, যদিও 'কিরণীয়ন' বাড়ে না, উপরন্তু ফোটার আকৃতি ছোট হয়ে আসে। খেয়াল রাখা দরকার যে, দৃষ্টি বিভ্রমের জন্য সাধারণত যে সব ব্যাখ্যা দেওয়া হয় তা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। সত্যি বলতে বেশির ভাগ বিভ্রান্তির এখনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি।

কোনটা বেশি কালো ?

চিত্র 139 এবার আমাদের চোখের আরেকটি ত্রুটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। একে বলে 'বিষমদৃষ্টি' (অ্যাসটিগম্যাটিজম)। এক চোখ দিয়ে লেখাটা দেখ। চারটে হরফকেই সমান কালো বলে মনে হবে না। কোনটা সবচেয়ে কালো দেখে নাও এবং ছবিটাকে এক পাশে ঘুরিয়ে ধরো। যে হরফটাকে সবচেয়ে

চিত্র 139



এক চোখ দিয়ে শব্দটার দিকে তাকাও। একটা অক্ষরকে বাকিগুলোর চেয়ে বেশি কালো মনে হবে।

কালো মনে হয়েছিল সেটা হঠাৎ ধূসর হয়ে উঠবে এবং এবার অন্য একটা হরফকে সবচেয়ে কালো মনে হবে। আসলে চারটে হরফই সমানভাবে কালো। শুধু দাগগুলো বিভিন্ন দিক্ বরাবর টানা হয়েছে। দামী কাচের লেন্সের মতোই আমাদের চোখ যদি নিখুঁত হত তাহলে এই দাগ-টানার সঙ্গে হরফগুলোর কালো দেখানোর কোনো সম্পর্ক থাকত না। কিন্তু আমাদের চোখ যেহেতু সব দিকে সমানভাবে আলোকে প্রতিসারিত করে না, তাই খাড়া, অনুভূমিক এবং বাঁকা রেখাগুলোকে ঠিক সমান রকম স্পষ্ট দেখতে পারি না।

ক্বচিৎ দেখা যায় যে, চোখ পুরোপুরিভাবে এই ত্রুটিমুক্ত। কোনো কোনো লোকের ক্ষেত্রে এই 'বিষমদৃষ্টি' এত বেশি যে তার জন্য তার দৃষ্টিশক্তি কমে যায় এবং ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিশেষ ধরনের চশমা পরতে হয়। আমাদের চোখের অন্যান্য দোষ আছে, চশমা-নির্মাতারা জানেন কি করে সেগুলো দূর করতে হয়। হেলম্‌হোলৎজ্ তাঁদের সম্বন্ধে বলছেন :

"যদি কোনো আলোকযন্ত্রী আমাকে এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ একটা যন্ত্র বিক্রি করার সাহস করত তাহলে তাকে আমি খুবই তিরস্কার করতাম এবং যন্ত্রটা ফেরত পাঠাতে দ্বিধা করতাম না।"

চোখের বিশেষ কিছু অসম্পূর্ণতার দরুন এই ধরনের বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হয়, কিন্তু এ ছাড়াও আরো অনেক বিভ্রান্তি ঘটে আমাদের যার কারণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

যে প্রতিকৃতি চেয়ে চেয়ে দেখে

কখনও না কখনও এমন প্রতিকৃতি তুমি নিশ্চয় দেখেছ যা শুধু সরাসরি তোমার চোখের দিকে তাকিয়েই থাকে না, তুমি যেখানেই যাও তার চোখ দুটো তোমায় অনুসরণ করে। বহুকাল পূর্বেই লোকে এটা নজর করেছিল এবং ঘটনাটা চিরকালই মানুষকে ধাঁধায় ফেলেছে এবং কারুর কারুর কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছে। মহান রাশিয়ান লেখক নিকোলাই গোগোল তাঁর 'প্রতিকৃতি'-তে এই সম্বন্ধে একটি অপূর্ব বিবরণ দিয়েছেন:

"চোখ দুটো যেন তাঁকে বিঁধে ফেলছিল এবং মনে হচ্ছিল সব কিছু ছেড়ে শুধু তাঁর উপরেই নজর রাখতে চাইছে। প্রতিকৃতিটা সব কিছু ছাড়িয়ে সরাসরি তাঁর দিকে এবং তাঁকে ভেদ করে তাকিয়ে ছিল।"

এই রহস্যময় দৃষ্টির সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু কুসংস্কার ও উপকথা। আসলে এটা দৃষ্টি বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। এই ধরনের প্রতিকৃতির কৌশল হল চোখের তারাটা এখানে ঠিক চোখের মাঝখানে বসানো থাকে। আমাদের দিকে

চিত্র 140



রহস্যময় প্রতিকৃতি

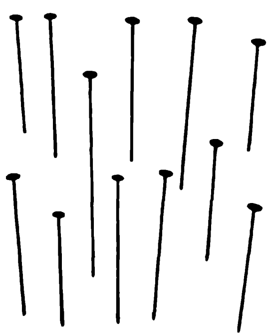
সরাসরি কেউ যখন চেয়ে থাকে সে সময় ঠিক এমনই ভাবে মণিটাকে মাঝখানে দেখি আমরা। কেউ যখন আমাদের পাশ কাটিয়ে পিছনে কিছুর দিকে তাকায় তখন তার চোখের তারা ও উপতারা আর চোখের মাঝখানে থাকে না, এক পাশে সরে যায়। কিন্তু আমরা যে দিকেই সরে যাই না কেন; এ ধরনের প্রতিকৃতির মধ্যে চোখের তারাটা সর্বদাই থাকে চোখের মাঝখানে। এবং আমাদের অবস্থানের সাপেক্ষে মুখটাকে আমরা একই জায়গায় দেখতে থাকি বলে আমরা স্বাভাবিক-ভাবেই মনে করি যে, প্রতিকৃতির মানুষটা আমাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়েছে এবং আমাদের লক্ষ্য করছে। এর থেকেই বোঝা যায়, এই ধরনের আরও কিছু

কিছু ছবি দেখে কেন অদ্ভুত অনুভূতির সৃষ্টি হয়। যেমন, আমরা যতই এড়াবার চেষ্টা করি, ছবির ঘোড়াটা যেন আমাদের তাড়া করে বা একটা লোক সোজা আমাদের দিকে আঙুল তুলে রাখে ইত্যাদি ইত্যাদি। চিত্র 140 এই ধরনের একটা প্রতিকৃতি। এগুলো হামেশাই বিজ্ঞাপন বা প্রচারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

চোখের আরও বিভ্রম

141 নং চিত্রের এক গুচ্ছ পিনের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে মনে হয় না, তাই নয় কি? যাই হোক, বইটাকে চোখের কাছে উঁচু করে এমন করে তোল যাতে এক চোখে হাত চাপা দিয়ে পিনগুলোর দিকে তাকালে তোমার দৃষ্টি

চিত্র 141



একটা চোখ (অন্যটা বন্ধ রেখে) এমন একটা বিন্দুর ওপর রাখো যেখানে এই পিন-গুলোর কল্পিত বৃদ্ধি মিশে যাবে। মনে হবে পিনগুলো কাগজের ওপর খাড়াভাবে গাঁথা আছে। বইটাকে আস্তে আস্তে পাশাপাশি নাড়লে তোমার মনে হবে যে পিনগুলো দুলছে।

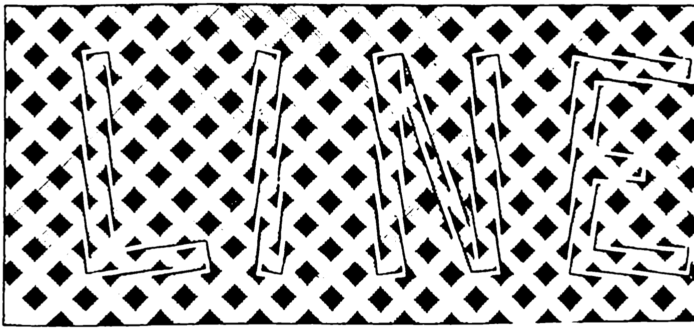
পিনগুলোকে উপর দিক থেকে অনুসরণ করে নিচে নেমে আসে। তোমার চোখটা সেই বিন্দুতে থাকা দরকার যেখানে পিনগুলোয় কল্পিত পরিবর্ধন ছেদ করবে। তখন মনে হবে পিনগুলো যেন খাড়াভাবে গাঁথা রয়েছে কাগজের উপর। এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ালে সেই অনুসারে পিনগুলোও যেন দুলছে বলে মনে হয়।

পরিপ্রেক্ষণের সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এই বিভ্রম। দর্শক নির্দিষ্ট স্থানে থাকলে খাড়া পিনগুলো যেমন দেখাবে কাগজের উপরে তারই প্রক্ষেপ আঁকা হয়েছে।

আমাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটার ব্যাপারটাকে শুধু চোখের নেতিবাচক ত্রুটি হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। এটা ঘটে বলেই আমরা একটা বিশেষ সুবিধা ভোগ করি। যদিও তার কথা আমরা প্রায়ই ভুলে যাই। এই সুবিধাটা হল, এরকম না ঘটলে আমাদের চিত্রকলা বলে কিছু থাকত না। এমনকি সাধারণ ভাবে চারু শিল্পও আমাদের কোন আনন্দ দিতে পারত না। শিল্পীরা আমাদের দৃষ্টির এই অসম্পূর্ণতার উপর অনেকখানি নির্ভর করেন তার অঙ্কন নৈপুণ্যের জন্য।

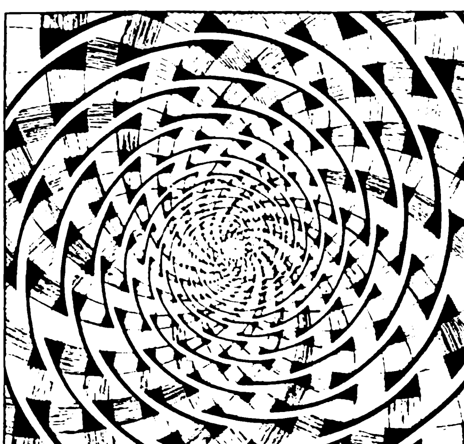
"চিত্রকলার পুরো শিল্পটাই এই বিভ্রমের উপর নির্ভরশীল।" অষ্টাদশ শতাব্দীর মহাপণ্ডিত অয়লার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'লেটারস্ অন্ ভেরিয়াস ফিজিকাল সাবজেক্টস'-এ লিখেছেন, 'যে জিনিসটা বাস্তবে যা তাকে যদি আমরা তাই মনে

চিত্র 142



হরফগুলো খাড়া।

চিত্র 143

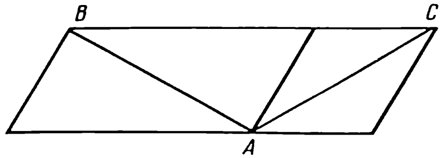


এটাকে একটা কুণ্ডলী বলে মনে হচ্ছে ; আসলে বক্ররেখাগুলো বৃত্ত। রেখাগুলোকে সরু পেন্সিল নিয়ে অনুসরণ করলেই তুমি সেটা বুঝতে পারবে।

করতাম তাহলে এই শিল্পের (চিত্রকলার) কোনো অস্তিত্ব থাকত না এবং আমরা অন্ধ হয়ে যেতাম। চিত্রকর বৃথাই রঙ মেশাতে চেষ্টা করত, কারণ আমরা তখন

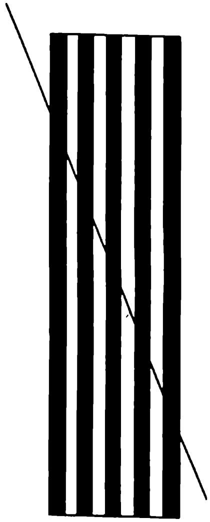
দেখতাম এখানে লাল রয়েছে এবং ওইখানে নীল, এখানে কালো রয়েছে এবং ওখানে সাদার ডোরা। সব কিছুই অবস্থান করত একটি তলে, দূরত্বের কোনো পার্থক্যই চোখে পড়ত না এবং কোনো জিনিসকেই চেনা যেত না। চিত্রকর যাই দেখাবার চেষ্টা করুক, আমাদের কাছে সবই যেন কাগজের উপরকার লেখার মত মনে হত। দৃষ্টির সম্পূর্ণতা পেলে সেটা তো উল্টে দুঃখের কারণই হয়ে দাঁড়াতো, তখন আর এখনকার মতো প্রতিদিন মনোরম সব শিল্পের নিদর্শন উপভোগ করতে পারতাম না।"

চিত্র 144



AB এখানে AC-র সমান, যদিও AB কে দীর্ঘতর মনে হয়।

চিত্র 145

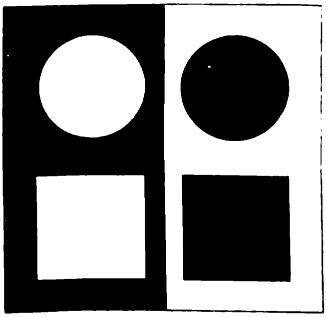


তেরছা রেখাটা ভাঙা-ভাঙা মনে হয়।

বহু রকমের দৃষ্টি বিভ্রম আছে যা পুরো একটা অ্যালবাম ভরে ফেলতে পারে। তার মধ্যে অনেকগুলো পরিচিত, আর বাদবাকী স্বল্প পরিচিত। তেমন জানা নেই এরকম কিছু অদ্ভুত উদাহরণ দিচ্ছি। খোপকাটা জমির উপর রেখা টানা 142 ও 143 নং চিত্রের বিভ্রম বিশেষভাবে কার্যকর। কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না যে, 142 নং চিত্রের হরফগুলো খাড়া আছে এবং 143 নং চিত্রের বৃত্তগুলো যে একটা কুণ্ডলীর অংশ নয়; সেটা বিশ্বাস করা আরও শক্ত।

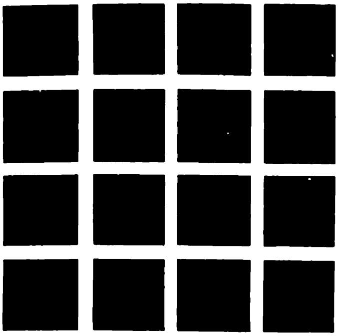
এটা পরীক্ষা করার একমাত্র উপায় হল একটা পেন্সিল নিয়ে বৃত্তগুলো অনুসরণ করা। এক জোড়া কম্পাস নিলে তবেই বুঝতে পারবে যে, 144 নং চিত্রের AC

চিত্র 146



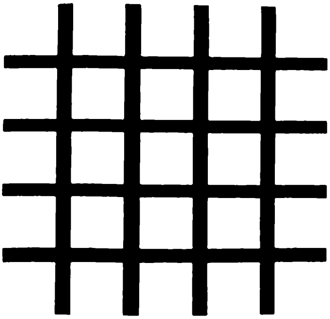
সাদা এবং কালো বর্গক্ষেত্র দুটো সমান, সাদা এবং কালো সাদা ফোঁটা দুটোও তাই।

চিত্র 147



সাদা কালিগুলো যেখানে ছেদ করছে, সেখানে ছোট ছোট ধূসর বর্গক্ষেত্র দেখা দেয় ও মিলিয়ে যায় যদিও কালিগুলো আগাগোড়াই সাদা। কালো বর্গক্ষেত্রগুলোর ওপর কাগজ চাপা দিলেই সেটা প্রমাণ করা যাবে। বৈসাদৃশ্যের জন্যই এই বিভ্রম।

চিত্র 148



কালো কালিগুলো যেখানে ছেদ করছে, সেখানে আবছা ধূসর বর্গক্ষেত্র দেখা দেয় ও মিলিয়ে যায়।

রেখাটি AB-র চেয়ে ছোট মনে হলেও আসলে তার সমান। 145, 146, 147 এবং 148 নং চিত্রের বিভ্রমগুলো সম্বন্ধে চিত্রগুলোর পরিচর্যালিপিতেই লেখা আছে।

147 নং চিত্রের বিভ্রমটা কি রকম কার্যকর তার সম্বন্ধে একটা মজার ঘটনা বলছি। এই বইয়ের পূর্ববর্তী একটি সংস্করণের প্রুফ পরীক্ষা করার সময় প্রকাশক মনে করেছিলেন ব্লকটা ঠিক মতো তৈরী হয়নি এবং তিনি সেটা ছাপাখানায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সাদা রেখাগুলোর সংযোগস্থানের ধূসর ছোপগুলো চেঁচে সরিয়ে দিতে। এমন সময় হঠাৎ আমি ব্যাপারটা জানতে পারি এবং ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি।

অদূরবদ্ধ দৃষ্টি

চশমা খোলা অবস্থায় অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ মোটেই ভাল দেখতে পায় না। কিন্তু তিনি কি দেখেন এবং কিভাবে দেখেন সে সম্বন্ধে স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের ধারণা খুব ধোঁয়াটে। অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের সংখ্যা কম নয়, তাই তাঁরা কিভাবে দেখেন জানতে কোনো দোষ নেই।

প্রথমত, অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্নের কাছে সবকিছুই ঝাপসা ঠেকে। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে যেটা পাতা ও ডাল—আকাশের গায়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ছে—অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের কাছে সেটা শুধু এক তাল সবুজ। তিনি তার খুঁটিনাটি দেখতে পান না। মানুষের মুখগুলোকে দেখে মনে হয় কম বয়সের আর বেশ আকর্ষণীয়। বয়সের ভাঁজ ও ছোটখাট ত্রুটি চোখে পড়ে না। প্রকৃতির হস্তক্ষেপে বা সাজসজ্জার কারণে যদি কর্কশ ভাব দেখা দেয়, সেটাও তাঁর কাছে ভালই লাগে। তিনি বয়সের হিসাবে কুড়ি বছরেরও এদিক-ওদিক করে ফেলতে পারেন। স্বাভাবিক দৃষ্টিসম্পন্নের তুলনায় সৌন্দর্য সম্বন্ধে তাঁর রুচি অদ্ভুত বলে মনে হয়। সরাসরি একজনের চোখের দিকে তাকিয়েও তিনি যখন তাকে চিনতে পারেন না, লোকে তাঁর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করে। দোষটা তাঁর নয়। এর জন্য দায়ী তাঁর অদূরবদ্ধ দৃষ্টি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়ান কবি দেলভিগ (Delvig) লিখেছেন, "লিসিতে (Lycee) আমাকে চশমা পরতে দেওয়া হয়নি এবং আমার মেয়ে বন্ধুদের তখন কি অপূর্ব সুন্দরীই না মনে হত। পাস করে বেরোবার পর কি আঘাতটাই না পেয়েছিলাম।" তোমার অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন বন্ধু যখন (বিনা চশমায়) তোমার সঙ্গে গল্প করে, সে তোমার মুখ দেখতে পায় না। অন্তত পক্ষে, সে যা দেখতে পাচ্ছে বলে তুমি ভাব, তা দেখতে পায় না। তোমার প্রতিবিম্বটা তার কাছে ঝাপসা লাগে। কাজেই এক ঘণ্টা বাদেই সে যদি তোমায় চিনতে না পারে তবে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। বেশির ভাগ অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ যতটা না চেহারা দেখে, তার চেয়ে বেশি গলার আওয়াজ শুনে লোককে চেনে। দৃষ্টির যেটুকু অক্ষমতা তা পুষিয়ে দেয় শ্রবণের একাগ্রতা।

রাত্তিরে অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন লোক কি দেখে জানতে চাও? যে কোনো উজ্জ্বল বস্তু—রাস্তার আলো, আলোকিত জানলা ইত্যাদি বিশাল আকার ধারণ করে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎটাকে একটা এলোপাথারি আকৃতিহীন উজ্জ্বলতা ও অন্ধকার ধোঁয়াটে ছায়ার সমাহার করে তোলে। এক সারি রাস্তার আলোর পরিবর্তে অদূরবদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্নরা দু'তিনটে বিশালাকার উজ্জ্বল ছোপ দেখেন, যা রাস্তার অবশিষ্ট অংশকে মুছে দেয়। অগ্রসররত মোটরগাড়ি তিনি চিনতে পারেন না। পরিবর্তে তিনি শুধু তার সামনের আলোদুটোর উজ্জ্বল ছটা দেখেন এবং তার পিছনে একটা করে বস্তুপিণ্ড। আকাশটাকে অবধি অন্যরকম লাগে। তিনি সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রথম তিন চার গোত্রের নক্ষত্রদের দেখতে পান এবং তার ফলে হাজার হাজার নক্ষত্রের বদলে মাত্র কয়েক শ' তাঁর চোখে পড়ে, যেগুলো রাস্তার আলোর মত বড় বলে মনে হয়। চাঁদটাকে সাংঘাতিক এবং খুব কাছে আছে মনে হয় এবং এক ফালি চাঁদ অদ্ভুত চেহারা ধারণ করে।

আমাদের চোখের গঠনের মধ্যেই রয়ে গেছে ত্রুটি। অক্ষিগোলকটা বেশি গভীর, এত বেশি যে এর পরিবর্তিত প্রতিসরণ ক্ষমতা দূরবর্তী বস্তু প্রতিবিম্বকে রেটিনায় পৌঁছবার আগেই ফোকাস করে দেয়। আলোর অপসারী রশ্মি থেকে রেটিনার ঝাপসা প্রতিবিম্ব তৈরী হয়।

পরিচ্ছেদ ১০

শব্দ ও শ্রবণ

প্রতিধ্বনির সন্ধানে

মার্ক টোয়েন ভারী মজা করে একজন লোকের বিচিত্র অভিযানের কাহিনী বলেছেন। এই লোকটার একটা অদ্ভুত জিনিস সংগ্রহ করার শখ ছিল। হাজার চেষ্টা করলেও সেটা কি আন্দাজ করতে পারবে না—লোকটা প্রতিধ্বনি সংগ্রহ করত! এই খামখেয়ালী লোকটা যেখানে-যেখানে একাধিক প্রতিধ্বনি বা অন্য কোনো আশ্চর্য ধরনের স্বাভাবিক প্রতিধ্বনি শোনা যেত, সেই সব জায়গা কিনে নিতে চেষ্টার কোনো কসুর করেনি।

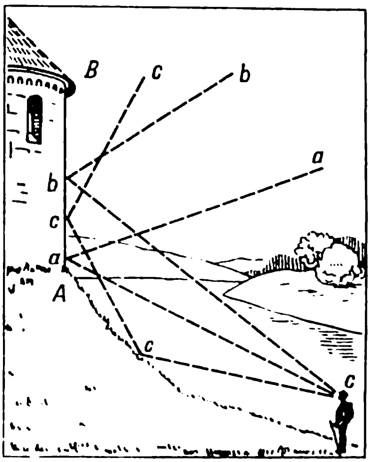
"তিনি প্রথমে জর্জিয়ায় একটি প্রতিধ্বনি কেনেন যেটা চারবার ধ্বনিত হত, তার পরে কেনেন মেরীল্যাণ্ডে একটা—ছয় ধ্বনিবিশিষ্ট। তার পরে কেনেন মেইনে তের ধ্বনিবিশিষ্ট. এবং পরে কানসাসে নয় ধ্বনিবিশিষ্ট একটা এবং সব শেষে কেনেন টেনেসির বারো ধ্বনিবিশিষ্টটা—এটা তিনি কম দামেও পেয়েছিলেন বলা যায়, কারণ এর কোনো সংস্কার হয়নি। ধ্বনি প্রতিফলনকারী পাহাড়টার একটা অংশ ভেঙে পড়েছিল। তিনি ভেবেছিলেন কয়েক হাজার ডলার খরচ করে এটাকে সারিয়ে নেবেন এবং ইঁট-পাথর দিয়ে তার উচ্চতা বাড়িয়ে প্রতি-ধ্বনি ক্ষমতাকে তিনগুণ করা দেওয়া যাবে। কিন্তু যে স্থপতি কাজের ভার নিয়েছিলেন তিনি আগে কখনো প্রতিধ্বনি নির্মাণের এধরনের কাজ করেন নি. তাই এটাকে তিনি একেবারে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। ভণ্ডুল করে দেওয়ার আগে এটা শ্বাশুড়ির মতো ধমক দিত, কিন্তু এখন এটা বোবা-কালাদের আশ্রমেই শুধু ঠাঁই পেতে পারে।"

ঠাট্টার কথা বাদ দিলেও, বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে এমন কিছু স্থান আছে যেখানে বারংবার এমন অপূর্ব প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয় যে, জায়গা-গুলো বহুকাল ধরে সারা পৃথিবীর সুখ্যাতি লাভ করছে। কয়েকটা প্রসিদ্ধ প্রতিধ্বনি স্থলের নাম নিচে দেওয়া গেল। ইংল্যাণ্ডের উড্স্টক ক্যাসেলের প্রতিধ্বনি বেশ স্পষ্টভাবে সতেরটি স্বর-শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। হালবারস্টেডের কাছে ডেরেনবার্গ ক্যাসেলের ভগ্নস্তূপ, তার একটা দেওয়াল ভেঙে ফেলার আগে অবধি

সাতাশটি স্বর-শব্দের প্রতিধ্বনি তুলত। চেকোশ্লোভাকিয়ার অ্যাডারসবাখের (Adersbach) কাছে একটা পাথুরে অঞ্চলে একটা বিশেষ হিমবাহ-গর্ত আছে যেখানে সাতটা স্বর-শব্দের তিনবার প্রতিধ্বনি ঘটে। কিন্তু মাত্র কয়েক পা দূরে, কামান দাগলেও কোনো ফল পাওয়া যায় না। মিলানের কাছে একটা ক্যাস্‌ল্‌ ছিল যার থেকে বারেবারে খুব ভাল প্রতিধ্বনি পাওয়া যেত। সেটা এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ক্যাসেলের একটি অংশের জানলা থেকে গুলি ছুঁড়লে শব্দটা 40 থেকে 50 বার প্রতিধ্বনিত হত আর জোরে কথা বললে প্রায় 30 বার।

সুস্পষ্টভাবে একবার প্রতিধ্বনি শোনা যায় এমন জায়গা খুঁজে বার করাও খুব সহজ নয়। সোভিয়েত রাশিয়া এদিক থেকে ভাগ্যবান, কারণ এখানে অনেক জঙ্গল পরিবেষ্টিত ফাঁকা অঞ্চল এবং বনের মধ্যে গাছ কেটে পরিষ্কার করা জায়গা আছে। এখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করলে বনের দেওয়াল থেকে প্রতিফলিত হয়ে মোটামুটি স্পষ্ট প্রতিধ্বনি শোনা যায়। সমতলের চেয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে প্রতিধ্বনির নানা রকম বৈচিত্র্য ঘটে, কিন্তু সেটা ঘটে খুবই কম এবং তার হদিশ পাওয়াও শক্ত। কেন এরকম হয়? কারণ প্রতিধ্বনি হল কোনো বাধা থেকে প্রতিফলিত শব্দ তরঙ্গের একটি ধারা মাত্র। আলোর মত শব্দও একই সূত্র মেনে চলে—তার আপতন কোণ প্রতিফলন কোণের সমান হয়।

চিত্র 149



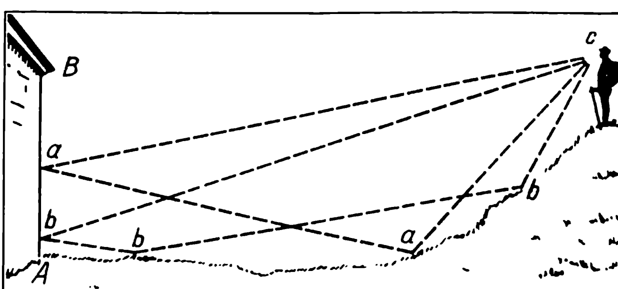
শব্দ প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে

মনে কর তুমি একটা পাহাড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছ (চিত্র 149) এবং শব্দ প্রতিফলনকারী বাধা *AB* রয়েছে তোমার মাথার উপরে। স্বাভাবিক ভাবেই ***Ca, Cb*** এবং ***Cc*** রেখা বরাবর বিস্তরণশীল শব্দ-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে তোমার

কানে এসে না পৌঁছে aa, bb, এবং cc দিক বরাবর বাতাসে ভেসে যাবে। কিন্তু যদি এমন হয় যে, শব্দ প্রতিফলনকারী বাধাটা রয়েছে তোমার সমান উচ্চতায় বা তারও একটু নিচুতে, যেমন দেখান হয়েছে 150 নং চিত্রে, তাহলে তুমি একটা প্রতিধ্বনি শুনতে পাবে। শব্দ *Ca* এবং *Cb* বরাবর অগ্রসর হয়ে মাটির উপর একবার বা দু'বার ধাক্কা খেয়ে ভাঙা-ভাঙা রেখা *CaaC* বা *CbbC* বরাবর ফিরে আসবে। দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী নিচু অংশটা অবতল দর্পণের মতো কাজ করে। C ও B বিন্দুর মধ্যবর্তী জমি যদি ফুলে উঁচু হয়ে থাকত তাহলে প্রতিধ্বনি খুব অস্পষ্ট হত এবং হয়তো তোমার কাছে পৌঁছতই না, কারণ জমিটা তাহলে শব্দকে বিক্ষিপ্ত করে দিত, ঠিক উত্তল দর্পণ যেমন আলোকে করে।

অসমতল অঞ্চলে প্রতিধ্বনি-স্থল খুঁজে বার করার জন্য তোমায় বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হবে এবং শুধু তাই নয়, কি করে তা সৃষ্টি করতে হয় তাও জানতে হবে। প্রথমত, প্রতিবন্ধকের খুব কাছে দাঁড়িও না। শব্দ-তরঙ্গকে বেশ কিছুটা দূর অবধি এগোবার সুযোগ দিতে হবে, কারণ তা না হলে প্রতিধ্বনি ঘটে যাবে খুব তাড়াতাড়ি এবং মূল শব্দের সঙ্গে মিশে যাবে। শব্দ 340 মিটার/সেকেন্ড বেগে অগ্রসর হয়, তাই 85 মিটার দূরে দাঁড়ালে ঠিক আধ সেকেন্ড পরে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। প্রত্যেক শব্দেরই প্রতিধ্বনি আছে, কিন্তু সব প্রতিধ্বনি সমান রকম স্পষ্ট নয়। সেটা নির্ভর করে জঙ্গলে পশু গর্জন করছে, না বিউগিল বাজছে,

চিত্র 150



কোন প্রতিধ্বনি নেই

না মেঘের ঘরঘরানি হচ্ছে, না একটি মেয়ে গান গাইছে, তার উপর। শব্দটা যত আকস্মিক ও জোরালো হবে তত স্পষ্ট হবে তার প্রতিধ্বনি। সবচেয়ে ভাল হাততালি। মানুষের গলা একেবারেই উপযোগী নয়। বিশেষ করে যদি সেটা পুরুষের গলা হয় তো একেবারেই নয়। শিশু ও মহিলাদের গলার তীক্ষ্মতা বেশি বলে স্পষ্টতর প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হয়।

শব্দ দিয়ে মাপজোখ

বাতাসে শব্দের বেগ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কখনো-কখনো এমন বস্তুর দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়, যার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক এই রকম একটি উদাহরণ দিয়েছেন জুল ভার্ন তাঁর 'জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ' বইটিতে। সেখানে ভূগর্ভে অভিযানের সময় দুই ভ্রমণকারী প্রফেসার ও তাঁর ভাগ্নে, একে অন্যের কাছ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। অনেক হাঁকাহাঁকির পর দু'জনে দু'জনকে শুনতে পেয়ে তাদের মধ্যে শুরু হল এই কথাবার্তা।

" 'মামা ?'

" 'হ্যাঁ বাবা !' কয়েক সেকেণ্ডের ব্যবধানে উত্তর দিলেন তিনি।

" 'প্রথমেই জানা দরকার আমরা কতটা দূরে রয়েছি।'

" 'সেটা খুব সহজ।'

" 'তোমার ক্রোনোমিটারটা কি আছে ?'

" 'হ্যাঁ।'

" 'বেশ, তাহলে ওটা বার করো : আমার নাম ধরে ডেকেই সময়টা দেখে নাও। যে মুহূর্তে আমি শুনতে পাব অমনি আমিও তাই করব এবং তুমি আবার ঠিক সময়টা দেখে নেবে।'

" 'হ্যাঁ ! আমার গলা তোমার কাছে পৌঁছতে প্রশ্ন এবং উত্তরের মধ্যবর্তী সময়ের অর্ধেকটা লাগবে।"

" 'ঠিক বলেছ।'

" 'তুমি রেডি তো ?'

" 'হ্যাঁ !

" 'বেশ, তাহলে শোন ভাল করে। আমি এবার তোমার নাম ধরে ডাকব।'

"দেওয়ালের উপর কান পেতে ধরলাম। 'অ্যাক্সেল' ডাকটা কানে আসা মাত্র সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম 'অ্যাক্সেল' বলে। তারপর অপেক্ষা।

" 'চল্লিশ সেকেণ্ড', মামা জানালেন। 'তাহলে শব্দ পৌঁছতে কুড়ি সেকেণ্ড লেগেছে। প্রতি সেকেণ্ডে 1020 ফিট হিসাবে, তার মানে 20,400 ফিট বা প্রায় চার মাইল হচ্ছে।"

এবার তোমার এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে পারা উচিত। একটা ট্রেনের হুইশিল থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখার দেড় সেকেণ্ড বাদে আমি যদি হুইশিলের শব্দটা শুনি তাহলে ট্রেনটা কত দূরে আছে ?

শব্দের আয়না

জঙ্গলের সীমানা, উঁচু প্রাচীর, বাড়ী, পাহাড় বা যে কোনো প্রতিধ্বনি সৃষ্টিকারী বাধা সাধারণভাবে শব্দের আয়না ছাড়া কিছুই নয়, কারণ একটা

সাধারণ সমতল আয়না যেভাবে আলোকে প্রতিফলিত করে এটাও ঠিক সেইভাবে প্রতিফলিত করে শব্দকে।

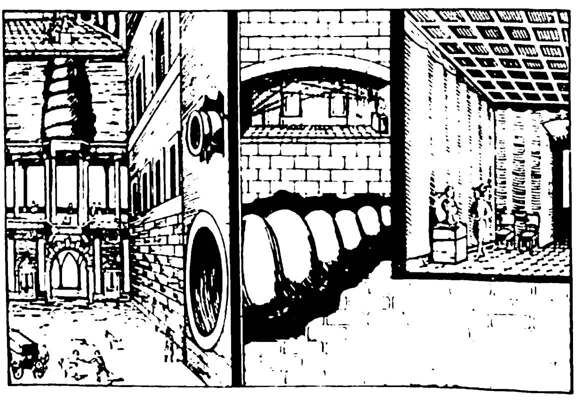
চিত্র 151



অবতল শব্দ দর্পণ।

তুমি একটা অবতল শব্দের আয়নায় পেতে পার যা শব্দের তরঙ্গরাজিকে কেন্দ্রীভূত করে দেবে। দুটো সুপ্ খাওয়ার ডিশ ও একটা ঘড়ি নিয়ে তুমি এই শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষাটা করে দেখতে পারো। একটা ডিশ টেবিলের উপর রাখো এবং ঘড়িটাকে তার তলা থেকে কয়েক সেন্টিমিটার উপরে ধরো। 151 নং চিত্রের মতো করে অন্য ডিশটাকে তোমার কানের কাছে ধরো। তিনটে জিনিসকে যদি ঠিক মতো জায়গায় বসাতে পারো তাহলে মনে হবে ঘড়ির টিকটিক্ শব্দটা কানের কাছের ডিশটা থেকে আসছে। চোখ বুজে থাকলে বিভ্রমটা আরো

চিত্র 152



অদ্ভুত ভাষী মূর্তি (অ্যাথেনাসিয়াস কার্চার-এর একটি বই থেকে, 1560)।

বাড়বে এবং শুধু কানের সাহায্যে তুমি বুঝতেও পারবে না যে, কোন হাতে ঘড়িটাকে ধরে আছ।

মধ্যযুগের প্রাসাদ নির্মাতারা প্রায়ই শব্দ নিয়ে নানা মজা করতেন। তাঁরা একটা পাথরের মূর্তিকে হয় অবতল শব্দ-দর্পণের ফোকাসে, নয় তো দেওয়ালের মধ্যে ভালভাবে লুকানো একটা কথা-বলার নলের পাশে রাখতেন। ষোড়শ শতাব্দীর একটি বই থেকে গৃহীত 152 নং চিত্রে এই ধরনের ব্যবস্থা দেখান হয়েছে। কথা-বলার নল থেকে যত শব্দ আসে সবই গম্বুজাকৃতি ছাদ থেকে প্রতিফলিত হয়ে মূর্তির ঠোঁটের কাছে চলে যায়। ইঁটের মধ্যে বসানো বিশালাকার নলগুলো প্রাঙ্গন থেকে শব্দ বয়ে আনে গ্যালারির দেওয়ালের কাছে স্থাপিত মার্বেল মূর্তির কাছে। এই ভাবেই সৃষ্টি হয় কথা-কওয়া বা গান-গাওয়া মূর্তির বিভ্রম।

থিয়েটারে শব্দ

যারা থিয়েটার এবং কনসার্টে যান তারা খুব ভালভাবেই জানেন যে, কোনো হলের শব্দ-গুণ ভাল আবার কোনোটার বা খারাপ। কোনো কোনো হলে অনেক দূরে অবধি স্পষ্টভাবে কথা ও সঙ্গীত শোনা যায়, অন্যত্র খুব কাছ থেকেও তা শোনা যায় না।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, কোনো থিয়েটারে শব্দ-গুণ ভাল হলে সেটাকে শুধু সৌভাগ্য হিসাবেই ধরা হত। এখন নির্মাতারা এমন উপায় বার করেছেন যাতে সার্থকভাবে আপত্তিকর অনুরণন নিবারণ করা যায়। এই নিয়ে খুব বেশি কিছু বলতে চাই না, কারণ এটা শুধু স্থপতিদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটা বলতে পারি যে, সার্থক শব্দ-গুণ সৃষ্টির প্রতিকূলতা এড়ানোর প্রধান উপায় হল এমন তল সৃষ্টি করা যা অবাঞ্ছিত শব্দকে শোষণ করে নেবে।

যে কোনো ছিদ্র যেমন আলো শোষণ করার পক্ষে সেরা—ঠিক তেমনই খোলা জানলা সবচেয়ে ভালভাবে শব্দ-শোষণ করে। প্রসঙ্গত বলি, খোলা জানলার এক বর্গমিটারকে শব্দ-শোষণের পরিমাণ নির্ধারণের সাধারণ একক হিসাবে ধরা হয়েছে। দর্শকরা স্বয়ং ভাল শব্দ-শোষক—প্রতিটি মানুষ মোটামুটিভাবে খোলা জানালার আধ বর্গমিটারের সমতুল্য। "বক্তা যা বলেন শ্রোতারা সত্যি সত্যিই তা শোষণ করে নেন", বলেছিলেন একজন পদার্থবিদ। শোষণকারী দর্শক না থাকলে সত্যিই তা বক্তার পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক।

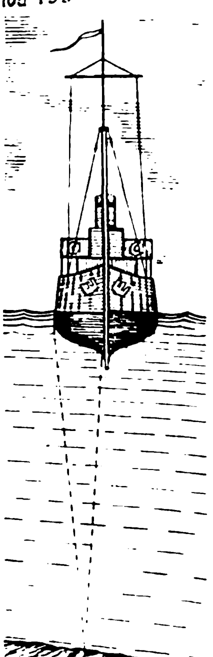
শব্দের অত্যধিক শোষণের ফলও ভাল হয় না। কারণ, প্রথমত, তার ফলে কথা ও শব্দ নির্বাপিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয়ত, অনুরণনকে এত বেশি চেপে দেয় যে, শব্দকে কর্কশ ও ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মনে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছুটা অনুরণন দরকার, খুব বেশিও নয়, আবার খুব কম হলেও চলবে না। এই পরিমাণ সব হলঘরের পক্ষে সমান হতে পারে না এবং নিমার্ণকারী স্থপতিকে তার মাত্রা হিসাব করে বার করতে হবে।

পদার্থবিদ্যার দৃষ্টি থেকে থিয়েটারের আরেকটা জায়গা আকর্ষণীয়। এটা হল যেখান থেকে প্রম্প্ট্ করা হয়। তুমি কি কখনো খেয়াল করেছ যে, এর আকৃতি সর্বত্রই এক রকম? পদার্থবিদ্যাই তার জন্য দায়ী। এই জায়গার ছাদটা একটা অবতল শব্দ-দর্পণ। সেটা দুটো উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমত, প্রম্প্টার কি বলছে সেটা দর্শকদের কানে যেতে দেয় না এবং দ্বিতীয়ত, তার কণ্ঠস্বরকে প্রতিফলিত করে মঞ্চে অভিনেতার কাছে পাঠিয়ে দেয়।

সমুদ্রতলের প্রতিধ্বনি

সমুদ্র ও মহাসাগরের গভীরতা মাপার কাজে লাগানোর একটা উপায় বার করার আগে অবধি প্রতিধ্বনিকে কোনো কাজে লাগানো যায়নি। আকস্মিকভাবে ঘটেছিল এই উদ্ভাবন। 1912 সালে বিশাল সমুদ্রগামী জাহাজ 'টাইটানিক' আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে প্রায় সমস্ত যাত্রীসমেত ডুবে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর জাহাজের পথ-প্রদর্শকরা (নেভিগেটর) ভাবলেন কুয়াশার মধ্যে বা রাত্তিরে জাহাজের গতিপথে কোনো বাধা আছে কিনা খুঁজে বার করার জন্য প্রতিধ্বনির সাহায্য নেবেন। এই মূল উদ্দেশ্যটি অর্জনে সফল না হলেও এর থেকে সুন্দর একটি পদ্ধতি বার হল যাতে সমুদ্রের নিচ থেকে প্রতিধ্বনি মারফত শব্দের সাহায্যে সমুদ্রের গভীরতা নির্ধারণ করা যায়।

চিত্র 153



প্রতিধ্বনি দিয়ে গভীরতা মাপা।

কি করে সেটা করা হয় চিত্র 153 থেকে তা দেখতে পাবে। খোলের নিচের দিকে জাহাজের বহিরাবরণের সঙ্গে ঠেকিয়ে রাখা একটি বিস্ফোরককে ফাটিয়ে তীক্ষ্ম সংকেত পাঠান হয়। শব্দ জলকে বিদ্ধ করে, সমুদ্রের নিচে পৌঁছয় এবং প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনি, প্রতিফলিত সংকেতটা ধরা পড়ে জাহাজের বহিরাবরণের কাছে রাখা একটি সুবেদী যন্ত্রে। সংকেত প্রেরণ ও প্রতিধ্বনি গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়ের মাপ নেয় একটি নির্ভুল ঘড়ি। জলের মধ্যে শব্দের বেগ জানা থাকলে আমরা সহজেই বার করে নিতে পারি প্রতিফলনকারী বাধার দূরত্ব, কিংবা গভীরতার হদিশ।

গভীরতার মাপ নেওয়ার পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে প্রতিধ্বনির ব্যবহার। পুরনো পদ্ধতিতে জাহাজ না থামালে চলত না এবং পুরো ব্যাপারটাই ছিল ক্লান্তিকর ও দীর্ঘ। মিনিটে 150 মিটার হারে খুব ধীরে ধীরে চেন্‌কে নিচে নামিয়ে দেওয়া হত এবং আবার সেটাকে গোটাতেও সেই একই সময় লাগত। বস্তুত, তিন কিলোমিটার গভীরতা মাপতে 45 মিনিট লাগত। প্রতিধ্বনি পদ্ধতির সাহায্যে এই কাজই কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে সারা যায়। উপরন্তু এটা করার জন্য জাহাজ থামাতে হয় না এবং ফলও পাওয়া যায় খুব নিখুঁত—এক সেকেণ্ডের তিন হাজার ভাগ অবধি নির্ভুলভাবে সময়ের হিসাব নেওয়া হলে হিসাবে সোয়া মিটারের বেশি অমিল হয় না।

সমুদ্রবিদ্যায় যেমন গভীর তলদেশের সঠিক মাপ নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই বিশেষভাবে তীরের কাছে অগভীর জলে দরকার দ্রুত, নির্ভরযোগ্য ও নিখুতভাবে গভীরতা নির্ধারণ।

গভীরতার মাপ নেওয়ার জন্য আজকাল আর সাধারণ শব্দ প্রয়োগ না করে প্রচণ্ড তীক্ষ্ম 'আলট্রা-সাউণ্ড' ব্যবহার করা হয়। এদের কম্পাঙ্ক সেকেণ্ডে কয়েক লক্ষ স্পন্দনে গিয়ে পেঁছয় বলে কানে শোনা সম্ভব নয়। দ্রুত পরিবর্তী বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে স্থাপিত কোয়ার্ৎজ প্লেটের (পিজো-ইলেকট্রিক) স্পন্দন থেকে এই শব্দ সৃষ্টি করা হয়।

মাছি গুনগুন করে কেন?

কেন বলতে পারো? বেশির ভাগ পতঙ্গেরই কিন্তু এই কাজটি করবার জন্য কোনো দেহযন্ত্র থাকে না। পতঙ্গ ওড়বার সময়েই একমাত্র এই গুনগুনানি শোনা যায়। পতঙ্গের ডানা দুটো খুব দ্রুত, সেকেণ্ডে কয়েক শো বার করে নড়ে বলেই এই শব্দ সৃষ্টি হয়। ডানাগুলো কম্পনশীল পাতের কাজ করে এবং যে কোনো পাত যদি বেশ তাড়াতাড়ি কাঁপে—সেকেণ্ডে ষোল বারের বেশি—তাহলে সেটা নির্দিষ্ট তীক্ষ্মতা (pitch) বিশিষ্ট শব্দ সৃষ্টি করে।

এর থেকেই বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন যে, ওড়বার সময় কোনো পতঙ্গ সেকেণ্ডে কতবার ডানা নাড়ে। এই সংখ্যাটা নির্ধারণ করতে হলে শুধু জেনে নেওয়া দরকার পতঙ্গের গুনগুনানির তীক্ষ্মতা (pitch) কত, কারণ প্রত্যেকটি শব্দের নিজস্ব কম্পন সংখ্যা আছে।

ধীরগতি ক্যামেরার সাহায্যে (প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত) বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন, যে কোনো পরিস্থিতিতেই একটি পতঙ্গ সর্বদাই সমান দ্রুততার সঙ্গে ডানা নাড়ে। ওড়বার সময় যা হেরফের প্রয়োজন সেটা ডানার সঞ্চালনসীমা (amplitude) এবং ডানার আনতির কোণ পরিবর্তন করেই ঘটায়। একমাত্র শীতকালে পতঙ্গের ডানা নাড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই জনাই তাদের গুনগুনানির সুর

একভাবে বাঁধা থাকে। উদাহরণ স্বরূপ সাধারণ ঘরের মাছি সেকেণ্ডে 352 বার ডানা নেড়ে *F*-স্বর সৃষ্টি করে। বড় মাছি 220 বার ডানা নাড়ায়। মৌমাছি যখন মধু বয় না তখন সেকেণ্ডে 440 বার (*A*-স্বর) ও মধু বয়ে থাকলে সেকেণ্ডে 330 বার (*B*-স্বর) ডানা নাড়ে। গুবরে পোকার গুনগুনানির তীক্ষ্ণতা অনেক কম বলে ডানাও নাড়ে আস্তে আস্তে। ওদিকে মশারা কিন্তু সেকেণ্ডে 500 থেকে 600 বার ডানা নাড়ে। তুলনার খাতিরে বলে রাখি যে, এরোপ্লেনের প্রপেলার কিন্তু গড়ে সেকেণ্ডে মাত্র পঁচিশ বার পাক খায়।

শোনার ভুল

কোনো কারণে অল্প মাত্রার কোলাহলের উৎসটাকে একবার যদি অনেক দূরে আছে বলে মনে হয়, কোলাহলটা তখন 'অনেক জোরালো' ঠেকবে। প্রায়ই আমাদের এরকম বিভ্রম ঘটে কিন্তু আমরা সেদিকে নজর দিই না। আমেরিকান বিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস্ তাঁর 'সাইকোলজি' গ্রন্থে এই মজার ঘটনাটার কথা বলেছেন।

"একদিন অনেক রাতে বসে বসে বই পড়ছি হঠাৎ বাড়ির উপর তলা থেকে বিশ্রি একটা কোলাহল কানে এল। পুরো উপর তলাটা যেন কোলাহলে ভরপুর।

চিত্র 154



গুলিটা কোথায় ছোঁড়া হয়েছে? ডান দিকে না বাঁ দিকে?

আওয়াজটা থেমে গেল, তারপর আবার শুনতে পেলাম। বাইরের হলঘরে বেরিয়ে এলাম—শুনব বলে—কিন্তু সেটা আর শোনা গেল না। ঘরে ফিরে বসা মাত্রই কিন্তু আবার সেই চাপা, শক্তিশালী, ভয়-দেখানো শব্দ, যেন বন্যার জলের বা ভয়াবহ ঘূর্ণি হাওয়ার গর্জন। চারধার থেকেই আসছে। রীতিমতো চমকে

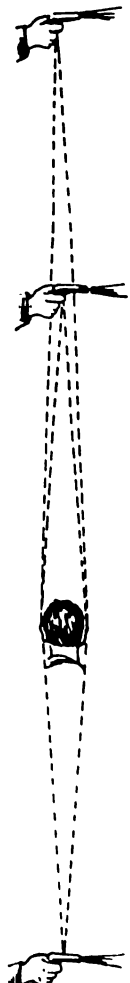
গিয়ে আবার হলঘরে এলাম কিন্তু তৎক্ষণে সেটা ফের থেমে গেছে। দ্বিতীয়বার ঘরে ফেরার পর আবিষ্কার করলাম ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, মেঝেতে শুয়ে যে ছোট্ট স্কচটেরিয়ার কুকুরটা ঘুমোচ্ছিল তারই শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। লক্ষ্য করার বিষয় হল যে, যেই আমি শব্দটাকে চিনতে পারলাম অমনি এক মুহূর্ত আগেও সেটাকে যেভাবে শুনছিলাম, সেভাবে আর শুনতে পেলাম না।" তোমার কি এরকম ঘটনার অভিজ্ঞতা আছে? খুব সম্ভবত আছে। আমি তো একাধিক বার এরকম ব্যাপার লক্ষ্য করেছি।

গঙ্গাফড়িঙটা কোথায়?

একটা শব্দ কত দূর থেকে আসছে তার বিচারে যত না, তার চেয়ে বেশি ভুল করি আমরা সেটার দিক্ নির্ধারণে। কানের সাহায্যে বেশ ভালভাবেই আমরা বুঝতে পারি একটা গুলি আমাদের ডান দিকে ছোঁড়া হয়েছে, না বাঁ দিকে (চিত্র 154), কিন্তু সেটা আমাদের সামনে, না পিছনে ছোঁড়া হয়েছিল বুঝতে প্রায়ই ভুল হয় আমাদের (চিত্র 155)। সামনের দিকে ছোঁড়া একটা গুলির শব্দকেও আমাদের হামেশাই পিছন দিক থেকে আসছে মনে হয়। এরকম ক্ষেত্রে গুলির আওয়াজটা কতটা জোরালো তার উপর নির্ভর করে আমরা শুধু বলতে পারি ঘটনাটা কাছে ঘটেছে, না দূরে।

এবার একটা শিক্ষাদায়ক পরীক্ষার কথা বলি। চোখ বেঁধে তোমার বন্ধুকে একটা ঘরের মাঝখানে বসিয়ে দাও। তাকে চুপ করে ঘাড় না নেড়ে বসে থাকতে বলো। এবার দুটো মুদ্রা নিয়ে একটাকে আরেকটার গায়ে ঠুং করে ঠোকো। ইতিমধ্যে তুমি এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছ যা তোমার বন্ধুর দু'চোখের মধ্যবর্তী একটি কল্পিত খাড়া তল। এবারে শব্দটা কোথা থেকে আসছে জানতে চাইলে অবাক হয়ে দেখবে যে কোনো দিকেই সে আঙুল দেখাক তোমার দিকে দেখাবে না। কিন্তু যেই তুমি সেই উল্লিখিত প্রতিসাম্য তলটি ত্যাগ করবে তার আন্দাজ অনেক ভাল হবে, কারণ তার যে কানটা তোমার নিকটবর্তী সেটা শব্দটাকে একটু আগে ও একটু জোরে শুনবে।

চিত্র 155



গুলিটা কোথায় ছোঁড়া হয়েছে? সামনে? না, পিছনে?

প্রসঙ্গত এই পরীক্ষা থেকেই জানা যায় যে, ডাক্ শুনে গঙ্গাফড়িঙকে খুঁজে বার করতে অত অসুবিধা হয় কেন। ডান ধারে দু' পা দূরে থেকে হয়তো তার তীক্ষ্ণ রব তোমার কানে এল। তুমি মাথা ফেরালে কিন্তু কিছু দেখতে পেলে না এবং এবার বাঁ ধারে ফড়িঙের ডাক শুনতে পেলে। আবার মাথা ফেরালে, কিন্তু এবার আবার অন্য কোনো জায়গা থেকে শোনা যাচ্ছে ডাক্টা। যত দ্রুত মাথা ফেরাবে আমাদের অদৃশ্য সংগীতশিল্পী ততই যেন ছলনাময়ী হয়ে উঠবেন। আসলে ফড়িংটা কিন্তু একটুও নড়েনি, তুমি শুধু ভেবে নিয়েছ যে, ওটা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তুমি একটা শ্রবণ বিভ্রমের কবলে পড়েছ।

তোমার ভুল হল এইটাই যে, এমনভাবে তুমি মাথা ঘোরাচ্ছ যাতে ফড়িঙটা তার প্রতি সমতলে এসে পড়ছে। একথা তো আগেই জানতে পেরেছ যে, এই জন্যই তোমার দিক নির্ধারণে ভুল হচ্ছে। কাজেই ফড়িঙ, কোকিল বা এই ধরনের যে কোনো দূরবর্তী শব্দের উৎসকে খুঁজে পেতে হলে, শব্দটা যেদিক থেকে আসছে সেদিকে না ফিরিয়ে তার উল্টোদিকে মাথা ফেরাও। প্রসঙ্গত 'কান খাড়া করার' সময়ে লোকে তাই করে থাকে।

আমাদের কানের কেরামতি

খাস্তা বিস্কুটে কামড় দিলে আমরা একেবার কান কালা করে দেবার মতো আওয়াজ শুনি। কিন্তু অদ্ভুত হচ্ছে, আমাদের কাছে বসে অন্য কেউ যখন একই কাজ করে, তখন প্রায় কোনো শব্দই হয় না। ব্যাপারটা কি? আমরা যে শব্দ করি তা শুধু আমরা নিজেরাই শুনতে পাই এবং তা অন্য কাউকে বিরক্ত করে না। আসলে যে কোনো কঠিন স্থিতিস্থাপক বস্তুর মতোই আমাদের মাথার হাড় শব্দের খুব ভাল পরিবাহক। যে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে শব্দ যায় সেটা যত ঘন হবে শব্দও হবে তত জোর। আমাদের পাশের লোকটি বিস্কুটে কামড় দেবার সময় যে শব্দ করছে সেটা বাতাস দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বলে মোটেই জোরালো হয় না। কিন্তু একই শব্দ তোমার মাথার হাড় মারফত যখন শ্রবণ-স্নায়ুতে পেঁছয় সেটা বাজ পড়ার মতো হয়ে ওঠে।

এই পরীক্ষাটা করে দ্যাখো। তোমার পকেট ঘড়ি ঝোলাবার আঙটাটা দাঁতে করে চেপে ধরে কান দুটো বন্ধ করে দাও। তোমার মাথার হাড় টিক্‌টিক্ শব্দকে এমন বাড়িয়ে তুলবে যে, মনে হবে যেন ভারী ভারী হাতুড়ির ঘা পড়ার শব্দ শুনছ।

গল্প আছে, বিঠোভেন কালা হলেও তাঁর হাঁটবার ছড়িটার এক প্রান্ত পিয়ানোয় ঠেকিয়ে অন্য প্রান্তটা দাঁতে কামড়ে ধরে বাজনা শুনতেন। একইভাবে বধিররা সঙ্গীতের তালে নাচতে পারে, অবশ্য তাদের ভিতরকার কানটা যদি ঠিক

থাকে তবেই। মেঝে এবং মাথার হাড় মারফত সঙ্গীত তাদের শ্রবণ-স্নায়ুতে পৌঁছয়।

এই মাত্র যা বর্ণনা করা হল তারই উপর পুরোপুরি নির্ভর করে 'ভেণ্ট্রিলোকুইজম' (মুখ ফাঁক না করে কথা বলা) ও তার 'মজাদার ব্যাপারগুলো'।

গলার আওয়াজটা কোথা থেকে আসছে ও কত দূরে থেকে, সেটা বোঝার অক্ষমতার উপরেই পুরোপুরি নির্ভর করে ভেণ্ট্রিলোকুইজম সৃষ্ট বিভ্রান্তি। সাধারণভাবে আমরা এটা মোটামুটি বুঝতে পারি। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে পড়লেই শব্দটা কোথা থেকে আসছে আন্দাজ করে বলতে গিয়ে আমরা দারুণ ভুল করি। ব্যাপারটা জানা থাকা সত্ত্বেও আমি নিজেও একজন ভেণ্ট্রিলোকুইস্টের কথা শোনার সময়ে এই বিভ্রমের হাত থেকে রক্ষা পাইনি।

———

নিরানব্বইটি প্রশ্ন

1. তোমার চেয়ে একটা শামুক কতটা ধীর গতিসম্পন্ন ?
2. আধুনিক এরোপ্লেন কত দ্রুত ওড়ে ?
3. তুমি কি সূর্যকে দৌড়ে হারিয়ে দিতে পার ?
4. ধীর-গতি সিনেমা আমরা কি করে পাই ?
5. আমরা কখন বেশি জোরে সূর্যের চারধারে ঘুরি ?
6. একটা ঘুরন্ত চাকার উপর দিককার শিকগুলো অস্পষ্ট ও নিচের দিকেরগুলো স্পষ্ট দেখতে পাই কেন ?
7. সামনের দিকে অগ্রসররত একটা ট্রেনের কোন বিন্দু পিছন দিকে এগোয় ?
8. আলোর অপেরণ কাকে বলে ?
9. উঠে দাঁড়াবার সময়ে আমরা কেন সামনের দিকে ঝুঁকি বা পা দুটো চেয়ারে নিচে ঠেলে দিই ?
10. একজন নাবিক টলমল করে হাঁটে কেন ?
11. ছোটা ও হাঁটার মধ্যে কি তফাত ?
12. ছুটন্ত গাড়ী থেকে কিভাবে লাফ দেওয়া উচিত ? ব্যাখ্যা কর।
13. গুল-গল্প ফাঁদায় প্রসিদ্ধ ব্যারণ মুনচহাউসেন দাবি করেছিলেন তিনি খালি হাতে উড়ন্ত কামানের গোলা ধরেছিলেন। সেটা কি সম্ভব ?
14. গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছ, এমন সময়ে কেউ তোমার দিকে উপহার ছুঁড়ে দিক, এটা কি তুমি চাইবে ?
15. স্থির অবস্থার চেয়ে নিচে পড়ার সময় বস্তুর ওজন বাড়ে না কমে ?
16. যা কিছু উপরে ছুঁড়ে দেওয়া হয় সবই কি পৃথিবীতে ফিরে আসে ?
17. প্রক্ষেপকের মধ্যে জুল ভার্ন যে জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়েছিলেন, সেটা কি সত্য ?
18. ত্রুটিপূর্ণ তুলাযন্ত্রে নিখুঁত বাটখারার সাহায্যে অথবা যথাযথভাবে ক্রমাঙ্কিত তুলাতে ত্রুটিপূর্ণ বাটখারার সাহায্যে কীভাবে ঠিক ঠিক ওজন করবে ?
19. আমাদের বাহুর হাড়গুলো কি লিভার হিসাবে সুবিধাজনক ?
20. স্কিয়ার নরম বরফের মধ্যে ডুবে যায় না কেন ?
21. দড়ির ঝোলান-শয্যায় আরাম লাগে কেন ?

22. প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্যারিসের উপর কিভাবে গোলা ছোঁড়া হয়েছিল ?
23. ঘুড়ি ওড়ে কেন ?
24. পতনের সময় সারাক্ষণই কি একটা ঢিলের ত্বরণ ঘটে ?
25. বিলম্বিত লম্ফনে প্যারাসুট আরোহী সবচেয়ে বেশি কত দ্রুতি লাভ করতে পারে ?
26. বুমেরাং কেন বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে ?
27. ডিম না ফাটিয়ে কি বলা সম্ভব যে সেটা সেদ্ধ কি না ?
28. কোন জায়গায় একটা জিনিস বেশি ভারী ? বিষুবরেখার কাছে, না মেরুর কাছে ?
29. ঘুরন্ত চাকার কিনারায় একটি বীজের অংকুরোদ্গম ঘটলে সেটি কোন দিকে বাড়ে ?
30. অবিরাম গতি কি ?
31. 'অবিরাম গতি' যন্ত্র কি কখনও তৈরী হয়েছে ?
32. তরলে নিমজ্জিত বস্তুর কোন অংশে সবচেয়ে বেশি চাপ পড়ে ? উপরের দিকে, পাশে, না তলায় ?
33. দাঁড়িপাল্লায় ওজন-মেলানো অবস্থায় স্থাপিত একটি জলভর্তি কাচের পাত্রের মধ্যে সুতোয় বাঁধা ছোট্ট একটি ওজন ডোবালে কি হয় ?
34. তরলের যখন কোনো ওজন থাকে না, তখন তা কি আকৃতি নেয় ? পরীক্ষামূলকভাবে সেটা কি প্রমাণ করতে পার ?
35. বৃষ্টির ফোঁটা গোল হয় কেন ?
36. কাচ ও ধাতুর মধ্য দিয়ে কেরোসিন কি চুঁইয়ে বেরিয়ে আসে ? লোকে এমনটা ভাবেই বা কেন ?
37. ইস্পাতের ছুঁচকে ভাসাতে পার ?
38. ভাসন (Floatation) কাকে বলে ?
39. সাবান দিয়ে কাচলে নোংরা অপসারিত হয় কেন ?
40. সাবানের বুদবুদ উপরে ওঠে কেন ? ঠাণ্ডা না গরম ঘরে, কোথায় সেটা তাড়াতাড়ি উপরে ওঠে ?
41. মানুষের চুল, না সাবানের বুদবুদের সরের আবরণ, কোনটা বেশি পাতলা ? একটা আর একটা থেকে কত গুণ বেশি পাতলা ?
42. একটা গেলাসের মধ্যে জ্বলন্ত এক টুকরো কাগজ ভরে সেটাকে জল ভর্তি পাত্রে উপুড় করে রাখলে, গেলাসের মধ্যে জল এসে জমে। কেন এমন হয় ?
43. স্ট্র দিয়ে টানলে তরল উঠে আসে কেন ?

44. একটা কাঠিকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় তার সমান ওজন চড়ানো হয়েছে। বায়ুশূন্য পাত্রের মধ্যে দাঁড়িপাল্লাটা রাখলে কি তার সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হবে ?

45. তরলীভূত বায়ুর মধ্যে রাখলে দাঁড়িপাল্লার অবস্থা কি হবে ?

46. তোমার ওজন যদি শূন্য হয়ে যায় কিন্তু জামাকাপড়ের ওজন যা আছে তাই থাকে, তুমি কি বাতাসে ভাসবে ?

47. 'অবিরাম গতি' যন্ত্র আর 'শক্তি-উপহার' যন্ত্রের মধ্যে কি তফাত ? 'শক্তি-উপহার' যন্ত্র কি একটাও তৈরী হয়েছে ?

48. খুব গরমের বা খুব ঠাণ্ডার দিনে ট্রামের রেলের কি হয় ? রেলপথের পক্ষে এই আবহাওয়া অত ক্ষতিকর নয় কেন ?

49. টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কখন সবচেয়ে বেশি ঝুলে পড়ে ?

50. গরম বা ঠাণ্ডা জলে কোন ধরনের পাত্র বেশি ফেটে যায় ?

51. লেমনেড খাবার গেলাসের তলাটা বেশি পুরু হয় কেন এবং চা খাওয়ার পাত্র হিসাবে সেগুলো কেন উপযোগী নয় ?

52. খাবার টেবিলের জন্য কোন ধরনের স্বচ্ছ পদার্থ সবচেয়ে ভাল যা ঠাণ্ডা বা গরমে ফাটে না ?

53. গরম জলে স্নানের পর পায়ে বুট জুতো গলানো শক্ত হয় কেন ?

54. আমরা কি আপনা-থেকে-দম-দেওয়া ঘড়ি তৈরি করতে পারি ?

55. বড় যন্ত্রের ক্ষেত্রে কি আপনা-থেকে-দম দেওয়ার পদ্ধতি ব্যবহার করা যায় ?

56. ধোঁয়া কেন পাক খেয়ে ওঠে ?

57. এক বোতল লেমনেডকে বরফ দিয়ে ঠাণ্ডা করার সময়ে কি করা উচিত ?

58. পশমী কাপড়ে জড়িয়ে রাখলে বরফ কি তাড়াতাড়ি গলে যাবে ?

59. এটা কি সত্যি যে তুষার মাটিকে গরম করে দেয় ?

60. ভূগর্ভস্থ পাইপের মধ্যে শীতকালে জল জমে যায় না কেন ?

61. জুলাই মাসে উত্তর গোলার্ধে শীতকাল হয় কেন ?

62. ঝালাই করা পাত্রে জল ফোটালেও পাত্রটা কেন টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ভয় থাকে না ?

63. প্রচণ্ড তুষার পাতের সময় স্লেজকে কেন কষ্টেসৃষ্টে তুষারাবৃত অঞ্চল অতিক্রম করতে হয় ?

64. কখন আমরা ভালভাবে বরফের গোলা পাকাতে পারি ?

65. ঝুলন্ত তুষার-ঝালর কিভাবে গঠিত হয় ?

66. মেরু অঞ্চলের চেয়ে বিষুবরেখায় বেশি গরম হয় কেন ?
67. আলো যদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রসারিত হত তাহলে কখন আমরা সূর্যোদয় দেখতাম ?
68. যে কোনো মাধ্যমে আলো যদি তাৎক্ষণিকভাবে প্রসারিত হত তা হলে দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণ-এর কি হত ?
69. আমরা কি আলোকে বাধা পার করে নিয়ে যেতে পারি ?
70. পেরিস্কোপ কিভাবে তৈরী হয় ?
71. আয়নায় নিজেকে যাতে আরও ভাল করে দেখতে পাও তার জন্য আলোটা কোথায় বসাবে ?
72. তুমি এবং আয়নায় তোমার প্রতিফলন কি পুরোপুরি এক রকম ?
73. ক্যালিডোস্কোপ কি কোনো কাজে লাগে ?
74. বরফ দিয়ে আমরা কি করে আগুন জ্বালব ?
75. নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে কি তুমি মরীচিকা দেখতে পাবে ?
76. 'সবুজ রশ্মি' কি ?
77. আলোকচিত্র কিভাবে পর্যবেক্ষণ করা উচিত ?
78. বিবর্ধক কাচের মধ্য দিয়ে বা অবতল দর্পণে দেখলে আলোকচিত্র কেন ত্রিমাত্রিকতা ও গভীরতা পায় ?
79. সিনেমা হলের মাঝখানে বসাই সবচেয়ে ভাল কেন ?
80. চিত্র এক চোখ দিয়ে দেখাই ভাল কেন ?
81. স্টিরিওস্কোপ কিভাবে কাজ করে ?
82. রূপকথার গল্পের মতো দানবদের আমরা কিভাবে দেখতে পারি ?
83. টেলি-স্টিরিওস্কোপ কি ?
84. কোনো কোনো জিনিস চিকমিক করে কেন ?
85. চলমান ট্রেন থেকে তাকালে দৃশ্যাবলীর ত্রিমাত্রিকতা আরো ভালভাবে ধরা পড়ে কেন ?
86. মহাজাগতিক বস্তুর স্টিরিওস্কোপিক আলোকচিত্র কিভাবে তোলা হয় ?
87. তথাকথিত 'ছায়াবাজি'র পিছনে কোন তথ্য রয়েছে ?
88. নীল আলোয় একটা লাল পতাকা কি রঙ ধারণ করে ?
89. কিরণীয়ন (irradiation) ও অ্যাসটিগম্যাটিজ্‌ম্ (বিষম-দর্শন) কাকে বলে ?
90. কোন ধরনের ছবি চোখ মেলে তোমায় অনুসরণ করে ? কেন করে ?

91. উজ্জ্বল তারাদের কারা বেশি বড় বলে মনে করে, যাদের দৃষ্টি স্বাভাবিক, না যাদের অদূরবদ্ধ দৃষ্টি ?
92. হাততালি দেবার 1·5 সেকেণ্ড বাদে তুমি যদি তার প্রতিধ্বনি শোনো, তাহলে শব্দের প্রতিবন্ধক কত দূরে আছে ?
93. শব্দ-দর্পণ বলে কোনো জিনিস আছে কি ?
94. শব্দ কোথায় বেশি দ্রুত প্রসারিত হয়, বাতাসে, না জলে ?
95. প্রতিধ্বনিকে কোন কারিগরী কাজে লাগানো যায় ?
96. মৌমাছি গুনগুন করে কেন ?
97. গঙ্গাফড়িঙের তীব্র শব্দ সত্ত্বেও তাকে খুঁজে বার করা এত শক্ত কেন ?
98. হাওয়া, না তার চেয়ে ঘন মাধ্যম শব্দকে ভালভাবে প্রচারিত করে ?
99. 'ভেণ্ট্রিলোকুইজ্‌ম্‌'-এর ভিত্তি কি ?

* * *

এই বইয়ের একটি দ্বিতীয় খণ্ড আছে। অবশ্য, দু'টি বইকেই স্বতন্ত্র ভাবে পড়া যায়।

